আসহাবে রাসূলের
কাব্য প্রতিভা
ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
আহসান পাবলিকেশন

আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

আহসান পাবলিকেশন
ঢাকা।

আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

প্রকাশনায়
আহ্সান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০

ISBN 984-32-0720-3

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ-
মে ২০০৩
রবিউল আউয়াল ১৪২৪
জৈষ্ঠ্য ১৪১০

প্রচ্ছদ
রফিকুল্লাহ্ গাজ্জালী

কম্পিউটার কম্পোজ
আহ্সান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ, ঢাকা।

মুদ্রণে
খন্দকার কম্পিউটার্স এন্ড প্রিন্টার্স
১, সেন্ট্রাল রোড, হাতিরপুল, ধানমন্ডি,
ফোন ঃ ৮৬১৩৯২৪

মূল্য ঃ ১২০/- (একশত বিশ টাকা মাত্র)

ASHABE RASHULER KABBA PRATIVA by Dr. Muhammad Abdul Ma'bud Published by Ahsan Publication, Kataban Masjid Campus, Dhaka-1000, First Edition May 2003, Price Tk. 120.00 ($ 3.00)

A.P- 2003/16

প্রকাশকের কথা

কবিতা সর্বকালেই শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সাতিত্যের অন্যতম শাখা এটি। রাসূলের (সা) সাহাবীগণের সাথে কবিতার কথা আসলে সেটি হবে ইসলামী কবিতা, যা ইসলামী সাহিত্যের অংশ।

ইসলামী দা'ওয়াতের কাজে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীগণের কাব্য প্রতিভাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর সাথীদের কবিতার মাধ্যমে দ্বীনের প্রচারকে উৎসাহিত করেছেন।

শুধু কল্পনা নির্ভর বাস্তবতা বিবর্জিত অসত্য কবিতাকে আল্লাহ ও তার রাসূল দারুণভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন। সম্ভবত এ কারণে আমাদের বাংলাভাষী আলেম সমাজ কাব্যচর্চায় একরকম অনুপস্থিত। কিন্তু একটি মানসম্পন্ন কবিতা হাজার বক্তৃতা-ভাষণ এর চেয়ে অনেক শক্তিশালী। তার প্রমাণ কবি নজরুল ইসলামের ইসলামী কবিতা। আল্লামা ইকবাল, ফররুখ আহমদ প্রমুখ কবিগণও কবিতার বাহনে ইসলামী আদর্শকে তুলে ধরেছেন।

আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভাকে আমরা সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় কাজ হয়নি বললেই চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড: মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ এর সুচিন্তিত গবেষণা হচ্ছে আমাদের এ গ্রন্থটি-'আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা।'

আমরা আশা করি এ গ্রন্থটির মাধ্যমে কাব্যচর্চায় সাহাবীগণের ভূমিকা সবার চোখের সামনে প্রতিভাত হবে। সাথে সাথে এর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে ইসলামী কাব্যচর্চায় অনেকে এগিয়ে আসবেন। আর তখনই আমরা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সফল হয়েছে বলে মনে করবো।

আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন! আমীন!!

সূচিপত্র

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

আধুনিককালে "ইসলামী সাহিত্য" কথাটি বেশ জোরে-শোরে সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে। এ সাহিত্যের উৎপত্তি কিন্তু সাম্প্রতিক কালে নয়। আবার অতি প্রাচীন কালেও নয়। বরং মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের সাথে এর চলা শুরু। তারপর ইসলামী দা'ওয়াতের সাথে তার নতুন আবাস ভূমি মদীনায় গেছে। ইসলামী দা'ওয়াতের সাথে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আরবভূমি পেরিয়ে পারস্য ও স্পেনে পৌঁছেছে। এই ভ্রমণে সে ইসলামী দা'ওয়াতের উজ্জ্বল দিনসমূহ এবং তমসাচ্ছন্ন রাতগুলোতে তার সাথে অতিবাহিত করেছে। এ সময় সে ইসলামী দা'ওয়াতের গৌরবময় কর্মকাণ্ড ধারণ করেছে, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করেছে এবং তার চারণভূমি সংরক্ষণে ভূমিকা রেখেছে।

ইসলামী সাহিত্যের তাত্ত্বিক কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে না গিয়ে তার পরিচয় আমরা একজন আরব পণ্ডিতের ভাষায় এ ভাবে দিতে পারি ঃ১

هو ذلك الإ نتـاج الأدبى الذى قاله الشعـراء والناثرون تـحقـيقا لأهداف اللدعوة الاسلامية ودعما لمباد ئها ودفاعا عن كيانها.

'এ হচ্ছে সেই সব সাহিত্যকর্ম যা কবি ও সাহিত্যিকগণ ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, তাঁর মৌলনীতি শক্তিশালীকরণ এবং তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বলেছেন বা সৃষ্টি করেছেন।'

মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা হয়। স্বাভাবিকভাবে ইসলামী সাহিত্যের সূচনাও সেখানে হয়ে থাকবে। হিরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিলের ঘটনা ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা সম্বলিত রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছটি, যাকে "হাদীছুল গার" বলা হয়, সেটাকেই ইসলামী সাহিত্যের প্রথম নমুনা ধরা যেতে পারে। তেমনি ভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশে রাসূল (সা) তাঁর গোত্রের নিকটজনদের সমবেত করে তাদের সামনে ইসলামের মর্মকথা তুলে ধরে প্রথম যে খুতবাটি (ভাষণ) দেন সেটিও ইসলামী সাহিত্যের প্রথম নমুনার মধ্যে পড়ে। মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামী দা'ওয়াতের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে তৎকালীন আরবী সাহিত্যের অন্যতম শাখা খুতবার (বক্তৃত-ভাষণ) সাহায্য নেন। তখনও তিনি সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা কবিতার সাহায্য পাননি। মক্কার কবিরা তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমে গেলেও তথাকার কোন কবি তার পাশে এসে দাঁড়ায়নি।

---

১. ড. মুস্তাফা মাহমুদ ইউনুস, আদাবুদ দা'ওয়াহ্, পৃ. ৬

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় গেলেন। ইসলামী দা'ওয়াতের জন্য তিনি কবিদের সেবার প্রয়োজন বোধ করলেন। কবিদের প্রতি তাদের কাব্য প্রতিভা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করার আহবান জানালেন। দ্রুত যাঁরা এই আহ্বানে সাড়া দিলেন তাঁরা হলেন তিনজন। তাঁদের নেতা ছিলেন কবি হাস্সান ইবন ছাবিত (রা)। এই হাস্সানের নেতৃত্বে সেদিন একদল কবি মক্কার কবিদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই দলটির কয়েকজন হলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, কা'ব ইবন মালিক, 'আলী ইবন আবী তালিব, সুওয়ায়েদ ইবন আস-সামিত, সারমা ইবন আনাস, আবূ সারমা ইবন কায়স, খুবায়ছ ইবন 'আদী ইবন 'আবদুল্লাহ, 'আমর ইবন আল-জামূহ, আল-হুবাব ইবন আল-মুনযির, নাবিগা আল-জা'দী, আন-নামির ইবন তাওলাব, খানসা ও আরও অনেকে। সেদিন তাঁরা ইসলামের সেবায় চমৎকার ভূমিকা পালন করেন।

মদীনা কেন্দ্রিক ইসলামী সাহিত্যের যে যাত্রা শুরু হয়, তা ইসলামী দা'ওয়াতের সাথে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর যে কোন আঞ্চলের যে কোন ভাষার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের কবি-সাহিত্যিকরা তাদের প্রতিভাকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এ ভাবে ইসলামী সাহিত্যও আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ইসলামের অব্যবহিত-পূর্ব আরবের ভাষা ও সাহিত্যের দারুণ উন্নতি ঘটেছিল। তখন লিখিত গদ্য না থাকলেও মৌখিক গদ্য: বক্তৃতা-ভাষণ ও গল্প-কাহিনী বলার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। সেকালের অসংখ্য বাগ্মী মানুষের নাম ও তাদের বক্তৃতা আরবী সাহিত্য ভাণ্ডারে সংরক্ষিত দেখা যায়। আর জাহিলী আরবদের কাব্য চর্চার খ্যাতি তো বিশ্বব্যাপী। মোট কথা ভাষা-সাহিত্যের সমঝদার অসংখ্য লোকের জন্ম তখন আরবে হয়েছিল। তা না হলে আল-কুরআনের মত এমন উন্নত ভাব ও ভাষাশৈলীর গ্রন্থ তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হতো না।

আরবী ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের অনেকে জাহিলী যুগেও খ্যাতিমান কবি ও বাগ্মী ছিলেন। যেমন: কা'ব ইবন যুহায়র, হাস্সান ইবন ছাবিত, লাবীদ ইবন রাবী'আ (রা) প্রমূখ। ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁরা দীর্ঘ দিন সাহিত্য চর্চা করেছেন। আবার অনেকের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল ইসলামের অভ্যুদয়ের পর। তাঁদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরবী ভাষায় তখন ইসলামী সাহিত্য এক শক্তিশালী রূপে আবির্ভুত হয়েছিল।

জাহিলী ও ইসলামী যুগের আরবী সাহিত্য ও তার ইতিহাস পড়তে ও পড়াতে গিয়ে উপরের এসব বিষয়গুলো আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষত: 'আসহাবে রাসূলের জীবন কথা' লিখতে গিয়ে আমি দেখেছি, কিভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) আহবানে সাড়া দিয়ে সাহাবায়ে কিরাম সাহিত্য ও কবিতা চর্চায় মনোযোগী হয়েছেন এবং কিভাবে তার মাধ্যমে তাঁরা ইসলামের সেবা করেছেন। আমরা দেখেছি, সাহাবায়ে কিরাম ভাষা,

সাহিত্য ও কবিতা চর্চা, শেখা ও শেখানোর প্রতি অত্যধিক তাকিদ দিয়েছেন। আধুনিক কালে ইসলামের অনেক কিছুর মত এ অধ্যায়টির উপরও ধুলোবালি পড়ে আমাদের নিকট অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়, দীনদার মুসলমান বলে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সাহিত্য ও কবিতা চর্চার প্রতি এক ধরনের অনীহা। ভাবটি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, একাজ যেন দীনদারীর পরিপন্থী। তাই সময় এসেছে, বিষয়টি পঠন-পাঠনের এবং তার উপর জমা হওয়া ধূলো-বালি পরিষ্কার করে প্রকৃত সত্যকে বের করে আনার। মূলত এ লক্ষ্যেই আমার এ সামান্য প্রয়াস।

ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম পরবর্তী দেড়শো বছর পর্যন্ত আরবী গদ্য সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা খুতবা (বক্তৃতা-ভাষণ)-এর ক্রমবিকাশের একটি চিত্র আমি তুলে ধরেছি অন্য একটি গ্রন্থে। আর এ গ্রন্থে আমি সাহিত্য ও কাব্য চর্চার প্রতি ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আর এ ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম যে বাস্তব ভূমিকা রেখেছেন তা দেখানোর জন্য চৌদ্দ জন মহান সাহাবীর কাব্য ও সাহিত্য চর্চার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। এর বাইরে আরো বহু সাহাবী কবি-সাহিত্যিক আছেন যাঁদের সাহিত্য ও কাব্য কর্মও আলোচনায় আসতে পারে। সময় ও সুযোগমত আমরা সে প্রসঙ্গে যাব।

মূলত "আসহাবে রাসূলের জীবন কথা" লিখতে গিয়ে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে যে সব তথ্য–উপাত্ত সংগ্রহ করেছি এবং যার অনেক কিছু উপরোক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, তার থেকেই এ ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রন্থটি বেরিয়ে এসেছে। ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। সে ক্ষেত্রে এ প্রয়াস যদি সামান্য ভূমিকা পালন করে তাহলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

পরিশেষে পাঠকবর্গের নিকট সবিনয় অনুরোধ থাকলো, তাঁরা যেন এর ভুল-ত্রুটিগুলো আমার দৃষ্টিগোচর করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর মর্জিমত কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

২৭ এপ্রিল ২০০৩
২৪ সফর ১৪২৪ হি.

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে কবি ও কবিতা

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে আরবদের রচিত কবিতাসমূহ ইতিহাস ও সাহিত্যের গ্রন্থে আজো বিদ্যমান। সংখ্যার দিক দিয়ে যা নিতান্ত কম নয়। সে যুগের প্রতিটি ঘটনার সাথে জড়িত অসংখ্য কবিতা আমরা দেখতে পাই। এমন কোন ছোট-বড় ঘটনা নেই যার সাথে জড়িয়ে কোন কবিতা পাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাব ও তাঁর ইসলামের দাওয়াত ছিলো সে সময়ের বৃহত্তম ঘটনা। এ দাওয়াত তাদেরকে অস্ত্রধারণে বাধ্য করে। আরববাসী মু'মিন ও মুশরিক-এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যাঁরা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছিলেন এবং যারা তাদের প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের পক্ষে প্রতিরোধ খাড়া করে আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক হয়েছিলো–এদের উভয়ের কার্যাবলীর বর্ণনা সে যুগের কবিতায় রয়েছে। অবশেষে আরব উপত্যকায় ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। তবে আবূ বকরের (রা) খিলাফতকালে কোন কোন গোত্র ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেল। আরব উপদ্বীপে আবারো যুদ্ধের দাবানল প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে। এসব যুদ্ধের চিত্রও সমসাময়িক কবিদের কবিতায় সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। এরপর এলো ধারাবাহিক বিজয়। আরবরা ইসলামের মশাল হাতে নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় মুখে তাদের জেহাদের সঙ্গীত উচ্চারিত হতো। 'উছমানের হত্যাকাণ্ড, 'আলী, তালহা, যুবায়র ও আয়িশার (রা) যুদ্ধ এবং 'আলী-মু'আবিয়ার সংঘর্ষ–প্রতিটি ক্ষেত্রেই কবিরা উচ্চকিত হয়ে ওঠে। কবিতার ভাষায় তারা চিৎকার করে ওঠে।

এছাড়া এ যুগে বহু কবি কেবলমাত্র বিশেষ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নয়; বরং নিজ ব্যক্তিসত্তা ও গোত্রকে কেন্দ্র করেও ইসলামের আলোকে কাব্যচর্চা করেছেন। এ যুগে কবিতার গতি স্তব্ধ হয়নি বা পিছিয়েও পড়েনি। আর এমনটি হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। কারণ, এ যুগের প্রায় সকল অধিবাসীই তাদের জীবনের বিরাট একটি অংশ জাহেলী যুগে অতিবাহিত করে। তাদের ভাষাগত জড়তাও কেটে গিয়েছিলো। আর কবিতার মাধ্যমে তারা তাদের চিন্তা ও আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। ইসলামের আলোক প্রাপ্তির পরও তারা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী কবিতা চর্চা করতে থাকে। একদিনের জন্যেও তাদের এ ধারা বন্ধ হয়েছে, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া মুশকিল। কিতাবুল আগানী, তারিখে তাবারী, সীরাতে ইবনে হিশাম, আল-ইসাবাহ, আল-ইসতি'আব বা এ ধরনের তৎকালীন ইতিহাস ও সাহিত্যের গ্রন্থ পাঠ করলে এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এসব গ্রন্থ পাঠে মনে হবে, সে সময়ের প্রতিটি জিহ্বা থেকে যেন কবিতার ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এ সকল কবির কিছু কবিতা মুফাদ্দাল আদ-দাব্বী এবং আসমা'ঈ তাঁদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন। আর ইবনে কুতায়বা তাঁর 'আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা' এবং ইবন সাল্লাম তাঁর 'তাবাকাতু ফুহুলিশ শু'আরা' গ্রন্থে এ

যুগের শ্রেষ্ঠতম কবিদের জীবনী আলোচনা করেছেন।

আরবী সাহিত্যের উল্লেখিত উৎসগুলি পাঠ করলে প্রতীয়মান হয়, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে আরবদের কবিতা চর্চায় কোন অংশেই ভাটা পড়েনি; বরং তা যথেষ্ট উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। আর যারা বলে থাকেন, ইসলামের আবির্ভাবে কবিতার স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো বা এর ধারা দুর্বল হয়ে পড়েছিলো, তাদের এ দাবী সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) কবিতার আসরে নিজে কবিতা শুনেছেন এবং কবিদেরকে তাদের সৃষ্টির স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিদানও দিয়েছেন। আমরা জানি, মদীনার তিনজন কবি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান এবং মক্কার মুশরিক কবিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর খাড়া করেন। এঁরা ছিলেন হাস্‌সান ইবন ছাবিত, কা'ব ইবন মালিক এবং 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের শেষ দুটি বছর, যা মূলতঃ প্রতিনিধি আগমনের বছর হিসেবে খ্যাত, আগত প্রতিটি প্রতিনিধিদলের সাথে তাদের বাগ্মী বক্তা ও কবিরা থাকতো। বক্তারা আলোচনা করতো; আর কবিরা কবিতা আবৃত্তি করতো। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তা ও কবিগণ তাদের জবাব দিতেন।[১]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবদের নিকট কবিতার গুরুত্ব কমে গিয়েছিলো এবং তারা কাব্যচর্চা পরিত্যাগ করেছিলো–এমন ধারণা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা বলে থাকেন, কবিদের বিরুদ্ধে কুরআনের আক্রমণাত্মক ভূমিকার ফলেই এমনটি হয়েছিলো। কুরআন বলছে :[২]

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُ نَ– أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَهِيْمُوْنَ وَأَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ
مَالاَ يَفْعَلُوْنَ – إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا.

'বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে। তুমি কি দেখতে পাও না, তারা প্রতিটি উপত্যকায় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়? তাঁরা বাস্তবে যা করে না তাই-ই মুখে বলে বেড়ায়। তবে যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে অতিমাত্রায় তৎপর রয়েছে এবং অত্যাচারিত হলে নিজেদের আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে তাদের সম্বন্ধে – এ কথা প্রযোজ্য নয়।'

এ আয়াতে কবিদের সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিষয়টি পরিস্কারভাবে উপলব্ধির জন্যে আমাদের সামনে তৎকালীন আরব সমাজে কবিদের প্রভাব ও কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র থাকা প্রয়োজন। আরবে কবি একজন সেনাপতি, বিজেতা ও শ্রেষ্ঠ মর্যদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোন কবি শুধু তাঁর ভাষার মাধ্যমে গোত্রের পর গোত্রকে ধ্বংস ও নামবিহীন করে দিত। অনুরূপভাবে কোন

১. ইবন খালদূন, আল মুকাদ্দিমাহ্‌-৪২৭
২. সূরা আশ-শু'আরা'-২২৪-২২৭

নাম-পরিচয়বিহীন একটি গোত্রকে মাত্র একজন কবিই খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিত। এ জন্যেই যখন কোন পরিবারে কোন কবির জন্ম হতো তখন সব গোত্র থেকে অভিনন্দনবাণী আসতে থাকতো; নিমন্ত্রণ দেয়া হতো, স্ত্রীলোকেরা সমবেত হয়ে অভিনন্দন গীতি গেয়ে শুনাতো এবং কুরবানী দেয়া হতো। এ সম্পর্কে ইবনে রশিকের বক্তব্য অধ্যাপক নিকলসনের ভাষায় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

'When there appeared a poet in family of the Arabs, the other tribes round about would gather together to that family and wish them joy of their good luck. Feasts would be got ready, the women of the tribe would join together in bands, playing upon lutes, as they were wont to do at bridals, and the men and boys would congratulate one another; for a poet was a defence to the honour of them all, a weapon to ward off insult from their good name, and a means of perpetuating their glorious deeds and of establishing to thier fame forever.[৩]

আরবে কাব্য ছিলো এক মহাশক্তি। কবির একটি পংক্তিও বিফল হতো না। 'আমর ইবন কুলছুমের এক কবিতা 'তাগলাব' গোত্রকে দু'শ বছর পর্যন্ত মর্যাদা ও বীরত্বের নেশায় বিভোর রাখে। সিফ্ফিনের যুদ্ধে লায়লাতুল হারীরের দিনে আমীর মু'আবিয়া হযরত 'আলীর সম্মুখ থেকে পালাবার জন্যে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু কয়েকটি পংক্তি তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে।[৪] রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে কাফিররা যে বার বার মদীনা আক্রমণ করতো, তার মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ কবিরাই সংগঠিত করে।[৫]

জাহেলী যুগের কবিরা ছিলো সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সাধারণ লোক সুখে-দু:খে, আপদে-বিপদে তাদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলতো। এ কবিদের অনেকে গোত্রে গোত্রে কলহ-বিবাদ, ঝগড়া-ফাসাদ জিইয়ে রাখতো। তারা ফখর অথবা হিজা (কুৎসা) করে কবিতা রচনা করতো। এতে গোত্রের লোকদের মধ্যে যুদ্ধের স্পৃহা প্রবল হতো। তারা মদ, জুয়া ও অশালীন আচার-আচরণের প্রশংসায় কবিতা রচনা করতো। এভাবে মানব চরিত্রের অবনতিতে তাদের কবিতার বিশেষ অবদান ছিলো। তখন পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও কবিদের এসব ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপের নিন্দা করেছেন। মানব কল্যাণই যে মহাগ্রন্থ ও মহামানবের মূখ্য ব্রত তাঁরা এ ধরনের ভাব-বিলাসী ও অসংযমী কবি ও তাদের কবিতা অপছন্দ করবেন এটা স্বাভাবিক কথা। উল্লেখিত আয়াত দ্বারাই প্রমাণ হয় কুরআন সেই সব মুশরিক কবিদের নিন্দা ও সমালোচনা করছে যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুৎসা করে কবিতা রচনা করতো এবং

৩. *A Literary History of the Arabs,P-71*
৪. *আল-'উমাদা-১/১০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৭/২৬৫-২৬৬*
৫. *শিবলী নু'মানীর নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী : আরবী কাব্য সাহিত্য (বাংলা)-১৮৫*

তাঁর ইসলামী দাওয়াতের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সমগ্র কাব্য সাহিত্য এর উদ্দেশ্য নয়; বরং যে কবিতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পীড়া দিয়েছে কেবলমাত্র তারই সমালোচনা করা হয়েছে।[৬] এ আয়াত নাযিল হবার পর 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, কা'ব ইবন মালিক এবং হাস্‌সান ইবন ছাবিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কবিদের সম্বন্ধে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আমরা কবি।' তিনি উত্তর দিলেন, 'সম্পূর্ণ আয়াত পড়, ঈমানদার, নেককারদেরকে বলা হয়নি।' তখন তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন।[৭] একই উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম (সা) বলেন ঃ 'তোমাদের কারো পেটে (এমনি মন্দ) কবিতা থাকার চাইতে সে পেটে পূঁজ পরিপূর্ণ হয়ে তা পচে যাওয়া অনেক উত্তম।'[৮] 'আয়িশা (রা) হাদীছটি শুনে বলেছিলেনঃ হুজুর (সা) কবিতা দ্বারা ঐ সমস্ত কবিতা বুঝিয়েছেন যেগুলোতে তাঁর কুৎসা বর্ণিত হয়েছে।[৯] অশালীন, অশ্লীল এবং ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী সকল কবিতাই এ হাদীছের অন্তর্ভুক্ত ধরা যায়।

পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শানে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ •

'আমরা তাঁকে কবিতা রচনা শিক্ষা দিইনি এবং এরূপ কাজ তাঁর জন্যে শোভনীয় নয়।'[১০]

তিনি কবি ছিলেন না। তবুও আরবের মুশরিকরা তাঁর ওপর নাযিলকৃত কুরআনের বাণী শ্রবণ করে তাঁকে কবি বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। মহান আল্লাহ এ আয়াতে শুধুমাত্র প্রতিবাদ করেছেন। কাব্য চর্চার বৈধতা-অবৈধতার কোন ঘোষণা এখানে নেই। তাছাড়া নবী তো প্রত্যাদেশ বাহক। তৎকালীন আরবে কবি সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত ছিলো, তার সাথে নবুয়তের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তাই কবিতা রচনা তাঁর পক্ষে সমীচীন নয়।

অপর দিকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও কবিতা শুনতে ভালোবাসতেন। তিনি একটি সুন্দর কবিতার আবৃত্তি শুনে মন্তব্য করেন ঃ 'কোন কোন বাগ্মীতায় যাদু রয়েছে। আর কোন কবিতায় রয়েছে জ্ঞান বা হিকমাতের কথা।'[১১] একদা শারীদ ছাকাফী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাহনের পেছনে আরোহী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছে উমিয়্যার

---

৬. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-২/৪৫
৭. আ,ত,ম, মুসলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস-১২৮
৮. বুখারী ও মুসলিম
৯. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস-১৩০
১০. সূরা ইয়াসীন-৬৯
১১. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৫/২৭৩; শাওকী দায়াফ, তারীখ-২/৪৪

কবিতা শুনতে চাইলেন। তিনি আবৃত্তি করছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আরো শোনাতে বলছিলেন। তিনি সেদিন মোট একশ'টি শ্লোক শুনেছিলেন।[১২] এ কথা সকলের জানা, কুরায়শদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। এর পর পরই এ শহরের অধিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে ছিলো মক্কার কুরায়শ ও তাদের সহযোগী অন্যান্য আরব গোত্র। আর অপর দিকে ছিলেন নির্যাতিত রাসূল (সা) ও মদীনার আনসার ও মুহাজিরগণ। এ যুদ্ধের অস্ত্রধারী যোদ্ধাদের পাশাপাশি উভয়পক্ষের কবিরা কবিতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

ইসলাম-পূর্ব যুগে কুরায়শ গোত্রে উল্লেখযোগ্য কোন কবি না থাকলেও ইসলামের সাথে সংঘর্ষের যুগে তাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান, 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যিবা'রী, দারার ইবন খাত্তাব আল্ ফিহরী, আবূ 'ইজ্জাহ্ আল-জামহী, হুবায়রাহ মাখযুমী প্রমুখ কবি প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। তারা সকলে ইসলাম-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা তাদের কবিতার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা), আনসার ও মুহাজিরদের গোত্র, ব্যক্তি চরিত্র ও ইসলামের নিন্দা ও কুৎসা বর্ণনা করতে থাকে। এটা মদীনাবাসীদের জন্যে কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মুসলামনদের কুৎসা রচনা করতো শুধু এ কারণে নয়; তারা তাদের রচিত কবিতা দ্বারা অন্যান্য আরব গোত্রে ইসলামের প্রচার কার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো, এ জন্যেও। একদিন অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'যারা হাতিয়ার দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করছে, জিহ্বা দ্বারা সাহায্য করতে কে তাদেরকে বাধা দিয়েছে?' এ কথা শুনে হযরত হাস্সান ইবন ছাবিত বলেন ঃ আমি এর জন্যে প্রস্তুত।[১৩] রাসূলুল্লাহ (সা) কবিকে বলেন, আমিও তো কুরাইশ বংশের। তুমি কিভাবে তাদের নিন্দা করবে? উত্তরে তিনি বলেন, মথিত আটা থেকে চুল যেভাবে বের করে আনা হয় আমিও তদ্রুপ আপনাকে বের করে আনবো।' তাঁর জন্যে মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর স্থাপন করা হয়। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কবিতা শুনে বলতেন, 'আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ রুহুল কুদ্দুসকে দিয়ে তার সাহায্য করো।'[১৪] আর রাসূল (সা) তাঁকে এ কথাও বলেন যে, তুমি আবূ বকরের নিকট গিয়ে কুরায়শদের দোষ-ক্রটি ও দূর্বল দিকগুলি জেনে নাও। এ সম্পর্কে আবূ বকরই অধিক জ্ঞানী।[১৫] সত্যিই সেদিন হাসসান এ কাজের উপযুক্ত ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, 'তার এ

---

১২. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৫/২৭৭;৬/৭

১৩.শাওকী দায়ফ, তারীখ-২/৪৭

১৪. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস-১৩৯

১৫. হাসান যায়্যাত, তারীখ আল-আদাব-আল-আরাবী-(উর্দু)-১৮৪

কবিতা তাদের জন্যে তীরের আঘাতের চেয়েও তীব্রতর।'[১৬] এসব কারণেই তিনি সঙ্গতভাবেই 'শা'ইরুর রাসূল' বা রাসূলের কবি নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। এ কবিতার সংঘর্ষে অপর যে দু'জন কবি তাঁকে সাহায্য করেন, তাঁরা হলেন, কা'ব ইবন মালিক ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। সীরাতে ইবনে হিশাম পাঠ করলে কবিতার এ লড়াইয়ের একটা চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

আর ইসলামী সাহিত্যের ইতিহাসে কবি কা'ব ইবন যুহায়রের ঘটনাটি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইসলাম শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি যে কত উদার ও এর কত বড় পৃষ্ঠপোষক, এ ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। জাহেলী ও ইসলামী যুগের বিশিষ্ট কবি কা'ব ইবন যুহায়র। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলাম ও ইসলামের নবীর নিন্দামূলক কবিতা রচনা করে রাসূলের বিরাগভাজন হন। রাসূল (সা) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। সে ব্যক্তিই যখন ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় এলেন এবং তার বিখ্যাত কাসিদা 'বানত সূ'আদ' আবৃত্তি করে রাসূলকে (সা) শোনান, তখন রাসূল (সা) তাঁকে শুধু ক্ষমাই করেননি; বরং খুশীর আতিশয্যে তার সৃষ্টির প্রতিদান স্বরূপ নিজ দেহের চাদরটি তাঁকে উপহার দেন।[১৭]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে নাদর ইবন হারিছকে হত্যা করা হয়। এর পর তার কন্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে একটি মর্মস্পর্শী কবিতা আবৃত্তি করে। তা শুনে তিনি বলেন, 'যদি এ কবিতা নাদরের হত্যার পূর্বে শুনতাম তাহলে তাকে হত্যা করতাম না।'[১৮] তুফায়ল ইবন 'আমর আদ-দাওসী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং বলেন ঃ আমি একজন কবি, আমার কিছু কবিতা শুনুন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতে বলেন। অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ধৈর্য সহকারে তা শোনেন।[১৯]

এটা ছিলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে কবি ও কবিতার অবস্থা। তিনি নিজে কবি ছিলেন না। তবে তিনি কবিতা শুনেছেন, কবিদেরকে উৎসাহ এবং মর্যাদা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পর তাঁর সুযোগ্য খলীফাগণ ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। খুলাফায় রাশেদার আমলে কুরআন ও সুন্নাহর নীতির আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য পরিচালিত হতো। এ যুগেও কবিতা চর্চায় তেমন কোন ভাটা পড়েনি। খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদাই কবিতা আবৃত্তি করতেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীরা তো অনেক সময় মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তির আসর

---

১৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৬/৬

১৭. ইবন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়া আশ-শু'আরা'-৫৩

১৮. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগাহ্ আল-'আরাবিয়্যা-১/১৯১

১৯. প্রাগুক্ত-১/১৯০

জমাতেন।[২০] হযরত আবূ বকরের যুগে রিদ্দার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অস্ত্রধারী সৈনিকদের পাশাপাশি উভয়পক্ষ থেকে অসংখ্য কবি এসব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ পক্ষের শৌর্য-বীর্যের বর্ণনা ও শত্রুর উদ্দেশ্যে নিন্দামূলক কবিতা রচনা করেন। আবূ বকর (রা) নিজেও একজন কাব্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন। সে যুগের সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে তাঁকে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক রূপে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি কবি নাবিগাকে সে সুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন এবং বলতেন ঃ তার কবিতা শিল্পকুশলতা ও ছন্দমাধূর্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা বেশী সাবলীল।[২১]

দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা) সম্পর্কে তো প্রসিদ্ধি আছে। কোন প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের কবিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তারা তাদের কবিদের কিছু কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো এবং নিজেও কোন কোন সময় সে সব কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করতেন। বসরার শাসনকর্তা আবূ মূসা আশ'আরীকে তিনি নির্দেশ দেন ঃ 'তুমি তোমার ওখানকার লোকদেরকে কবিতা শেখার নির্দেশ দাও। কারণ, কবিতার মাধ্যমে উন্নত নৈতিকতা, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বংশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।'[২২] তিনি আরো বলতেন,[২৩]

عَلِّمُوا أولادكُم العوم والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل وثباوروهم ما يجمل من الشعر .

'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার ও তীরন্দাযী শেখাও। আর তাদেরকে নির্দেশ দাও, তারা যেন ঘোড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তাদেরকে সুন্দর সুন্দর কবিতা বলে শোনাও।' তিনি কবিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে আরো বলতেন ঃ[২৪]

الشعر جزل من كلام العرب يُسَكِّن به الغيظ وتطفأ به الثائرة ويتبلغ به القوم فى ناديهم ويعطى به السائل .

'কবিতা আরবদের সবচেয়ে ভালো ও বিশুদ্ধ কথা। এর দ্বারা রাগ প্রশমিত হয়, উত্তেজনা দমিত হয়, কোন সম্প্রদায় তাদের মজলিস-মাহফিলে যথাযথ আসন করে নিতে পারে এবং কোন প্রার্থী কিছু পেতে পারে।'

তিনি আরো বলতেন ঃ[২৫]

---

২০. শাওকী দায়ফ, তারীখ -২/৪৫
২১. ড. 'আবদুল মুন'ইম খাফাজী, মুকাদ্দিমাহ-নাকদুশ শি'র-২৩
২২. শাওকী দায়ফ, তারীখ-২/৪৫; আল-'উমদা-১/১০
২৩. হুসনুস সাহাবা-১০/২২
২৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/২৮১
২৫. আল-'উমদা-১/৯

الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه.

'কবিতা হলো কোন জাতির এমনই এক জ্ঞান ভাণ্ডার যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন জ্ঞান নেই।'

কবিতার প্রশংসায় তিনি আরো বলতেন ঃ[২৬]

أفضل صناعات الرجل الأبيات من الشعر، يقدمها فى حاجاته، يستعطف بها قلب الكريم، ويستميل بها قلب اللئيم.

'মানুষের উত্তম শিল্প হলো কবিতা। সে তার প্রয়োজনে তা উপস্থাপন করতে পারে, তার দ্বারা সে মহানুভব ব্যক্তির অন্তর বিগলিত করতে পারে এবং ইতর প্রকৃতির মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করতে পারে।'

ইবনে সাল্লাম আল-জুমাহী বলেন, 'তিনি যে কোন ধরনের ঘটনা বা ব্যাপারের সম্মুখীন হলেই সে সম্পর্কে কবিতার দু'একটি পংক্তির উদ্ধৃতি দিতেন।'[২৭] আরবী সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে হযরত 'উমারকে সে যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচক গণ্য করা হয়েছে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি শুধু রুচির ভিত্তিতে কারো সমালোচনা না করে সঙ্গে সঙ্গে তার কারণও ব্যাখ্যা করেন। তিনি কবি যুহায়রকে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন। শুধু এ সিদ্ধান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সঙ্গে সঙ্গে তার কারণও বিশ্লেষণ করেন।

যুহায়র সম্পর্কে তিনি বলতেন ঃ[২৮]

كان لايعاظل، وكان يتجنب وحشى الكلام، ولم يمدح أحدا إلا بما فيه،

'তিনি এক কথার মধ্যে আরেক কথা গুলিয়ে ফেলতেন না। জংলী ও অশোভন কথাও এড়িয়ে চলতেন। কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান গুণেরই তিনি প্রশংসা করেছেন। কোন রকম অতিরঞ্জিত করেননি।'

'আয়েশী বলেন ঃ হযরত 'উমার ইবন খাত্তাব ছিলেন কবিতা সম্পর্কে সকলের থেকে বিজ্ঞ।[২৯] তিনি এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সমবেত হয়ে কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং কার কোন কবিতা সর্বোৎকৃষ্ট সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতেন।[৩০]

---

২৬. আল 'ইকদ আল-ফারীদ-৫/২৭৪

২৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৪১

২৮. ইবন সাল্লাম, তাবাকাত আশ-শু'আরা'-২৯; আল-বাকিল্লানী, ই'জায আল-কুরআন-১৩৪ আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/২৭০; আশ শি'র ওয়াশ শু'আরা'-৫১

২৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৩৯

৩০. নাক্‌দ আশ-শি'র, মুকাদ্দিমা-২৩

হযরত 'উমারের শাহাদাতের পর যথাক্রমে হযরত 'উছমান ও 'আলী তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। তাঁরা তাঁদের শাসনকার্যে 'উমারের নীতিই অনুসরণ করেন। তাঁদের যুগেও কবিরা ইসলামী নীতিমালার গণ্ডীতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলো। এ যুগেও অসংখ্য কবির সন্ধান পাওয়া যায়। হযরত 'উছমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সে যুগের কবি-সমাজকেও প্রভাবিত করে। মুবাররাদের কামিল, তাবারীর ইতিহাস ও ইসতি'আব গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যায় অস্যংখ্য সাহাবী কবি এ ঘটনা স্মরণ করে কবিতা রচনা করেছেন, 'উসমানের হত্যাকাণ্ডে মরসিয়া গেয়েছেন, হত্যাকারীদের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন।

আর ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। সে যুগের আরব কবিদের মধ্যে তিনিও একজন শ্রেষ্ঠ কবি। 'দিওয়ানে 'আলী' নামক কাব্য সংকলন গ্রন্থটি আজো তাঁর কাব্য-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এ দিওয়ানের সব ক'টি কবিতা হযরত 'আলীর নয়। তবে অন্যান্য আরব কবিদের অসংখ্য কবিতার ন্যায় তাঁরও বহু কবিতা যে রক্ষিত হয়নি, এ কথাও সত্য। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে তাঁর অবদান এ ভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে, মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনিই সর্বপ্রথম আরবী ব্যাকরণের মূল সূত্র উদ্ভাবন করেন এবং আরবী শব্দরাজিকে ইসম, ফে'ল এবং হরফ- এ তিনিটি ভাগে বিভক্ত করেন।[৩১] তাঁর হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করে সে যুগের অসংখ্য কবি কবিতা রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন আরবী সাহিত্যের একজন সমঝদার সমালোচক। কেবলমাত্র সাহিত্যিক-সৌন্দর্য ও ভাষার অভিনবত্বের কারণে তিনি জাহেলী যুগের ভোগবাদী কবি ইমরুল কায়সকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন।[৩২]

রাসূলুল্লাহর (সা) খলীফারা ছাড়াও অন্যান্য সাহাবীরা কবিতা চর্চা করতেন। নিজেরা কবিতা লিখতেন ও অন্যদেরকে কবিতা শিখতে নির্দেশ দিতেন। হযরত 'আয়িশা (রা) বলেনঃ তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে কবিতা শিক্ষা দিবে। এর কারণস্বরূপ তিনি বলেন, 'এতে তাদের ভাষার আড়ষ্টতা দূর হয়ে সহজ সাবলীল হবে।'[৩৩] আবূ বকর, 'উমার, 'উছমান এবং 'আলী-এ চার খলীফার প্রত্যেকেই কবি ছিলেন। বিখ্যাত তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) বলেন:[৩৪]

وكان أبوبكر شاعرا، وعمر شاعرا، وعلى أشعر الثلاثة.

'আবূ বকর (রা) কবি ছিলেন। 'উমার (রা) কবি ছিলেন। আর আলী (রা) ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।'

---

৩১. ড. মুহাম্মদ শাতির, আল্ মু'জায ফী নাশআতিন নাহবি-১৪

৩২. নাক্‌দ আশ-শি'র মুকাদ্দিমা-২৩

৩৩. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/২৭৪; ৬/৭

৩৪. প্রাগুক্ত-৫/২৮৩

কোন এক যুদ্ধ সম্পর্কে আবূ বকরের (রা) একটি বীরত্বব্যঞ্জক কাসীদা বর্ণিত হয়েছে। 'উমার (রা) ও 'উছমানের (রা) কিছু জ্ঞানগর্ব শ্লোকও বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত দেখা যায়। আর 'আলীর (রা) তো একটি দিওয়ানই আছে। এমনকি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের এমন কাকেও পাওয়া মুশকিল যিনি কোন কবিতা রচনা করেননি, অথবা কখনো কবিতা আবৃত্তি করেননি।[৩৫] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খাদেম প্রখ্যাত সাহাবী আনাস (রা) বলেন ঃ

وَقَدمَ علينا رسول الله عليه وسلم، وما فى الأنصاربيت إلا وهو يقول الشعر.

'রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আমাদের এখানে আসেন তখন আনসারদের প্রতিটি গৃহেই কবিতা পাঠ হতো।'

হযরত 'আবদুলল্লাহ ইবন 'আব্বাস বলেন ঃ 'পবিত্র কুরআন পাঠ করে যদি কোথাও বুঝতে না পার তাহলে তার অর্থ আরবদের কবিতার মাঝে অনুসন্ধান করো।'[৩৬]

'উমার (রা) কুরআনের আয়াতের অর্থ বুঝতে কবিতার শরণাপন্ন হতেন। একবার তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে সূরা আন-নাহলের ৪৭ তম আয়াত-

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

পাঠ করেন। তারপর উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের নিকট আয়াতে উল্লেখিত "التخوف" শব্দটির অর্থ জানতে চান। সাহাবায়ে কিরাম সকলে চুপ থাকলেন। তখন হুযায়ল গোত্রের এক বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! এটা আমাদের উপ-ভাষা। التخوف অর্থ "التنقص"। আর এর অর্থ অল্প অল্প নেয়া। 'উমার (রা) বৃদ্ধের নিকট জানত চাইলেন, আরবরা কি তাদের কবিতা থেকে অর্থ জানতে পারে? অর্থাৎ আরব কবিরা কি তাদের কবিতায় এ অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন? বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ, আমাদের কবি আবূ কাবির আল হুযালী তার উষ্ট্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি শ্লোকে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তারপর বৃদ্ধ শ্লোকটি আবৃত্তি করে শোনান। 'উমার (রা) তখন বলেন ঃ তোমরা তোমাদের দীওয়ান সংরক্ষণ করে রাখো, তাহলে তোমরা আর গোমরাহ হবেনা।[৩৭]

একবার যিয়াদ তাঁর এক ছেলেকে আমীর মু'আবিয়ার (রা) নিকট পাঠালেন। মু'আবিয়া (রা) জ্ঞান-গরিমা পরীক্ষার জন্য তাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। দেখলেন, ছেলেটির সব বিষয়ে যথেষ্ট বুৎপত্তি আছে। সবশেষে তিনি তাকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন বললেন। এবার ছেলেটি অক্ষমতা প্রকাশ করলো। তখন মু'আবিয়া (রা) যিয়াদকে লিখলেন ঃ 'তুমি তোমার ছেলেকে কবিতা শেখাওনি কেন? আল্লাহর কসম! কবিতা

---

৩৫. জুরজী যায়দান, তারীখ-১/১৯২; প্রাগুক্ত-৫/২৮৩
৩৬. জুরজী যায়দান-১/১৯২
৩৭. লিসান-আল-'আরাব-২/১৯৯২;তাজুল 'আরূজ-৬/১০৬

শিখলে সে অবাধ্য থাকলে বাধ্য হবে, কৃপণ থাকলে দাতা হবে এবং ভীরু থাকলে সাহসী হয়ে যুদ্ধে যাবে।'[৩৮]

বিখ্যাত মুহাদ্দিছ তাবি'ঈ আশ-শা'বীর (রহ) কবিতার জ্ঞান তাঁর হাদীছের জ্ঞানের চেয়ে মোটেও কম ছিল না। তিনি বলতেন, আমি যদি ইচ্ছা করি লাগাতার এক মাস কোন পুনরাবৃত্তি ছাড়াই মুখস্ত কবিতা আবৃত্তি করবো, তা করতে পারি।[৩৯]

ইসলামের পঞ্চম খলিফা হযরত 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযিযের স্ত্রী ছিলেন একজন বিশিষ্ট আরব কবি। ইবাদাত ও খিলাফতের কাজে ব্যস্ত থাকায় স্ত্রীকে বেশী সঙ্গ দিতে পারতেন না। তাই তিনি স্বামীর প্রতি অভিযোগের সূরে যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন তা অতি চমকপ্রদ।[৪০] এমনিভাবে আমরা দেখতে পাই মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের অনেকেই কাব্য চর্চা করতেন এবং এটাকে নিন্দনীয় কাজও মনে করতেন না। স্পেনের জাহেরী ফেকা শাস্ত্রের ইমাম ইবন হাযাম ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর সাহিত্য তত্ত্বের গ্রন্থ 'তাওকুল হামামাহ্' আজো সারা বিশ্বের সাহিত্য তাত্ত্বিকদের নিকট নন্দিত।

এ দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, ইসলাম কাব্যচর্চাকে ঘৃণা করেনি বা এটাকে অবৈধ কাজ বলেও মনে করেনি। আর ইসলামের আবির্ভাবে একদিনের জন্যেও আরবদের কাব্যচর্চার গতি স্তিমিত হয়ে পড়েনি। তবে পবিত্র কুরআন যে বিপ্লবী দাওয়াত নিয়ে এসেছিলো তা তাদের কবিতার অঙ্গনে এক পরিবর্তন আনয়ন করে। জাহেলী যুগের সাহিত্যের প্রায় সব ধরনের ভাব, বিষয়-বস্তু ও শিল্পকারিতা ইসলামী আলোকে নিষিদ্ধ হয় এবং তার পরিবর্তে ইসলাম এক নতুন মূল্যবোধের আলোকে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির আহবান জানায়। এ আহ্বানে সাড়া দেয়া সকল কবির পক্ষে সম্ভব হলেও খুব সহজ ছিল না। তাছাড়া কুরআনের ভাষাগত সৌন্দর্যে অনেক বড় বড় আরব কবির মন অভিভূত হয়ে পড়েছিলো, তারা আর কবিতা রচনায় পূর্বের মত মনোযোগ দিতে পারেনি। জাহেলী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি লাবিদ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কবিতা চর্চা ছেড়ে দেন। কারণ স্বরূপ তিনি বলতেন, এখন কুরআনই যথেষ্ট। তাছাড়া সেটা ছিলো আন্দোলন ও প্রচারের যুগ, সে বৃহৎ কাজে প্রায় সকলেই ছিলো ব্যস্ত। তাই নুতন ধারায় কবিতা চর্চায় পূর্বের তুলনায় কিছুটা ভাটা পড়া স্বাভাবিক।

ইসলাম চেয়েছে মানুষের কথা, কাজ ও চিন্তাকে একই খাতে প্রবাহিত করতে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম কাব্যক্ষেত্রেও একটি মূলনীতি পেশ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি হাদীছে জানা যায়, 'কবিতা সুসামঞ্জস্য কথামালা। যে কবিতা সত্যনিষ্ঠ তা সুন্দর। আর যে কবিতায় সত্যের অপলাপ হয়েছে, তাতে মঙ্গল নেই।'[৪১] অন্য একটি

৩৮. আল-'ইকদ আল ফারীদ-৫/২৭৪

৩৯. প্রাগুক্ত-৫/২৭৫

৪০. প্রাগুক্ত-৬/৪০৯

৪১. মিশকাত

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, 'কবিতা কথার মতই। ভালো কথা যেমন সুন্দর, ভালো কবিতাও তেমনি সুন্দর। আর মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতই মন্দ।'[৪২] তাই রাসূলুল্লাহ (সা) জাহেলী যুগের কবি উমাইয়া ইবন আবিস সুলতের কিছু পংক্তি শুনে বলেছিলেন, 'তার কবিতা ঈমান এনেছে, কিন্তু তার হৃদয় কুফরকেই আঁকড়ে ধরেছে।' জাহেলী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি তারাফার একটি চরণ রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সামনে আবৃত্তি করা হলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'এতো নবীদের কথা।' পংক্তিটি ছিলো এরূপ ঃ

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا + ويأتيك بالأخبار من لم تزود

'আজ তুমি যা অবগত নও, কালের চক্রে তোমার কাছে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর তোমাকে এমন সব ব্যক্তির খবর পরিবেশন করবে যারা তাদের ভ্রমণে কোন পাথেয় সঙ্গে নেয়নি।'[৪৩]

এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যায় ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও সার্বজনীন সত্যের আলোকে যে কেউ কবিতা রচনা করলে তা হবে সত্যিকার ইসলামী কবিতা। সে কবির ধর্ম-বিশ্বাস বা পরিচয় যাই হোক না কেন। অপরপক্ষে ইসলামী ভাবধারা বিরোধী কবিতা হবে জাহেলী কবিতা। তা সে কবি যে কোন যুগ বা কালের ও যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন। সে কবিতা বাস্তববাদিতা, প্রতীক-ধর্মিতা, সমাজবাদিতা, ক্লাসিক বা রোমান্টিক যে কোন নাম বা পদ্ধতিতেই হোক না কেন ইসলামী পদ্ধতির সাথে তার কোন মিল নেই। এ কারণে আমরা উমাইয়া ও আব্বাসী যুগের আরবী সাহিত্য তথা মুসলিম বিশ্বের সর্বকালের সর্বভাষার মুসলিম কবিদের রচিত কবিতার একটি বিরাট অংশ ইসলামী কবিতা বলতে পারিনা। পক্ষান্তরে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার বহু অমুসলিম কবিদের অনেক কবিতা সত্যিকার ইসলামী কবিতা বলা যায়।

---

৪২. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস-১৩২
৪৩.নাক্দ আশ-শি'র, মুকাদ্দিমা-২৩

‘আলী ইবন আবী তালিব (রা)

নাম ‘আলী, লকব আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মুরতাজা, কুনিয়াত আবুল হাসান ও আবূ তুরাব। পিতা আবূ তালিব ‘আবদু মান্নাফ, মাতা ফাতিমা। পিতা-মাতা উভয়ে কুরায়শ বংশের হাশিমী শাখার সন্তান। ‘আলী রাসূলুল্লাহর (সা) আপন চাচাতো ভাই।

রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম। আবূ তালিব ছিলেন ছাপোষা মানুষ। চাচাকে একটু সাহায্য করার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন ‘আলীকে। এভাবে নবী পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তিনি বেড়ে ওঠেন। রাসূল (সা) যখন নবুওয়াত লাভ করেন, ‘আলীর বয়স তখন নয় থেকে এগারো বছরের মধ্যে। একদিন ঘরের মধ্যে দেখলেন, রাসূলে কারীম (সা) ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) সিজদাবনত। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? উত্তর পেলেন, এক আল্লাহর ইবাদাত করছি। তোমাকেও এর দাওয়াত দিচ্ছি। ‘আলী তাঁর মুরব্বির দাওয়াত বিনা দ্বিধায় কবুল করেন। মুসলমান হয়ে যান। কুফর, শিরক ও জাহিলিয়্যাতের কোন অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সর্ব প্রথম হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) নামায আদায় করেন। এ ব্যাপারে কোন মত পার্থক্য নেই। অবশ্য আবূ বকর, ‘আলী ও যায়দ ইবন হারিছা-এ তিন জনের কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।[১]

ইবন ‘আব্বাস ও সালমান ফারেসীর (রা) বর্ণনা মতে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রা) পর ‘আলী (রা) সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে এ সম্পর্কে সবাই একমত যে, মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা, বয়স্ক আযাদ পুরুষদের মধ্যে আবূ বকর, দাসদের মধ্যে যায়দ ইবন হারিছা ও কিশোরদের মধ্যে ‘আলী (রা) প্রথম মুসলমান।

নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে রাসূলে কারীম (সা) হুকুম দিলেন ‘আলীকে, কিছু লোকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর। ‘আবদুল মুত্তালিব খান্দানের সব মানুষ উপস্থিত হল। আহার পর্ব শেষ হলে রাসূল (সা) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি, যা দীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য কল্যাণকর। আপনাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গী হবে? সকলেই নিরব। হঠাৎ ‘আলী (রা) বলে উঠলেন ঃ ‘যদিও আমি অল্পবয়স্ক, চোখের রোগে আক্রান্ত, দুর্বল দেহ, আমি সাহায্য করবো আপনাকে।’

হিজরাতের সময় হল। অধিকাংশ মুসলমান মক্কা ছেড়ে মদীনা চলে গেছেন। রাসূলে কারীম (সা) আল্লাহর হুকুমের প্রতীক্ষায় আছেন। এ দিকে মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাসূলে কারীমকে (সা) দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সা) এ খবর জানিয়ে দেন। তিনি মদীনায় হিজরাতের অনুমতি লাভ

---

১. *তাবাকাত-৩/২১*

করেন। কাফিরদের সন্দেহ না হয়, এ জন্য 'আলীকে রাসূল (সা) নিজের বিছানায় ঘুমাবার নির্দেশ দেন এবং সিদ্দীকে আকবরকে সঙ্গে করে রাতের অন্ধাকারে মদীনা রওয়ানা হন। 'আলী (রা) রাসূলে কারীমের (সা) চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে ঘুমালেন। তিনি জানতেন, এ অবস্থায় তার জীবন চলে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রত্যয় ছিল, এভাবে জীবন গেলে তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু হবে না। সুবহে সাদিকের সময় মক্কার পাষণ্ডরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পেল, রাসূলে কারীমের (সা) স্থানে তাঁরই এক ভক্ত জীবন কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে শুয়ে আছে। তারা ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ তা'আলা 'আলীকে (রা) হিফাজত করেন।

এ হিজরাত প্রসঙ্গে হযরত 'আলী (সা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা রওয়ানার পূর্বে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি মক্কায় থেকে যাব এবং লোকদের যে সব আমানত তাঁর কাছে আছে তা ফেরত দেব। এ জন্যই তো তাঁকে 'আল-আমীন' বলা হতো। আমি তিন দিন মক্কায় থাকলাম। তারপর রাসূলুল্লাহর (সা) পথ ধরে মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে বনী 'আমর ইবন 'আওফ- যেখানে রাসূল (সা) অবস্থান করছিলেন, আমি উপস্থিত হলাম। কুলছূম ইবন হিদামের বাড়ীতে আমার আশ্রয় হল।' অন্য একটি বর্ণনায়, 'আলী (রা) রাবী'উল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি কুবায় উপস্থিত হন। রাসূল (সা) তখনো কুবায় ছিলেন।[২]

মাদানী জীবনের সূচনাতে রাসূল (সা) যখন মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে 'মুয়াখাত বা দীনী-ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করছিলেন, তিনি নিজের একটি হাত 'আলীর (রা) কাঁধে রেখে বলেছিলেন, 'আলী! তুমি আমার ভাই। তুমি হবে আমার এবং আমি হব তোমার উত্তরাধিকারী।[৩] পরে রাসূল (সা) 'আলী ও সাহল বিন হুনাইফের মধ্যে ভ্রাতৃসম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন।[৪]

হিজরী দ্বিতীয় সনে হযরত 'আলী (রা) রাসূলে কারীমের (সা) জামাই হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমার (রা) সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

ইসলামের জন্য হযরত 'আলীর অবদান অবিস্মরণীয়। রাসূলে কারীমের (সা) যুগের সকল যুদ্ধে তিনি সবচেয়ে বেশী সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। এ কারণে রাসূল (সা) তাঁকে 'হায়দার' উপাধিসহ 'যুল-ফিকার' নামক তরবারি দান করেন।

---

২. প্রাগুক্ত-৩/২২

৩. প্রাগুক্ত

৪.প্রাগুক্ত-৩/২৩

একমাত্র তাবুক অভিযান ছাড়া সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। বদরে তাঁর সাদা পশমী রুমালের জন্য তিনি ছিলেন চিহ্নিত। কাতাদা থেকে বর্ণিত, বদরসহ প্রতিটি যুদ্ধে 'আলী ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পতাকাবাহী।[৫]

উহুদে যখন অন্যসব মুজাহিদ পরাজিত হয়ে পলায়নরত ছিলেন, তখন যে ক'জন মুষ্টিমেয় সৈনিক রাসূলুল্লাহকে (সা) কেন্দ্র করে ব্যূহ রচনা করেছিলেন, 'আলী (রা) তাঁদের একজন। অবশ্য পলায়নকারীদের প্রতি আল্লাহর ক্ষমা ঘোষিত হয়েছে।

ইবন ইসহাক থেকে বর্ণিত, খন্দকের দিনে 'আমর ইবন আবদে উদ্দ বর্ম পরে বের হ'ল। সে হুংকার ছেড়ে বললো ঃ কে আমার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে? 'আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী, আমি প্রস্তুত। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'এ হচ্ছে 'আমর, তুমি বস।' 'আমর আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিল ঃ আমার সাথে লড়বার মত কেউ নেই? তোমাদের সেই জান্নাত এখন কোথায়, যাতে তোমাদের নিহতরা প্রবেশ করবে বলে তোমাদের ধারণা? তোমাদের কেউই এখন আমার সাথে লড়তে সাহসী নয়? 'আলী (রা) উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি প্রস্তুত। রাসূল (সা) বললেন ঃ বস। তৃতীয় বারের মত আহবান জানিয়ে 'আমর তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। 'আলী (রা) আবার উঠে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি প্রস্তুত। রাসূল (সা) বললেন ঃ সে তো 'আমর'। 'আলী (রা) বললেন ঃ তা হোক। এবার 'আলী (রা) অনুমতি পেলেন। 'আলী (রা) তাঁর একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে 'আমরের দিকে এগিয়ে গেলেন। 'আমর জিজ্ঞেস করলো ঃ তুমি কে? বললেন ঃ 'আলী। সে বললো ঃ 'আবদে মান্নাফের ছেলে? 'আলী বললেন ঃ আমি আবূ তালিবের ছেলে 'আলী। সে বললো ঃ ভাতিজা, তোমার রক্ত ঝরানো আমি পছন্দ করিনে। 'আলী (রা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি কিন্তু তোমার রক্ত ঝরানো অপছন্দ করিনে। এ কথা শুনে 'আমর ক্ষেপে গেল। নীচে নেমে এসে তরবারি টেনে বের করে ফেললো। সে তরবারি যেন আগুনের শিখা। সে এগিয়ে 'আলীর ঢালে আঘাত করে ফেঁড়ে ফেললো। 'আলী পাল্টা এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠেন। তারপর 'আলী নিজের একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে আসেন।[৬]

সপ্তম হিজরীতে খায়বার অভিযান চালানো হয়। সেখানে ইয়াহুদীদের কয়েকটি সুদৃঢ় কিল্লা ছিল। প্রথমে সিদ্দীকে আকবর, পরে ফারুকে আ'জমকে কিল্লাগুলি পদানত করার

---

৫. আল- বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১০৬

৬. প্রাগুক্ত

দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু তাঁরা কেউই সফলকাম হতে পারলেন না। নবী (সা) ঘোষণা করলেন ঃ 'কাল আমি এমন এক বীরের হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়পাত্র। তারই হাতে কিল্লাগুলির পতন হবে।' পরদিন সকালে সাহাবীদের সকলেই আশা করছিলেন এই গৌরবটি অর্জন করার। হঠাৎ 'আলীর ডাক পড়লো। তাঁরই হাতে খায়বারের সেই দুর্জয় কিল্লাগুলির পতন হয়।

তাবুক অভিযানে রওয়ানা হওয়ার সময় রাসূল (সা) 'আলীকে (রা) মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। 'আলী (রা) আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আপনি যাচ্ছেন, আর আমাকে নারী ও শিশুদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছেন? উত্তরে রাসূল (সা) বললেন ঃ হারূন যেমন ছিলেন মূসার, তেমনি তুমি হচ্ছো আমার প্রতিনিধি। তবে আমার পরে কোন নবী নেই।[৭]

নবম হিজরীতে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে প্রথম ইসলামী হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ছিলেন আমীরুল হজ্জ্ব। তবে কাফিরদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণার জন্য রাসূল (সা) 'আলীকে (রা) বিশেষ দূত হিসেবে পাঠান।

দশম হিজরীতে ইয়ামনে ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত খালিদ সাইফুল্লাহকে পাঠানো হয়। ছ'মাস চেষ্টার পরও তিনি সফলকাম হতে পারলেন না। ফিরে এলেন। রাসূলে কারীম (সা) 'আলীকে (রা) পাঠানোর কথা ঘোষণা করলেন। 'আলী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ আপনি আমাকে এমন লোকদের কাছে পাঠাচ্ছেন যেখানে নতুন নতুন ঘটনা ঘটবে অথচ বিচার ক্ষেত্রে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। উত্তরে রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে সঠিক রায় এবং তোমার অন্তরে শক্তিদান করবেন। তিনি 'আলীর (সা) মুখে হাত রাখলেন। 'আলী বলেন ঃ 'অতঃপর আমি কখনো কোন বিচারে দ্বিধাগ্রস্ত হইনি।' যাওয়ার আগে রাসূল (সা) নিজ হাতে 'আলীর (রা) মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দু'আ করেন। 'আলী ইয়ামনে পৌঁছে তাবলীগ শুরু করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সকল ইয়ামনবাসী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং হামাদান গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে যায়। রাসূল (সা) 'আলীকে (রা) দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তিনি দু'আ করেন ঃ আল্লাহ্, 'আলীকে না দেখে যেন আমার মৃত্যু না হয়। হযরত 'আলী বিদায় হজ্জের সময় ইয়ামন থেকে হাজির হয়ে যান।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর তাঁর নিকট-আত্মীয়রাই কাফন দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত 'আলী (রা) গোসল দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

---

৭. প্রাগুক্ত-১৩১

হযরত আবূ বকর, হযরত 'উমার ও হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফত মেনে নিয়ে তাঁদের হাতে বাইয়াত করেন এবং তাঁদের যুগের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে শরীক থাকেন। অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতেও হযরত 'উছমানকে পরামর্শ দিয়েছেন। যেভাবে আবূ বকরকে 'সিদ্দীক', 'উমারকে 'ফারুক' এবং 'উছমানকে 'গণী' বলা হয়, তেমনিভাবে তাঁকেও 'আলী মুরতাজা' বলা হয়। হযরত আবূ বকর ও 'উমারের যুগে তিনি মন্ত্রী ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। হযরত 'উছমানও সব সময় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।[৮]

বিদ্রোহীদের দ্বারা হযরত 'উছমান ঘেরাও হলে তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে 'আলীই (রা) সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেন। সেই ঘেরাও অবস্থায় হযরত 'উছমানের (রা) বাড়ীর নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসায়নকে (রা) নিয়োগ করেন।[৯]

হযরত 'উমার (রা) ইনতিকালের পূর্বে ছ'জন বিশিষ্ট সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের মধ্যে থেকে কাউকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের অসীয়াত করে যান। 'আলীও ছিলেন তাঁদের একজন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'আলীর (রা) সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ লোকেরা যদি 'আলীকে খলীফা বানায়, তবে তিনি তাদেরকে ঠিক রাস্তায় পরিচালিত করতে পারবেন।[১০]

হযরত 'উমার তাঁর বায়তুল মাকদাস সফরের সময় 'আলীকে (রা) মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান।

হযরত 'উছমানের (রা) শাহাদাতের পর বিদ্রোহীরা হযরত তালহা, যুবায়র ও 'আলীকে (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য চাপ দেয়। প্রত্যেকেই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানান। বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, হযরত 'আলী (রা) বার বার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন। অবশেষে মদীনাবাসীরা হযরত 'আলীর (রা) কাছে গিয়ে বলে, খিলাফতের এ পদ এভাবে শূণ্য থাকতে পারে না। বর্তমানে এ পদের জন্য আপনার চেয়ে অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি নেই। আপনিই এর হকদার। মানুষের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। তবে শর্ত আরোপ করেন যে, আমার বাইয়াত গোপনে হতে পারবে না। এজন্য সর্বশ্রেণীর মুসলমানের সম্মতি প্রয়োজন। মসজিদে নববীতে সাধারণ সভা হলো। মাত্র ষোল সতেরো জন সাহাবা ছাড়া সকল মুহাজির ও আনসার 'আলীর (রা) হাতে বাইয়াত করেন।

অত্যন্ত জটিল এক পরিস্থিতির মধ্যে হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতের সূচনা হয়।

---

৮. মুরুজ আয-যাহাব-২/২

৯. ড. ত্বাহা হুসায়ন, আল-ফিতনাতুল কুবরা-৯২.

১০. প্রাগুক্ত.

খলীফা হওয়ার পর তাঁর প্রথম কাজ ছিল হযরত 'উছমানের (রা) হত্যাকারীদের শাস্তি বিধান করা। কিন্তু কাজটি সহজ ছিল না। প্রথমতঃ হত্যাকারীদের কেউ চিনতে পারেনি। হযরত 'উছমানের স্ত্রী হযরত নায়িলা হত্যাকারীদের দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের কাউকে চিনতে পারেননি। মুহাম্মদ ইবন আবী বকর হত্যার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত 'উছমানের এক ক্ষোভ-উক্তির মুখে তিনি পিছটান দেন। মুহাম্মদ ইবন আবী বকরও হত্যাকারীদের চিনতে পারেননি। দ্বিতীয়তঃ মদীনা তখন হাজার হাজার বিদ্রোহীদের কব্জায়। তারা হযরত 'আলীর (রা) সেনাবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু তাঁর এই অসহায় অবস্থা তৎকালীন অনেক মুসলমানই উপলব্ধি করেননি। তাঁরা হযরত 'আলীর (রা) নিকট তখনি হযরত উছমানের (রা) 'কিসাস' দাবী করেন। এই দাবী উত্থাপনকারীদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) সহ তালহা ও যুবায়রের (রা) মত বিশিষ্ট সাহাবীরাও ছিলেন। তাঁরা হযরত 'আয়িশার (রা) নেতৃত্বে সেনাবাহিনীসহ মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁদের সমর্থকদের সংখ্যা ছিল বেশী। 'আলীও (রা) তাঁর সেনাবাহিনীসহ সেখানে পৌঁছেন। বসরার উপকণ্ঠে বিরোধী দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। হযরত 'আয়িশা (রা) 'আলীর (রা) কাছে তাঁর দাবী পেশ করেন। 'আলীও তাঁর সমস্যাসমূহ তুলে ধরেন। যেহেতু উভয় পক্ষেই ছিল সততা ও নিষ্ঠা তাই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। হযরত তালহা ও যুবায়র ফিরে চললেন। 'আয়িশাও ফেরার প্রস্তুতি শুরু করলেন। কিন্তু হাংগামা ও অশান্তি সৃষ্টিকারীরা উভয় বাহিনীতেই ছিল। তাই আপোষ মীমাংসায় তারা ভীত হয়ে পড়ে। তারা সুপরিকল্পিতভাবে রাতের অন্ধকারে এক পক্ষ অন্য পক্ষের শিবিরে হামলা চালিয়ে দেয়। ফল এই দাঁড়ায়, উভয় পক্ষের মনে এই ধারণা জন্মালো যে, আপোষ মীমাংসার নামে ধোঁকা দিয়ে প্রতিপক্ষ তাঁদের ওপর হামলা করে বসেছে। পরিপূর্ণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।'আলীর (রা) জয় হয়। তিনি বিষয়টি হযরত 'আয়িশাকে (রা) বুঝাতে সক্ষম হন। 'আয়িশা (রা) বসরা থেকে মদীনায় ফিরে যান।

যুদ্ধের সময় 'আয়িশা (রা) উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। ইতিহাসে তাই এ যুদ্ধ উটের যুদ্ধ নামে খ্যাত। হিজরী ৩৬ সনের জামাদিউছ ছানী মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারার সদস্য হযরত তালহা ও যুবায়রসহ উভয় পক্ষে মোট তের হাজার মুসলমান শহীদ হন। অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। হযরত 'আলী (রা) পনের দিন বসরায় অবস্থানের পর কূফায় চলে যান। রাজধানী মদীনা থেকে কূফায় স্থানান্তরিত হয়।

হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে তো একটা আপোষরফায় আসা গেল। কিন্তু সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়ার সাথে কোন মীমাংসায় পৌঁছা গেল না। হযরত 'আলী (রা) তাঁকে সিরিয়ার গভর্ণর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) বেঁকে বসলেন।

'আলীর (রা) নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলেন। তাঁর বক্তব্যের মূলকথা ছিল, 'উছমান (রা) হত্যার কিসাস না হওয়া পর্যন্ত তিনি 'আলীকে (রা) খলীফা বলে মানবেন না।

হিজরী ৩৭ সনের সফর মাসে 'সিফফীন' নামক স্থানে হযরত 'আলী ও হযরত মু'আবিয়ার (রা) বাহিনীর মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে যায়। এ সংঘর্ষ ছিল উটের যুদ্ধ থেকেও ভয়াবহ। উভয় পক্ষে মোট ৯০,০০০ (নব্বই হাজার) মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আম্মার ইবন ইয়াসীর, খুযাইর, খুযাইমা ইবন ছাবিত, ও আবূ 'আম্মারা আল-মাযিনীও ছিলেন। তাঁরা সকলেই 'আলীর (রা) পক্ষে মু'আবিয়ার (রা) বাহিনীর হাতে শহীদ হন। উল্লেখ্য যে, 'আম্মার ইবন ইয়াসির সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছিলেনঃ 'আফসোস, একটি বিদ্রোহী দল 'আম্মারকে হত্যা করবে।'[১১]

সাতাশ জন প্রখ্যাত সাহাবী এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হযরত মু'আবিয়াও হাদীছটির একজন বর্ণনাকারী। অবশ্য হযরত মু'আবিয়া (রা) হাদীছটির ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এত কিছুর পরেও বিষয়টির ফায়সালা হলো না।

সিফফীনের সর্বশেষ সংঘর্ষে, যাকে 'লাইলাতুল হার' বলা হয়, হযরত 'আলীর (রা) জয় হতে চলেছিল। হযরত মু'আবিয়া (রা) পরাজয়ের ভাব বুঝতে পেরে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মীমাংসার আহ্বান জানালেন। তাঁর সৈন্যরা বর্শার মাথায় কুরআন ঝুলিয়ে উঁচু করে ধরে বলতে থাকে, এই কুরআন আমাদের এ দ্বন্দ্বের ফায়সালা করবে। যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলো। হযরত 'আলীর (রা) পক্ষে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এবং হযরত মু'আবিয়ার (রা) পক্ষে হযরত 'আমর ইবনুল 'আস হাকাম বা সালিশ নিযুক্ত হলেন। সিদ্ধান্ত হলো, এই দুইজনের সম্মিলিত ফায়সালা বিরোধী দু'পক্ষই মেনে নেবেন।'দুমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে মুসলমানদের এক বিরাট সম্মেলন হয়। কিন্তু সব ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে যে সিদ্ধান্তটি পাওয়া যায় তা হলো, হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রা) হযরত আবু মূসা আশ'আরীর (রা) সাথে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, শেষ মূহুর্তে তা থেকে সরে আসায় এ সালিশী বোর্ড শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়। দুমাতুল জান্দাল থেকে হতাশ হয়ে মুসলমানরা ফিরে গেল। অতঃপর 'আলী (রা)ও মু'আবিয়া (রা) অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে সন্ধি করলেন। এ দিন থেকে মূলত মুসলিম খিলাফত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

এ সময় 'খারেজী' নামে নতুন একটি দলের জন্ম হয়। প্রথমে তারা ছিল 'আলীর সমর্থক। কিন্তু পরে তারা এ বিশ্বাস প্রচার করতে থাকে যে, দীনের ব্যাপারে কোন মানুষকে 'হাকাম' বা সালিশ নিযুক্ত করা কুফরী কাজ। 'আলী (রা) আবূ মূসা

১১. মুনতাখাতাবু কান্য আল-'উম্মাল-৫/২৪৭ ; হায়াত আস-সাহাবা-৩/৬৬.

আশ'আরীকে (রা) 'হাকাম' মেনে নিয়ে কুরআনের খেলাফ কাজ করেছেন। সুতরাং হযরত 'আলী (রা) তাঁর আনুগত্য দাবী করার বৈধতা হারিয়ে ফেলেছেন। তারা হযরত 'আলী থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা ছিল অত্যন্ত চরমপন্থী। তাদের সাথে 'আলীর (রা) যুদ্ধ হয় এবং তাতে বহু লোক হতাহত হয়।

এই খারেজী সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি 'আবদুর রহমান মুলজিম, আল-বারাক ইবন 'আবদিল্লাহ ও 'আমর ইবন বকর আত-তামীমী, নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মুসলিম উম্মাহর অন্তর্কলহের জন্য দায়ী মূলতঃ 'আলী, মু'আবিয়া ও 'আমর ইবনুল 'আস (রা)। সুতরাং এ তিন ব্যক্তিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সিদ্ধান্ত মুতাবিক ইবন মুলজিম দায়িত্ব নিল 'আলীর (রা) এবং আল-বারাক ও 'আমর দায়িত্ব নিল যথাক্রমে মু'আবিয়া ও 'আমর উবনুল 'আসের (রা)। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, মারবে নয় তো মরবে। হিজরী ৪০ সনের ১৭ রমজান ফজরের নামাযের সময়টি এ কাজের জন্য নির্ধারিত হয়। অতঃপর ইবন মুলজিম কূফা, আল-বারাক দিমাশ্ক ও 'আমর মিসরে চলে যায়।

হিজরী ৪০ সনের ১৬ রমজান শুক্রবার দিবাগত রাতে আততায়ীরা আপন আপন স্থানে ওঁৎ পেতে থাকে। ফজরের সময় হযরত 'আলী (রা) অভ্যাস মত আস-সালাত বলে মানুষকে নামাযের জন্য ডাকতে ডাকতে যখন মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, পাপাত্মা ইবন মুলজিম শাণিত তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে আহত করে। আহত অবস্থায় আততায়ীকে ধরার নির্দেশ দিলেন। সন্তানদের ডেকে অসীয়াত করলেন। চার বছর নয় মাস খিলাফত পরিচালনার পর ১৭ রজমজান ৪০ হিজরী শনিবার কূফায় শাহাদাত বরণ করেন।[১২]

হযরত 'আলীর (রা) নামাযে জানাযার ইমামতি করেন হযরত হাসান ইবন 'আলী (রা)। কূফা জামে 'মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তবে অন্য একটি বর্ণনা মতে নাজফে আশরাফে তাঁকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

আততায়ী ইবন মুলজিমকে ধরে আনা হলে 'আলী (রা) নির্দেশ দেন ঃ ' সে কয়েদী। তার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা কর। আমি বেঁচে গেলে তাঁকে হত্যা অথবা ক্ষমা করতে পারি। যদি আমি মারা যাই, তোমরা তাকে ঠিক ততটুকু আঘাত করবে যতটুকু সে আমাকে করেছে। তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন না।'[১৩]

হযরত আলী (রা) প্রায় পাঁচ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। একমাত্র সিরিয়া ও মিসর ছাড়া মক্কা ও মদীনাসহ সব এলাকা তাঁর অধীনে ছিল। তাঁর সময়টি যেহেতু গৃহযুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছে, এ কারণে নতুন কোন অঞ্চল বিজিত হয়নি।

---

১২. মুহাম্মাদ আল-খাদারী বেক, তারীখ আল-উমাম আল ইসলামিয়া,-২/৭৯-৮০

১৩. তাবাকাত-৩/৩৫

হযরত 'আলী (রা) তাঁর পরে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যাননি। লোকেরা যখন তাঁর পুত্র হযরত হাসানকে (রা) খলীফা নির্বচিত করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল; তিনি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ অথবা নিষেধ কোনটাই করছিনা। অন্য এক ব্যক্তি যখন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আপনার প্রতিনিধি নির্বাচন করে যাচ্ছেন না কেন? বললেন ঃ আমি মুসলিম উম্মাহকে এমনভাবে ছেড়ে যেতে চাই যেমন গিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)।

হযরত 'উমার 'আলী (রা) সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফায়সালাকারী আলী।' এমন কি রাসূলও (সা) বলেছিলেন, 'আকদাহুম 'আলী–তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিচারক 'আলী।' তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করে হযরত 'উমার (রা) একাধিকবার বলেছেন ঃ 'লাওলা 'আলী লাহালাকা 'উমার–'আলী না হলে 'উমার হালাক হয়ে যেত।'

'আলী (রা) নিজেকে একজন সাধারণ মুসলমানের সমান মনে করতেন এবং যে কোন ভুলের কৈফিয়তের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। একবার এক ইয়াহুদী তাঁর বর্ম চুরি করে নেয়। 'আলী বাজারে বর্মটি বিক্রি করতে দেখে চিনে ফেলেন। তিনি ইচ্ছা করলে জোর করে তা নিতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। আইন অনুযায়ী ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে মামলা দায়ের করেন। কাজীও ছিলেন কঠোর ন্যায় বিচারক। তিনি 'আলীর (রা) দাবীর সমর্থনে প্রমাণ চাইলেন। 'আলী (রা) তা দিতে পারলেন না। কাজী ইয়াহুদীর পক্ষে মামলার রায় দিলেন। এই ফায়সালার প্রভাব ইয়াহুদীর ওপর এতখানি পড়েছিল যে, সে মুসলমান হয়ে যায়। সে মন্তব্য করেছিল, 'এতো নবীদের মত ইনসাফ। 'আলী (রা) আমীরুল মু'মিনীন হয়ে আমাকে কাজীর সামনে উপস্থিত করেছেন এবং তাঁরই নিযুক্ত কাজী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন।' তিনি ফাতিমার (সা) সাথে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলে কারীমের (সা) পরিবারের সাথেই থাকতেন। বিয়ের পর পৃথক বাড়ীতে বসবাস শুরু করেন। জীবিকার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু পুঁজি ও উপকরণ কোথায়? গতরে খেটে এবং গণীমতের হিস্সা থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হযরত 'উমারের (রা) যুগে ভাতা চালু হলে তাঁর ভাতা নির্ধারিত হয় বছরে পাঁচ হাজার দিরহাম। হযরত হাসান বলেন, মৃত্যুকালে একটি গোলাম খরীদ করার জন্য জমা করা মাত্র সাত শ' দিরহাম রেখে যান।[১৪]

জীবিকার অনটন 'আলীর (রা) ভাগ্য থেকে কোন দিন দূর হয়নি। একবার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে থেকেছি।[১৫] খলীফা হওয়ার পরেও ক্ষুধা ও দারিদ্রের সাথে তাঁকে লড়তে হয়েছে। তবে তাঁর অন্তরটি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত। কোন অভাবীকে তিনি ফেরাতেন না। এজন্য তাঁকে অনেক সময় সপরিবারে অভুক্ত থাকতে হয়েছে। তিনি ছিলেন দারুণ বিনয়ী। নিজের

---

১৪. প্রাগুক্ত- ৩/৩৯
১৫. হায়াতুস সাহাবা-৩/৩১২

হাতেই ঘর-গৃহস্থালীর সব কাজ করতেন। সর্বদা মোটা পোশাক পরতেন। তাও ছেঁড়া, তালি লাগানো। তিনি ছিলেন জ্ঞানের দরজা। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর কাছে এসে দেখতে পেত তিনি উটের রাখালী করছেন, ভূমি কুপিয়ে ক্ষেত তৈরী করছেন। তিনি এতই অনাড়ম্বর ছিলেন যে, সময় সময় শুধু মাটির ওপর শুয়ে যেতেন। একবার তাঁকে রাসূল (সা) এ অবস্থায় দেখে সম্বোধন করেছিলেন, 'ইয়া আবা তুরাব'-ওহে মাটির অধিবাসী প্রাকৃতজন। তাই তিনি পেয়েছিলেন, 'আবু তুরাব' লকবটি। খলীফা হওয়ার পরও তাঁর এ সরল জীবন অব্যাহত থাকে। হযরত 'উমারের (রা) মত সব সময় একটি দুররা বা ছড়ি হাতে নিয়ে চলতেন, লোকদের উপদেশ দিতেন।[১৬]

হযরত 'আলী (রা) ছিলেন নবী খান্দানের সদস্য, যিনি নবীর (সা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আনা মাদীনাতুল 'ইল্‌ম ওয়া 'আলী বাবুহা'-আমি জ্ঞানের নগরী, আর 'আলী সেই নগরীর প্রবেশদ্বার। (তিরমিযী) তিনি ছিলেন কুরআনের হাফিজ এবং একজন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির। কিছু হাদীছও সংগ্রহ করেছিলেন। তবে হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। কেউ তাঁর কাছে কোন হাদীছ বর্ণনা করলে, বর্ণনাকারীর নিকট থেকে শপথ নিতেন।[১৭] তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে বহু বিখ্যাত সাহাবী এবং তাবি'ঈ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী খলীফাদের যুগে মুহাজিরদের তিনজন ও আনসারদের তিনজন ফাতওয়া দিতেন। যথাঃ 'উমার, 'উছমান, 'আলী, উবাই ইবন কা'ব, মু'আয ইবন জাবাল ও যায়িদ ইবন ছাবিত (রা)। মাসরূক থেকে অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে ফাতওয়া দিতেন ঃ 'আলী, ইবন মাস'উদ, যায়দ, উবাই ইবন কা'ব, আবু মূসা আল-আশ- 'আরী।[১৮]

খাতুনে জান্নাত নবী কন্যা হযরত ফাতিমার (রা) সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। যতদিন ফাতিমা জীবিত ছিলেন, দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। ফাতিমার মৃত্যুর পর একাধিক বিয়ে করেছেন। তাবারীর বর্ণনা মতে, তার চৌদ্দটি ছেলে ও সতেরটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। হযরত ফাতিমার গর্ভে তিন পুত্র –হাসান, হুসায়ন, মুহসিন এবং দু'কন্যা যয়নাব ও উম্মু কুলছুম জন্মলাভ করেন। শৈশবেই মুহসীন মারা যায়। ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে, মাত্র পাঁচ ছেলে হাসান, হুসায়ন, মুহাম্মদ (ইবনুল হানাফিয়্যা), 'আব্বাস এবং 'উমার থেকে তাঁর বংশ ধারা চলছে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, 'আলীর (রা) মর্যাদা ও ফজীলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে যত কথা বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন সাহাবী সম্পর্কে তা হয়নি।[১৯]

---

১৬. আল ফিতনাতুল কুবরা-১০৮
১৭.তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/১০১৮. তাবাকাত-৪/১৬৭,১৭৫
১৯. আল-ইসাবা-২/৫০৮

ইতিহাসে তাঁর যত গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তার কিয়দাংশ তুলে ধরা সম্ভব নয়। রাসূল (সা) অসংখ্যবার তাঁর জন্য ও তাঁর সন্তানদের জন্য দু'আ করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ একমাত্র মু'মিনরা ছাড়া তোমাকে কেউ ভালোবাসবে না এবং একমাত্র মুনাফিকরা ছাড়া কেউ তোমাকে হিংসা করবে না।

হযরত 'আলীর এক সাথী হযরত দুরার ইবন দামরা আল কিনানী একদিন হযরত মু'আবিয়ার কাছে এলেন। মু'আবিয়া তাঁকে 'আলীর (রা) গুণাবলী বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন। প্রথমে তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু মু'আবিয়ার চাপাচাপিতে দীর্ঘ এক বর্ণনা দান করেন। তাতে 'আলীর (রা) গুণাবলী চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। ঐতিহাসিকরা বলছেন, এ বর্ণনা শুনে মু'আবিয়াসহ বৈঠকে উপস্থিত সকলেই কান্নায় ভেংগে পড়েছিলেন। অতঃপর মু'আবিয়া মন্তব্য করেন ঃ 'আল্লাহর কসম, আবুল হাসান (হাসানের পিতা) এমনই ছিলেন।'[২০]

'আলী ছিলে একজন সুবক্তা ও ভালো কবি। তাঁর কবিতার একটি 'দীওয়ান' আমরা পেয়ে থাকি। তাতে অকেনগুলি কবিতায় মোট ১৪০০ শ্লোক আছে। গবেষকদের ধারণা, তাঁর নামে প্রচলিত অনেকগুলি কবিতা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। তবে তিনি যে তৎকালীন আরবী কাব্য জগতের একজন বিশিষ্ট দিকপাল, তাতে পণ্ডিতদের কোন সংশয় নেই। 'নাহজুল বালাগা' নামে তাঁর বক্তৃতার একটি সংকলন আছে যা তাঁর অতুলনীয় বাগ্মিতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।[২১]

অনন্য বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন হযরত 'আলী (রা)। জনগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে তিনি যে ভাষণ দান করেন, তার সংকলণ গ্রন্থ 'নাহজুল বালাগা'। এতে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, জীবন বোধ, ধর্মীয় চিন্তা ও আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনের তীব্র আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ ভঙ্গি, শব্দ চয়ণ, উপস্থাপনা ও ভাষার লালিত্যে এ এক অতুলনীয় সাহিত্য-কর্ম। আরবী ভাষার এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে এ গ্রন্থ স্বীকৃত। আরবী গদ্য ধারায় পবিত্র কুরআনের শ্বাশত সার্বজনীন বাণীর ভিত্তিতে বক্তব্য উপস্থাপন, কালোত্তীর্ণ ভাব ও অলংকরণ, অন্ত্যমিল বিশিষ্ট গদ্য-কুশলতা ও শিল্প শোভনতা নাহজুল বালাগার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে।

হযরত 'আলীকে (রা) আরবী ব্যাকরণের জনক বলা হয়। তাঁরই তত্ত্বাবধানে আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী আরবী ব্যাকরণের প্রাথমিক সূত্রগুলো রচনা করেন। তিনি ছিলেন বড় মাপের কবি। তাঁর কবিতা সার্বজনীন বাণী ও শিল্প সৌন্দর্যে কালোত্তীর্ণ। আরবী কাব্য সাহিত্যে মু'আল্লাকা, লামিয়াত ও আধুনিক আরবীয় গদ্য ও কাব্য সাহিত্যের সুবিশাল জগতের মধ্যে দীওয়ান-ই- 'আলীর তুলনামূলক মূল্যায়নে এটা স্পষ্ট

২০. আল-ইসতী'আব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা)-৩/৪৪
২১. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৩০৯.

হয় যে, ইসলামের অনুপম সত্য ও সুন্দরের উপস্থাপনায়, মানবীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের সৃজনশীলতায়, নশ্বর পার্থিবতার মোহের বলয় ভেঙ্গে চিরন্তন জীবনের আহ্বান কুশলতায়, সর্বোপরি মা'বুদ ও বান্দার সম্পর্ক ও নৈকট্যের জন্য অনুপম আকৃতি-সমৃদ্ধ। একই সাথে এটি তত্ত্বসন্ধানী ও শিল্প রসিক মানুষের জন্য এক মূল্যবান উপহার। এর আবেদন ও গতিময়তা কাল থেকে কালান্তরে, শতকের পর শতক পেরিয়ে বিদ্যমান থাকবে।

তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু বিচিত্রধর্মী। বংশ অহমিকা, মূর্খের সাহচর্য, যুগের বিশ্বাস ঘাতকতা, যুগ-যন্ত্রণা, দুনিয়ার মোহ, দুনিয়া থেকে আত্মরক্ষা, সহিষ্ণুতার মর্যাদা, বিপদে ধৈর্য্য, দুঃখের পর সুখ, অল্পে তুষ্টি, দারিদ্র ও প্রাচুর্য ইত্যাদি বিষয় যেমন তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে, তেমনিভাবে সমকালীন ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, যুদ্ধের বর্ণনা, প্রিয় নবীর সাহচর্য, তাকদীর, আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস, খোদাভীতিসহ নানা বিষয় তাতে বাঙময় হয়ে উঠেছে। তিনি মৃত্যুর অনিবার্যতা, যৌবনের উন্মাদনা, বন্ধুত্বের রীতি-নীতি, ভ্রমণের উপকারিতা, জ্ঞানের মহত্ব ও অজ্ঞতার নীচতা, মানুষের অভ্যন্তরের পশুত্ব ইত্যাদি বিষয়ের কথা যেমন বলেছেন, তেমনিভাবে প্রিয় নবীর ও প্রিয়তমা স্ত্রী ফাতিমার (রা) মৃত্যুতে শোকগাথাও রচনা করেছেন।

বংশ অহমিকা যে অসার ও ভিত্তিহীন সেকথা তিনি বলেছেন এভাবে ঃ[২২]

النَّاسُ من جهَةِ التِّمثَال اكفاءُ + أبُوهُم أدَمُ والأُمُّ حَواءُ
وَإِنَّمَا أمَّهَاتُ النَّاس أوعيَةٌ + مُستَودَعَاتٌ وللأحساب آباءُ
فَإن يَكُن لَهُم مِن أصلِهِم شَرَفٌ + يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالطِّينُ والمَاءُ

'আকার-আকৃতির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। তাদের পিতা আদম এবং মা হাওয়া।
মায়েরা ধারণের পাত্রস্বরূপ, আর পিতারা বংশের জন্য।
সুতরাং মানুষের গর্ব ও অহঙ্কারের যদি কিছু থেকে থাকে তাহলো কাদা ও পানি।'

পুত্র হুসায়নকে (রা) তিনি উপদেশ দান করছেন এভাবে ঃ [২৩]

آحُسَينُ إنِّي واعظٌ وَمُؤدِّبٌ + فَافهَم فَإنَ العَاقِل المتَأدِّبُ
واحفَظ وَصيَّةَ والِد متَحَنِّنٍ + يَغذوكَ بِالآدَابِ كَيلاَ تَعطبُ
أبُنَيَّ إنَّ الرِّزقَ مَكفُولٌ بِه + فَعَلَيكَ بِالأجمَالِ تَطلُبُ

---

২২. *দীওয়ান-ই-'আলী (রা)-১/২৯*

২৩. *প্রাগুক্ত-১/৪৫; আদাবু আদ-দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যা-৩২.*

لاَ تَجعَلَنَّ المَالَ كَسبَكَ مفرَداً + وتُقى إلهِكَ فاجعَلَن مَا تَكسبُ

'ওহে হুসায়ন! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমাকে আদব শিখাচ্ছি; মন দিয়ে শোন। কারণ, বুদ্ধিমান সেই যে শিষ্টাচারী হয়।

তোমার স্নেহশীল পিতার উপদেশ স্মরণ রাখবে, যিনি তোমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে তোমার পদস্খলন না হয়।

আমার প্রিয় ছেলে! জেনে রাখ, তোমার রুযী-রেযেক নির্ধারিত আছে। সুতরাং উপার্জন যাই কর, সৎ ভাবে করবে।

অর্থ-সম্পদ উপার্জনকে তোমার পেশা বানাবে না। বরং আল্লাহ-ভীতিকেই তোমার উপার্জনের লক্ষ্য বানাবে।'

বুদ্ধি ও জ্ঞানের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি বলেছেন এভাবে ঃ[২৪]

وَأفضل قسم الله للمرء عقلُهُ + فَلَيسَ مِنَ الخَيراتِ شَئٌ يُقَارِبُهُ

إذَا أكمَلَ الرَّحمنُ للمرء عَقلَهُ + فَقد كُملت أخلاَقُهُ وَمَارِبه

يَعيش الفتى فى الناس بالعقل إنَّه + على العقل يجرى علمُهُ وَتَجارُبُهُ

تَزِينُ الفتى فى النَّاس صِحَّة عقله + وَإن كَانَ محظوراً عليه مكاسبُهُ

يشينُ الفتى فى الناس قلَّةُ عقله + وإن كَرُمَت أعراقُهُ وَمَناسبُهُ

'মানুষের জন্য আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ হলো তার বোধ ও বুদ্ধি। তার সমতূল্য অন্য কোন ভালো জিনিস আর নেই।

দয়াময় আল্লাহ যদি মানুষের বৃদ্ধিপূর্ণ করে দেন তাহলে তার নীতি-নৈতিকতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে।

একজন যুবক মানুষের মাঝে বুদ্ধির দ্বারাই বেঁচে থাকে। আর বুদ্ধির উপরই তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়।

সুস্থ্য-সঠিক বুদ্ধি যুবককে মানুষের মাঝে সৌন্দর্যময় করে–যদিও তার আয়-উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়।

আর স্বল্প বুদ্ধি যুবককে মানুষের মাঝে গ্লানিময় করে-যদিও বংশ মর্যাদায় সে হয় অভিজাত।'

তিনি পৃথিবীর নশ্বরতা ও নিত্যতাকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করে বলেছেন ঃ[২৫]

---

২৪. দীওয়ান- ১/৬৪

২৫. প্রাগুক্ত-১/১১৪

إنما الدنيا فناءُ ليسَ للدنيَا ثبوتُ + إنما الدنيا كبيتٍ نسجته العنكبوتُ

ولقد يكفيك أيُّهَا الطالب قوتٌ + ولَعَمرى عن قَليل كُلُّ من فيها يموتُ

'নিশ্চয় দুনিয়া নশ্বর। এর কোন স্থায়িত্ব নেই। এ দুনিয়ার উপমা হলো মাকড়সার তৈরী করা ঘর।

ওহে দুনিয়ার অন্বেষণকারী! দিনের খোরাকই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর আমার জীবনের শপথ! খুব শিগগীর এ দুনিয়ার বুকে যারা আছে, সবাই মারা যাবে।'

তিনি দুনিয়াকে সাপের সাথে তুলনা করেছেন এভাবে ঃ[২৬]

هِىَ الدنيَا كَحَيَّةٍ تَنفث السمُّ + وإن كَانت المُجَسَّةُ لانت

'দুনিয়া হলো সেই সাপের মত যে বিষ ছড়ায়-যদিও তার দেহ নরম ও কৃশকায়।'

অসতী নারী সম্পর্কে তিনি বলেছেন, কোন জ্ঞানীর পক্ষেই অসতী নারীর প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। কারণ, স্বভাবতঃই তারা চঞ্চলমতি হয়ে থাকে। তাদের ওয়াদা-অঙ্গীকারকে তিনি নিমেষে বিলীয়মান ভোরের হাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ[২৭]

دَع ذكرهنَّ فمَالَهن وفَاء + ريح الصباوعهودهن سواء

يكسرنَ قَلبَكَ ثم لاَ يَجبُرنَهُ + وَقلوبهن من الوفاء خلاء

'তাদের আলোচনা ছেড়ে দাও। কারণ, তারা প্রতিশ্রুতি পালনে বিশ্বস্ত নয়। তাদের প্রতিশ্রুতি ও ভোরের হাওয়া উভয়ে সমান।

তারা তোমার হৃদয়কে ভেঙ্গে দেবে, তারপর তা আর জোড়া লাগাবে না। প্রতিশ্রুতি পালন থেকে তাদের অন্তর শূন্য।'

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখে ধৈর্যহারা না হবার কথা বলেছেন এভাবে ঃ[২৮]

لئن ساءنى دهر عزمتُ تَصَبُّراً + فكل بلاءٍ لا يدوم يسيرٌ

إن سرَّنى لم ابتهج بسروره + فكل سرور لايدوم حقير

'যুগ বা কাল যদি আমাকে দুঃখ দেয় তা হলে আমি সংকল্প করেছি ধৈর্যধরার। আর যে বিপদ চিরস্থায়ী নয় তা খুবই সহজ ব্যাপার।

---

২৬. প্রাগুক্ত.

২৭. প্রাগুক্ত-১/৩৩

২৮. প্রাগুক্ত-১/১৮২

আর যুগ যদি আনন্দ দেয় তাহলে উল্লাসে আমি মাতি না। আর যে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী তা একান্ত তুচ্ছ ব্যাপার।'

খায়বার যুদ্ধের দিন মারহাব ইয়াহুদী তরবারি কোষমুক্ত করে নিম্নের এই শ্লোকটি আওড়াতে আওড়াতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানায় ঃ

قد علمت خيبر أنى مرحب + شاكى السـلاح بطل مجرب

إذا.الحروب أقبلت تلهب

'খায়বার ময়দান জানে যে, আমি মারহাব।

আমি অস্ত্রধাণকারী, অভিজ্ঞ বীর-যখন যুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠে।'

এক পর্যায়ে 'আলী (রা) এই শ্লোকটি আবৃত্তি করতে করতে অসীম সাহসিকতার সাথে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন ঃ[২৯]

أنا الذى سمتنى أمى حيدرة + كليث غابات كريه المنظرة

أو فيهم بالصاع كيل السندرة .

'আমি সেই ব্যক্তি যার মা তাকে "হায়দার" নাম রেখেছে। আমি জঙ্গলের বীভৎস দৃশ্যরূপী সিংহ। আমি শত্রু বাহিনীকে "সানদারা" পরিমাপে পরিমাপ করি। অর্থাৎ তাদেরকে পুর্ণরূপে হত্যা করি।'

উহুদ যুদ্ধের পর 'আলী (রা) হযরত ফাতিমার (রা) কাছে এসে বললেন, ফাতিমা! তরবারিটি রাখ। আজ এটি দিয়ে খুব যুদ্ধ করেছি। অতঃপর তিনি এ দু'টি শ্লোক আবৃত্তি করলেন ঃ[৩০]

أفاطم هاك السيف غير ذميم + فلست برعديد ولئيم

لعمرى لقمد أبليت فى نصر أحمد + ومرضاة رب بالعباد عليم

'হে ফাতিমা! এই তরবারিটি রাখ যা কখনো কলঙ্কিত হয়নি। আর আমিও ভীরু কাপুরুষ নই এবং নই নীচ। আমার জীবনের কসম! নবী আহমাদের সাহায্যার্থে এবং বান্দার সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত প্রভূর সন্তুষ্টি বিধানে আমি এটাকে ব্যবহার করে পুরনো করে ফেলেছি।'

কবিতা সম্পর্কে হযরত 'আলীর (রা) মনোভাব তাঁর একটি মূল্যবান উক্তিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন ঃ[৩১]

---

২৯. *সাহীহ মুসলিম-২/২২; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৪৪-৫৪৫.*

৩০. *হায়াতুস সাহাবা-১/৫৪১*

৩১. *কিতাবুল 'উমদা-১/১০; দায়িরা-ই-মা'আরিফ-ই-ইসলামিয়া (লাহোর)*

الشعر ميزان القوم أو ميزان القول.

'কবিতা হলো একটি জাতির দাঁড়িপাল্লা (অথবা তিনি বলেছেন) কথার দাঁড়িপাল্লা।' অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা দিয়ে যেমন জিনসপত্রের পরিমাপ করা হয় তেমনি কোন জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি, সভ্যতা, নৈতিকতা ও আদর্শের পরিমাপ করা যায় তাদের কবিতা দ্বারা।

তিনি শুধু নিজে একজন উঁচু মানের কবি ছিলেন তাই নয়, বরং অন্য কবিদেরকেও তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। তাদের কবিতার যথাযথ মূল্যায়ন করতেন। একবার এক বেদুঈন তাঁর কাছে এসে কিছু সাহায্য চাইলো। তিনি তাকে একটি চাদর দান করলেন। লোকটি যাওয়ার সময় তার নিজের একটি কবিতা শোনালো। এবার 'আলী (রা) তাঁকে আরো পঞ্চাশটি দীনার দিয়ে বললেন, শোন, চাদর হলো তোমার চাওয়ার জন্য, আর দীনার হলো তোমার কবিতার জন্য। আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি যে, তোমরা প্রত্যেক লোককে তার যোগ্য আসনে সমাসীন করবে।[৩২]

---

৩২. আল-'উমদা-১/১১.

হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা)

সীরাতের গ্রন্থসমূহে হাস্‌সানের (রা) অনেকগুলি ডাকনাম বা কুনিয়াত পাওয়া যায়। আবুল ওয়ালীদ, আবুল মাদরাব, আবুল হুসাম ও আবূ 'আবদির রহমান। তবে আবুল ওয়ালীদ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[১] তাঁর লকব বা উপাধি 'শায়িরু রাসূলিল্লাহ' বা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবি। তাঁর পিতার নাম ছাবিত ইবন আল- মুনযির এবং মাতার নাম আল-ফুরায়'আ বিন্‌তু খালিদা।[২] ইবন সা'দ আল-ওয়াকিদীর সূত্রে তাঁর মায়ের নাম আল-ফুরায়'আ বিন্‌তু হুরাইস বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] তাঁরা উভয়ে মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বানূ নাজ্জার শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাতুল গোত্র বানূ নাজ্জারের সন্তান হওয়ার কারণে রাসূলে পাকের (সা) সাথে আত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্ক ছিল।[৪] মা আল-ফুরায়'আ ইসলামের আবির্ভাব কাল পেয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবিয়্যাতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।[৫] তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের বিখ্যাত নেতা সা'দ ইবন 'উবাদার (রা) চাচাতো বোন।[৬] হযরত হাস্‌সান (রা) তাঁর কবিতার একটি চরণে মা আল-ফুরায়'আ'র নামটি ধরে রেখেছেন।[৭] প্রখ্যাত সাহাবী শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) ছিলেন হাস্‌সানের (রা) ভাতিজা।[৮] হাস্‌সান (রা) একজন সাহাবী, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারী কবি, দুনিয়ার সকল ঈমানদার কবিদের ইমাম এবং তাঁর কাব্য প্রতিভা রুহুল কুদুস জিবরীল দ্বারা সমর্থিত।[৯]

ইবন সাল্লাম আল জুমাহী বলেন ঃ হাস্‌সানের পিতা ছাবিত ইবন আল-মুনযির ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের একজন নেতা ও সম্মানীয় ব্যক্তি। তাঁর দাদা আল-মুনযির প্রাক-ইসলামী আমলে 'সুমাইহা' যুদ্ধের সময় মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের বিচারক হয়ে তাদের মধ্যে ফায়সালা করেছিলেন। কবি হাস্‌সানের কবিতায় তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। একবার মুযানিয়্যা গোত্র কবির পিতাকে বন্দী করেছিল। কবির গোত্র তাঁকে ছাড়িয়ে আনার জন্য ফিদিয়ার প্রস্তাব দিলে তারা প্রত্যাখ্যান করে। দীর্ঘদিন বন্দী

---

১. *আল-ইসাবা-১/৩২৬; তাহযীবুত তাহযীব-২/২১৬*
২. *উসুদুল গাবা-২/৪*
৩. *সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১২*
৪. *ড. শাওকী দায়ফ; তারীখুল আদাব আল-'আরাবী-২/৭৭*
৫. *আল-ইসাবা-১/৩২৭; তাবাকাত-৮/২৭১*
৬. *সহীহ আল-বুখারী-২/৫৫৫*
৭. *আল-ইসাবা-১/৩২৬*
৮. *তাহযীবুল কামাল-৬/১৭: তাহযীবু ইবন 'আসাকির-৬/২৮৮*
৯. *সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১২*

থাকার পর তাঁর পিতার প্রস্তাবেই বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে তিনি মুক্ত হন।[১০] হাস্‌সানের দাদা আল-মুনযির ছিলেন খুবই উদার ও শান্তিপ্রিয় মানুষ।

হাস্‌সান হিজরাতের প্রায় ষাট বছর পূর্বে ৫৬৩ খ্রীস্টাব্দে ইয়াছরিবে (মদীনা) জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে নির্মিত মসজিদে নববীর পশ্চিম প্রান্তে বাবে রহমতের বিপরীত দিকে অবস্থিত ফারে' কিল্লাটি ছিল তাঁদের পৈত্রিক আবাসস্থল। হাস্‌সানের কবিতায় এর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।[১১] কবি হিসেবে বেড়ে ওঠেন এবং কবিতাকে জীবিকার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রাচীন আরবের জিল্লাক ও হীরার রাজপ্রাসাদে যাতায়াত ছিল। তবে গাস্‌সানীয় সম্রাটদের প্রতি একটু বেশী দুর্বল ছিলেন। হাস্‌সানের সাথে তাঁদের একটা গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি তাঁদের প্রশংসায় বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। তার কিছু অংশ সাহিত্য সমালোচকগণ হাস্‌সানের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে গণ্য করেছেন।[১২] সম্রাটগণও প্রতিদানে তাঁর প্রতি যথেষ্ট বদান্যতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের এ সম্পর্ক ইসলামের পরেও বিদ্যমান ছিল।[১৩]

গাস্‌সানীয় সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট জাবালা ইবন আল-আয়হাম। তাঁর প্রশংসায় কবি হাস্‌সান অনেক কবিতা রচনা করেছেন। খলীফা 'উমারের (রা) খিলাফতকালে গোটা শামে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। পরাজয়ের পর জাবালা ইবন আল-আয়হাম ইসলাম গ্রহণ করে কিছুকাল হিজাযে বসবাস করেন। এ সময় একবার হজ্জ করতে যান। কা'বা তাওয়াফের সময় ঘটনাক্রমে তাঁর কাপড়ের আঁচল এক আরব বেদুঈনের পায়ের তলায় পড়ে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তার গালে থাপ্পড় বসিয়ে দেন। বেদুঈন খলীফা 'উমারের (রা) নিকট বিচার দাবী করে। খলীফা ছিলেন সাম্যের প্রতীক। তিনি বেদুঈনকে একইভাবে প্রতিশোধ নেয়ার নির্দেশ দিলেন। জাবালা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন ঃ আমি একজন রাজা। একজন বেদুঈন কিভাবে আমাকের থাপ্পড় মারতে পারে ? 'উমার (রা) বললেন ঃ ইসলাম আপনাকে ও তাকে একই কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে। জাবালা বিষয়টি একটু ভেবে দেখার কথা বলে সময় চেয়ে নিলেন। এরপর রাতের আঁধারে রোমান সাম্রাজ্যে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে ইসলাম ত্যাগ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।[১৪]

পরবর্তী সময়ে এই রোমান সাম্রাজ্যে অবস্থানকালে একবার মু'আবিয়া (রা) প্রেরিত এক দূতের সাথে জাবালার সাক্ষাৎ হয়। জাবালা তাঁর নিকট হাস্‌সানের কুশল জিজ্ঞেস করেন। দূত বলেন ঃ তিনি এখন বার্দ্ধক্যে জর্জরিত। অন্ধ হয়ে গেছেন। হাস্‌সানকে

১০. তাবাকাতুশ শু'আরা-৮৪

১১. খুলাসাতুল ওয়াফা-২৯১

১২. আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা-১৩৯; তাবাকাতুশ শু'আরা-৮৫

১৩. 'উমার ফাররূখ; তারীখুল আদাব আল-'আরাবী-১/৩২৫

১৪. প্রাগুক্ত-১/৩২৭

দেয়ার জন্য জাবালা তাঁর হাতে এক হাজার দীনার দান করেন। দূত মদীনায় ফিরে আসলেন এবং কবিকে মসজিদে নববীতে পেলেন। তিনি কবিকে বললেন ঃ আপনার বন্ধু জাবালা আপনাকে সালাম জানিয়েছে। কবি বললেন ঃ তাহলে তুমি যা নিয়ে এসেছো তা দাও। দূত বললেন ঃ আবুল ওয়ালীদ, আমি কিছু নিয়ে এসেছি তা আপনি কি করে জানলেন? বললেন ঃ তাঁর কাছ থেকে যখনই কোন চিঠি আসে, সাথে কিছুনা কিছু থাকেই।[১৫]

আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেছেন। একবার এক গাস্সানীয় সম্রাট দূত মারফত কবি হাস্সানের নিকট পাঁচশো দীনার ও কিছু কাপড় পাঠিয়েছিলেন। দূতকে বলে দিয়েছিলেন, তিনি যদি জীবিত না থাকেন তাহলে কাপড়গুলি কবরের ওপর বিছিয়ে দেবে এবং দীনারগুলি দ্বারা একটি উট খরীদ করে তার কবরের পাশে জবেহ্ করবে। দূত মদীনায় এসে কবির সাক্ষাৎ পেলেন এবং কথাগুলি বললেন। কবি বলেন ঃ তুমি আমাকে মৃতই পেয়েছো।[১৬]

গাস্সানীয় রাজ দরবারের মত হীরার রাজ দরবারেও কবি হাস্সানের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। জুরজী যায়দান বলেন ঃ 'প্রাক-ইসলামী আমলে যে সকল খ্যাতিমান আরব কবির হীরার রাজ দরবারে আসা-যাওয়া ছিল এবং আপন কাব্য-প্রতিভা বলে সেখানে মর্যাদার আসনটি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হাস্সান অন্যতম।[১৭]

ইসলাম-পূর্বকালে কবি হাস্সান ইয়াছরিবের চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গোত্র আউস ও খাযরাজের মধ্যে যে সকল যুদ্ধ হতো তাতে নিজ গোত্রের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করতেন। আর এখান থেকেই প্রতিপক্ষ আউস গোত্রের দুই শ্রেষ্ঠ কবি কায়স ইবন খুতাইম ও আবী কায়স ইবন আল-আসলাত এর সাথে কাব্য-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।[১৮]

হাস্সানের চার পুরুষ অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। প্রত্যেকে একশো বিশ বছর করে বেঁচে ছিলেন। আরবের আর কোন খান্দানের পরপর চার পুরুষ এত দীর্ঘ জীবন লাভ করেনি। হাস্সানের প্রপিতামহ হারাম, পিতামহ আল-মুনযির, পিতা ছাবিত এবং তিনি নিজে, প্রত্যেকে ১২০ বছর বেঁচে ছিলেন।[১৯]

হাস্সান যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর জীবনে বার্দ্ধক্য এসে গেছে। মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনা পর্বে তিনি মুসলমান হন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় হিজরাতের সময় হাস্সানের বয়স হয়েছিল ষাট বছর।[২০] ইবন ইসহাক হাস্সানের

---

১৫. আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা-১৩৯

১৬. প্রাগুক্ত

১৭. তারীখু আদাব আল-লুগাহ্ আল-'আরাবিয়্যাহ-১/১০৩

১৮. কিতাবুল আগানী (দারুল কুতুব)-৩/১২

১৯. তাহযীবুল কামাল-৬/১৮; উসুদুল গাবা-২/৭; যাহাবী; তারীখুল ইসলাম-২/২৭৭

২০. আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা-১৩৯; তাহযীবুল কামাল-৬/১৮

পৌত্র 'আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হিজরাতের সময় তাঁর বয়স ষাট এবং রাসূলুল্লাহ (সা)এর বয়স তিপ্পান্ন বছর ছিল। ইবন সা'দ আরো বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ষাট বছর জাহিলিয়্যাতের এবং ষাট বছর ইসলামের জীবন লাভ করেন।[২১]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাব বিষয়ে ইবন ইসহাক হাস্‌সানের একটি বর্ণনা নকল করেছেন। হাস্‌সান বলেন ঃ আমি তখন সাত/আট বছরের এক চালাক-চতুর বালক। যা কিছু শুনতাম, বুঝতাম। একদিন এক ইহুদীকে ইয়াছরিবের একটি কিল্লার ওপর উঠে চিৎকার করে মানুষকে ডাকতে শুনলাম। মানুষ জড় হলে সে বলতে লাগলো ঃ আজ রাতে আহমাদের নক্ষত্র উদিত হয়েছে। আহমাদকে আজ নবী করে দুনিয়ায় পাঠানো হবে।[২২]

ইবনুল কালবী বলেন ঃ হাস্‌সান ছিলেন একজন বাগ্মী ও বীর। কোন এক রোগে তাঁর মধ্যে ভীরুতা এসে যায়। এরপর থেকে তিনি আর যুদ্ধের দিকে তাকাতে পারতেন না এবং কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেননি।[২৩] তবে ইবন 'আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনায় জানা যায়, তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। 'আল্লামাহ ইবন হাজার 'আসকালানী লিখেছেন ঃ একবার ইবন 'আববাসকে বলা হলো 'হাস্‌সান আল লা'ঈন' (অভিশপ্ত হাস্‌সান) এসেছে। তিনি বললেন ঃ হাস্‌সান অভিশপ্ত নন। তিনি জীবন ও জিহ্বা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জিহাদ করেছেন।[২৪] 'আল্লামাহ্ যাহাবী বলেন, এ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন।[২৫]

হাস্‌সানের (রা) যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সম্পর্কে যে সব কথা প্রচলিত আছে তা এই বর্ণনার বিপরীত। খন্দক মতান্তরে উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) মুসলিম মহিলাদেরকে হাস্‌সানের ফারে' দূর্গে নিরাপত্তার জন্য রেখে যান। তাদের সাথে হাস্‌সানও ছিলেন। এই মহিলাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফুফু সাফিয়্যা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিবও ছিলেন। একদিন এক ইহুদীকে তিনি কিল্লার চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করতে দেখলেন। তিনি প্রমাদ গুণলেন, যদি মহিলাদের অবস্থান জেনে যায় তাহলে ভীষণ বিপদ আসতে পারে। কারণ রাসূল (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে তখন প্রত্যক্ষ হিজাদে লিপ্ত। তিনি হাস্‌সানকে বললেন, এই ইহুদীকে হত্যা কর। তা না হলে সে আমাদের অবস্থানের কথা ইহুদীদেরকে জানিয়ে দেবে। হাস্‌সান বললেন, আপনার জানা আছে আমার নিকট এর কোন প্রতিকার নেই। আমার মধ্যে যদি সেই সাহসই থাকতো তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ

---

২১. *সীয়ারু আ'লা আন-নুবালা-২/৫১৩: উসুদুল গাবা-২/৭*

২২. *তাহযীবুত তাহজীব-২/২১৭; কিতাবুল আগানী-৪/১৩৫; তাহযীবুল কামাল-৬/১৯*

২৩. *তাহযীবু ইবন 'আসাকির-৪/১৪৩; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২১*

২৪. *তাহযীবুত তাহযীব-১/২৪৮; তাহযীবু ইবন 'আসাকির-৪/১৩১; আল- আগানী-৪/১৪৫,১৪৬*

২৫. *সীয়ারু আ'লাম আন-নুবাল-২/৫১৮*

(সা)-এর সাথেই থাকতাম। সাফিয়্যা তখন নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে ইহুদীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করেন। তারপর হাস্‌সানকে বলেন, যাও, এবার তার সঙ্গের জিনিসগুলি নিয়ে এসো। যেহেতু আমি নারী, আর সে পুরুষ, তাই একাজটি আমার দ্বারা হবে না। এ কাজটি তোমাকে করতে হবে। হাস্‌সান বললেন, ঐ জিনিসের প্রয়োজন নেই।[২৬]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। সাফিয়্যা লোকটিকে হত্যার পর মাথাটি কেটে এনে হাস্‌সানকে বলেন, ধর, এটা দূর্গের নীচে ইহুদীদের মধ্যে ফেলে এসো। তিনি বললেন: এ আমার কাজ নয়। অত ঃপর সাফিয়্যা নিজেই মাথাটি ইহুদীদের মধ্যে ছুড়ে মারেন। ভয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।[২৭]

হাস্‌সান (রা) সশরীরে না হলেও জিহ্বা দিয়ে রাসূলে কারীমের সাথে জিহাদ করেছেন। বানূ নাদীরের যুদ্ধে রাসূল (সা) যখন তাদেরকে অবরুদ্ধ করেন এবং তাদের গাছপালা জ্বালিয়ে দেন তখন তার সমর্থনে হাস্‌সান কবিতা রচনা করেন। বানূ নাদীর ও মক্কার কুরায়শদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সাহায্য ও সহযোগিতা চুক্তি ছিল। তাই তিনি কবিতায় কুরায়শদের নিন্দা করে বলেন, মুসলমানরা বানূ নাদীরের বাগ-বাগিচা জ্বালিয়ে দিল, তোমরা তো তাদের কোন উপকারে আসনি। তাঁর সেই কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত হলোঃ

تفاقد معشر نصروا قريشا + وليس لهم ببلدتهم نصير
هم أوتوا الكتاب فضيعوه + وهم عمى من التوراة بور
كفرتم بالقرأن وقدأتيتم + بتصديق الذى قال النذير
فهان على سراة بنى لؤى + حريق بالبويرة مستطير

'যারা কুরায়শদেরকে সাহায্য করেছিল তারা পরস্পর পরস্পরকে হারালো। তাদের নিজের শহরেই তাদের কোন সাহায্যকারী ছিলনা।

তারা সেই সব লোক যাদেরকে কিতাব (গ্রন্থ) দান করা হয়েছিল।

কিন্তু তারা তা বিনষ্ট করে ফেলেছে। তারা এখন তাওরাত থেকে অন্ধ হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

তোমরা আল-কুরআন অস্বীকার করেছো।

অথচ সতর্ককারী যা বলেছিলেন তার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে।

---

২৬. *উসুদুল গাবা-২/৬; কানযুল 'উম্মাল-৭/৯৯; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২২৮; আল-আগানী-৪/১৬৪*

২৭. *সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২২, তাহযীবুল কামাল-৬/২৪*

অতএব, বানূ লুআয়-এর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জন্যে (ইয়াছরীবের) 'আল-বুওয়ায়রা' স্থানটি আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া সহজ হয়েছে।'

এ কবিতা মক্কায় পৌছালে কুরায়শ কবি আবূ সুফইয়ান ইবনুল হারিছ বলেন ঃ আল্লাহ সর্বদা তোমাদের এমন কর্মশক্তি দান করুন, যাতে আশে-পাশের আগুনে খোদ মদীনা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর আমরা দূরে বসে তামাশা দেখবো।

আবু সুফাইয়ানের সেই কবিতাটির তিনটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

ادام اللهُ ذلك من صنيع + وحرق فى طرايقها السعير

ستعلم أينًا منها بنزه + وتعلم أى أرضينا تضير

فلو كان النخيل بها ركابا + لقالوا لا مقام لكم فسيروا

'আল্লাহ এমন কাজ চিরস্থায়ী করুন এবং প্রজ্জলিত আগুনে তার চারিপাশকে জ্বালিয়ে দিন।

আমাদের মধ্য থেকে কে সেখান থেকে দূরে থাকবে, তুমি খুব শিগগির তা জানতে পারবে। তুমি আরো জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কাদের ভূমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

সেই খেজুর বাগানে যদি যাত্রীদল বা কাফিলা অবস্থান করতো তাহলে তারা বলতো, এখানে তোমাদেরকে অবস্থান করতে দেয়া হবে না। তোমরা চলে যাও।'[২৮]

হিজরী পঞ্চম সনে আল-মুরাইসী' যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফেরার সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। সুযোগ সন্ধানী মুনাফিকরা তিলকে তাল করে ফেলে। তারা 'আয়িশার (রা) পূতঃ পবিত্র চরিত্রের ওপর অপবাদ দেয়। মুনাফিক নেতা 'আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই ছিল এ ব্যাপারে সকলের অগ্রগামী। কতিপয় প্রকৃত মুসলমানও তাদের এ ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকে পড়েন। যেমন হাস্‌সান, মিসতাহ ইবন উছাছা, হামনা বিন্‌ত জাহাশ প্রমুখ। যখন আয়িশার (রা) পবিত্রতা ঘোষণা করে আল কুরআনের আয়াত নাযিল হয় তখন রাসূল (সা) অপবাদ দানকারীদের ওপর কুরআনের নির্ধারিত 'হদ' (শাস্তি) আশি দুররা জারি করেন। ইমাম যুহরী থেকে সাহীহায়নে একথা বর্ণিত হয়েছে।[২৯] অবশ্য অনেকে 'হদ' জারির বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।[৩০]

অনেকে অবশ্য হাস্‌সানের জীবন, কর্মকাণ্ড এবং তাঁর কবিতা বিশ্লেষণ করে এ মত পোষণ করেছেন যে, কোনভাবেই তিনি 'ইফ্‌ক' বা অপবাদের ঘটনায় জড়িত ছিলেন না। যেহেতু তিনি রাসূলূল্লাহ (সা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে মক্কার পৌত্তলিক কুরায়শদের আভিজাত্যের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছিলেন এবং আরববাসীর নিকট তাদের

---

২৮. সহীহ আল-বুখারী-২/১১৩: সীরাত ইবন হিশাম-২/২৭২

২৯. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৭০

৩০. উসুদুল গাবা-২/৬

হঠকারিতার স্বরূপ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন, একারণে পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণকারী কুরায়শরা নানা ভাবে তাঁকে নাজেহাল করেছেন। তাঁরা মনে করেন, 'ইফ্ক'-এর ঘটনায় হাস্সানের নামটি জড়ানোর ব্যাপারে যাঁরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের পুরোধা সাফওয়ান ইবন মু'আত্তাল। হাস্সান 'আয়িশার (রা) শানে অনেক অনুপম কবিতা রচনা করেছেন। একটি চরণে তিনি 'ইফ্ক'-এর ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অন্য একটি চরণে যাঁরা তাঁর নামটি জড়ানোর ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেছেন, সেই সব কুরায়শ মুহাজিরদের কঠোর সমালোচনা করেছেন।[৩১]

'ইফ্ক'-এর ঘটনায় তাঁর জড়িয়ে পড়ার যত বর্ণনা পাওয়া যায়, সীরাত বিশেষজ্ঞরা সেগুলিকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। একারণে পরবর্তীকালে বহু সাহাবী ও তাবি'ঈ তাঁকে ভালো চোখে দেখেননি। অনেকে তাঁকে নিন্দা-মন্দ করেছেন। তবে খোদ 'আয়িশা (রা) ও রাসূল (সা) তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। একথা বহু বর্ণনায় জানা যায়। 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাস্সানকে মু'মিনরাই ভালবাসে এবং মুনফিকরাই ঘৃণা করে। তিনি আরো বলেছেন ঃ হাস্সান হচ্ছে মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রতিবন্ধক।[৩২] কেউ 'আয়িশার (রা) সামনে হাস্সানকে (রা) খারাপ কিছু বললে তিনি নিষেধ করতেন।

হাস্সান (রা) শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর একবার 'আয়িশার (রা) গৃহে আসেন। তিনি গদি বিছিয়ে হাস্সানকে (রা) বসতে দেন। এমন সময় 'আয়িশার (রা) ভাই 'আবদুর রহমান (রা) উপস্থিত হন। তিনি বোনকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ আপনি তাঁকে গদির ওপর বসিয়েছেন? তিনি কি আপনার চরিত্র নিয়ে এসব কথা বলেননি? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে কাফিরদের জবাব দিতেন। শত্রুদের জবাব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তরে শান্তি দিতেন। এখন তিনি অন্ধ হয়েছেন। আমি আশা করি, আল্লাহ আখিরাতে তাঁকে শাস্তি দেবেন না।[৩৩]

প্রখ্যাত তাবি'ঈ মাসরূক বলেন ঃ একবার আমরা 'আয়িশার (রা) কাছে গিয়ে দেখলাম হাস্সান সেখানে বসে বসে 'আয়িশার (রা) প্রশংসায় রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তার মধ্যে এই পংক্তিটিও ছিল ঃ

حصان رزان ما تزن بريبة + وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

অর্থাৎ তিনি পূতঃপবিত্র, শক্ত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ভদ্রমহিলা, তাঁর আচরণে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। পরনিন্দা থেকে মুক্ত অবস্থায় তাঁর দিনের সূচনা হয়।

৩১. *দেখুন: ড. শাওকী-দায়ফ; তারীখুল আদাব-২/৭৮*
৩২. *সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৮*
৩৩. *তাহযীবু ইবন 'আসাকির-৪/১২৯*

পংক্তিটি শোনার পর 'আয়িশা (রা) মন্তব্য করলেন ঃ 'কিন্তু আপনি তেমন নন।' 'আয়িশাকে (রা) বললাম ঃ আপনি তাকে এখানে আসার অনুমতি দেন কেন ? আল্লাহ তা'আলা তো ঘোষণা করেছেন, ইফ্‌ক-এ যে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। (সূরা ঃ আন-নূর-১১) 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর কাজের শাস্তি তো তিনি লাভ করেছেন। অন্ধত্বের চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে ? তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে কুরায়শদের প্রতিরোধ করেছেন এবং তাদের কঠোর নিন্দা করেছেন।[৩৪]

'উরওয়া বলেন ঃ একবার আমি ফুরায়'আর ছেলে হাস্‌সানকে 'আয়িশার (রা) সামনে গালি দিই। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ ভাতিজা, তুমি কি এমন কাজ থেকে বিরত হবে না? তাঁকে গালি দিওনা। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে কুরায়শদের জবাব দিতেন।[৩৫]

একবার কতিপয় মহিলা 'আয়িশার (রা) উপস্থিতিতে হাস্‌সানকে নিন্দামন্দ করে। 'আয়িশা (রা) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা তাঁকে নিন্দামন্দ করোনা। আল্লাহ্ তা'আলা যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দানের অঙ্গিকার করেছেন, তিনি তা পেয়ে গেছেন। তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। আমি আশা করি তিনি কুরায়শ কবি আবূ সুফইয়ান ইবনুল হারিছের কবিতার জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসায় যে কবিতা রচনা করেছেন তার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন। একথা বলে তিনি হাস্‌সানের 'হাজাওতা মুহাম্মাদান ফা আজাবতু আনহু' কবিতাটির কয়েকটি লাইন পাঠ করেন।[৩৬]

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) কবি হাস্‌সানকে ক্ষমা করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'আয়িশার (রা) সাথে তাঁর সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইতিকালের পর হাস্‌সান (রা) দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সময় নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। ইবন ইসহাকের মতে তিনি হিজরী ৫৪ সনে মারা যান। আল-হায়ছাম ইবন 'আদী বলেন ঃ হিজরী ৪০ সনে মারা যান। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ তিনি জাবালা ইবন আল-আয়হাম ও আমীর মু'আবিয়ার দরবারে গিয়েছেন। তাই ইবন সা'দ বলেছেন ঃ মু'আবিয়ার খিলাফতকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে, তিনি হিজরী ৫৪/খ্রী ঃ৬৭৪ সনে ১২০ বছর বয়সে মারা যান।[৩৭]

আবূ 'উবায়েদ আল-কাসেম ইবন সাল্লাম বলেন ঃ হিজরী ৫৪ সনে হাকীম ইবন হিযাম,

---

৩৪. সহীহ বুখারী-৭/৩৩৮; ৮/৩৭৪: মুসলিম (২৪৮৮); সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৮; সীরাত ইবন হিশাম-২/৩০৬

৩৫. বুখারী-৭/৩৩৮; মুসলিম (২৪৮৭); সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৪

৩৬. মুসলিম-(২৪৯০); তাহযীবুল কামাল-৬/২০; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৫

৩৭. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২২; আশ-শি'র ওয়াশ- শু'আরা-১৩৯

আবু ইয়াযীদ হুয়াইতিব ইবন 'আবদিল 'উয্যা, সা'ঈদ ইবন ইয়ারবু' আল-মাখযূমী ও হাস্সান ইবন ছাবিত আল-আনসারী মৃত্যুবরণ করেন। এঁদের প্রত্যেকে ১২০ বছর জীবন লাভ করেছিলেন।[৩৮]

হাস্সানের (রা) স্ত্রীর নাম ছিল সীরীন। তিনি একজন মিসরীয় কিবতী মহিলা। আল-বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। রাসূলে কারীম (সা)-এর সাহাবী হযরত হাতিব ইবন বালতা'আকে (রা) ইস্কান্দারিয়ার শাসক 'মুকাওকাস' এর নিকট দূত হিসেবে পাঠান। 'মুকাওকাস' রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দূতকে যথেষ্ট সমাদর করেন। ফেরার সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য কিছু উপহার পাঠান। এই উপহার সামগ্রীর মধ্যে তিনটি কিবতী দাসীও ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ছেলে ইবরাহীমের মা মারিয়্যা আল কিবতিয়া (রা) এই দাসী ত্রয়ের একজন। অন্য দুইজন দাসীর মধ্যে রাসূল (সা) হাস্সান ইবন ছাবিত ও মুহাম্মাদ ইবন কায়স আল-'আবদীকে একটি করে দান করেন। হাস্সানকে প্রদত্ত দাসীটি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন মারিয়্যা আল-কিবতিয়্যার বোন। নাম ছিল সীরীন। তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হাস্সানের (রা) ছেলে 'আবদুর রহমান। এই আবদুর রহমান এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ছেলে ইবরাহীম ছিলেন পরস্পর খালাতো ভাই।[৩৯]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ফারে' পর্বতের দূর্গ ছিল হাস্সানের (রা) পৈতৃক বাসস্থান। আবূ তালহা (রা) যখন 'বীরহা' উদ্যান তাঁর নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে সাদাকা হিসেবে বণ্টন করে দেন তখন হাসসান সেখান থেকে একটি অংশ লাভ করেন। এরপর তিনি সেখানে বাসস্থান নির্মাণ করেন। স্থানটি আল-বাকী'র নিকটবর্তী। পরে আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁর নিকট থেকে সেটি খরীদ করে সেখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। যা পরে কাসরে বনী হুদায়লা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারো কারো ধারণা যে, রাসূল (সা)এ ভূমি তাঁকে দান করেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। উপরে উল্লেখিত আমাদের বক্তব্য সাহীহ্ বুখারীর বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত।

হাস্সানের (রা) মাথার সামনের দিকে এক গোছা লম্বা চুল ছিল। তিনি তা দুই চোখের মাঝখানে সব সময় ছেড়ে রাখতেন। ভীষণ বাক্পটু ছিলেন। এ কারণে বলা হতো, তিনি তাঁর জিহবার আগা নাকের আগায় ছোঁয়াতে পারতেন। তিনি বলতেন, আরবের কোন মিষ্টভাষীই আমাকে তুষ্ট করতে পারে না। আমি যদি আমার জিহবার আগা কারো মাথার চুলের ওপর রাখি তাহলে সে ন্যাড়া হয়ে যাবে। আর যদি কোন পাথরের ওপর রাখি তাহলে তা বিদীর্ণ হয়ে যাবে।[৪০]

হাস্সান (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে যাঁরা

---

৩৮. তাহযীবুল কামাল-৬/২৪

৩৯. উসুদুল গাবা-২/৬; আল-বিদায়া-৪/২৭২; হায়াতুস সাহাবা-১/১৪০

৪০. আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা'-১৩৯

হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ আল-বারা' ইবন 'আযিব, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান, 'উরওয়া ইবন যুবায়র, আবুল হাসান মাওলা বনী নাওফাল, খারিজা ইবন যায়দ ইবন ছাবিত, ইয়াহইয়া ইবন 'আবদির রহমান ইবন হাতিব, 'আয়িশা, আবূ হুরায়রা, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, 'আবদুর রহমান ইবন হাস্‌সান প্রমুখ।[৪১] ইবন সা'দ হাস্‌সানকে (রা) দ্বিতীয় তাবকায় (স্তর) উল্লেখ করেছেন।[৪২]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পর প্রথম দুই খলিফা-আবূ বকর ও 'উমারের (রা) খিলাফতকালে হাস্‌সানের (রা) কোন রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা যায় না। 'উছমানের(রা) খিলাফতের সময় তাঁর মধ্যে আবার 'আসাবিয়্যাতের (অন্ধ পক্ষপাতিত্ব) কিছু লক্ষণ দেখা যায়। তিনি খলীফা 'উছমানের (রা) পক্ষ নিয়ে বানূ উমাইয়্যাকে 'আলীর (রা) বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। খলীফা 'উছমান (রা) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করলে তিনি বানূ হাশিম, বিশেষত ঃ 'আলীকে (রা) ইঙ্গিত করে কিছু কবিতা রচনা করেছেন।[৪৩]

তার দুইটি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ

ياليت شعرى ولست الطير تخبرنى + ما كان شأن على وابن عفانا

لتسمعن وشيكا فى ديارهم : الله اكبر، يا ثارات عثمانا!

'হায় আমি যদি জানতে পেতাম, 'আলী ও ইবন 'আফ্‌ফানের ব্যাপারটি কি ছিল ? আর তা কেমন করে জানবো, তুমি তো কোন পাখী নও যে আমাকে অবহিত করবে।

তুমি অবশ্যই তাদের আবাসস্থল সমূহের নিকট থেকে শুনতে পাবে ঃ আল্লাহু আকবর। হায়, 'উছমানের রক্তের প্রতিশোধ!'

হাস্‌সানের (রা) জীবনে কবিত্ব একটি স্বতন্ত্র শিরোনাম। কাব্য প্রতিভা সর্বকালে সকল জাতি গোষ্ঠীর-নিকট সমাদৃত। বিশেষ করে প্রাক-ইসলামী আরবে এ গুণটির আবার সবচেয়ে বেশী কদর ছিল। কবিতা চর্চা ছিল সেকালের আরববাসীর এক বিশেষ রুচি। তৎকালীন আরবে কিছু গোত্র ছিল কবির খনি বা উৎস বলে খ্যাত। উদাহরণ স্বরূপ কায়স,রাবী'আ, তামীম, মুদার, য়ামন প্রমুখ গোত্রের নাম করা যায়। এ সকল গোত্রে অসংখ্য আরবী কবির জন্ম হয়েছে। মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় ছিল শেষোক্ত য়ামন গোত্রের অন্তুর্ভূক্ত। হাস্‌সানের (রা) পৈত্রিক বংশধারা উপরের দিকে এদের সাথে মিলিত হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত গোত্রসমূহের মধ্যে আবার কিছু খান্দানে কবিত্ব বংশানুক্রমে চলে

৪১. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১২; তাহযীবুল কামাল-৬/১৭; তারীখুল ইসলাম-২/২৭৭

৪২. তাহযীবুত তাহযীব-২/২১৬; তাহযীবুল কামাল-৬/১৭

৪৩. ড: 'উমার ফাররূখ, তারীখুল আদাব আল- 'আরাবী-১/৩২৫

আসছিল। হাস্‌সানের (রা) খান্দানটি ছিল তেমনিই। উপরের দিকে তাঁর পিতামহ ও পিতা, নীচের দিকে তাঁর পুত্র 'আবদুর রহ্‌মান, পৌত্র সা'ঈদ ইবন 'আবদির রহ্‌মান এবং তিনি নিজে সকলেই ছিলেন তাঁদের সমকালে একেকজন শ্রেষ্ঠ কবি।[৪৪] হাস্‌সানের (রা) এক মেয়েও একজন বড় মাপের কবি ছিলেন। হাস্‌সান (রা) তাঁর বার্ধক্যে এক রাতে কবিতা রচনা করতে বসেছেন। কয়েকটি শ্লোক রচনার পর আর ছন্দ মিলাতে পারছেন না। তাঁর অবস্থা বুঝতে পেরে মেয়ে বললেন ঃ বাবা, মনে হচ্ছে আপনি আর পারছেন না। বললেন ঃ ঠিকই বলেছো। মেয়ে বললেন ঃ আমি কি কিছু শ্লোক মিলিয়ে দেব ? বললেন ঃ পারবে ? মেয়ে বললেন ঃ হাঁ, তা পারবো। তখন বৃদ্ধ একটি শ্লোক বললেন, আর তার সাথে মিল রেখে একই ছন্দে মেয়েও একটি শ্লোক রচনা করলেন। তখন হাস্‌সান বললেন ঃ তুমি যতদিন জীবিত আছ আমি আর একটি শ্লোকও রচনা করবো না। মেয়ে বললেন ঃ তা হয় না; বরং আমি আর আপনার জীবদ্দশায় কোন কবিতা রচনা করবো না।[৪৫]

প্রাক-ইসলামী আমলের অগণিত আরব কবির অনেকে ছিলেন 'আসহাবে মুযাহ্‌হাবাত' নামে খ্যাত। 'মুযাহ্‌হাবাত' শব্দটি 'যাহাব' থেকে নির্গত। 'যাহাব' অর্থ স্বর্ণ। যেহেতু এ সকল কবিদের কিছু অনুপম কবিতা স্বর্ণের পানি দ্বারা লিখিত হয়েছিল, এজন্য সেই কবিতাগুলিকে 'মুযাহ্‌হাবাত' বলা হতো। আর 'আসহাব' শব্দটি 'সাহেব' শব্দের বহুবচন। যার অর্থ 'অধিকারী, মালিক।' সুতরাং' 'আসহাবে মুযাহ্‌হাবাত' অর্থ স্বর্ণ দ্বারা লিখিত কবিতা সমূহের অধিকারী বা রচয়িতাগণ। পরবর্তীকালে প্রত্যেক কবির সর্বোত্তম কবিতাটিকে 'মুযাহ্‌হাব' বলা হতে থাকে। হাস্‌সানের (রা) 'মুযাহ্‌হাবার' প্রথম পংক্তি নিম্নরূপ ঃ[৪৬]

لعمسر أبيك الخير حقا لما نبا + على لسانى فى الخطوب ولا يدى

'তোমার কল্যাণময় পিতার জীবনের কসম! বিপদ-আপদে সত্যিকার অর্থে আমার জিহ্‌বা আমার প্রতিকূল হয়নি এবং আমার হাতও বিরোধিতা করেনি।'

আরবী কবিদের চারটি তবকা বা স্তর। ১. জাহিলী বা প্রাক-ইসলামী কালের কবি, ২. মুখাদরাম-যে সকল কবি জাহিলী ও ইসলামী উভয় কাল পেয়েছেন, ৩. ইসলামী-যারা ইসলামের অভ্যুদয়ের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং কবি হয়েছেন, ৪. মুহদাছ-আব্বাসী বা পরবর্তীকালের কবি। এ দিক দিয়ে হযরত হাস্‌সান দ্বিতীয় স্তরের কবি। তিনি জাহিলী ও ইসলাম-উভয়কালই পেয়েছেন।[৪৭] কাব্য প্রতিভায় হাস্‌সান (রা) ছিলেন জাহিলী আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন ঃ হাস্‌সানের জাহিলী

---

৪৪. কিতাবুল 'উমদাহ-২/২৩৫
৪৫. আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা'-১৪০
৪৬. কিতাবুল 'উমদাহ-১/৬১; জুরজী যায়দান, তারীখুল আদাব-১/১৫০
৪৭. কিতাবুল 'উমদাহ্-১/২১

আমলের কবিতা শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের অন্তর্গত।৪৮

হাস্‌সানের (রা) কাব্য জীবনের দুইটি অধ্যায়। একটি জাহিলী ও অন্যটি ইসলামী। যদিও দুইটি ভিন্নধর্মী অধ্যায়, তথাপি একটি অপরটি থেকে কোন অংশে কম নয়। জাহিলী জীবনে তিনি গাস্‌সান ও হীরার রাজন্যবর্গের স্তুতি ও প্রশংসাগীতি রচনার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। ইসলামী জীবনে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসা, তাঁর পক্ষে প্রতিরোধ ও কুরায়শদের নিন্দার জন্য। তিনি সমকালীন শহুরে কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃত। বিদ্রুপাত্মক কবিতা রচনায় অতি দক্ষ। আবূ 'উবায়দাহ্ বলেন ঃ 'অন্য কবিদের ওপর হাস্‌সানের মর্যাদা তিনটি কারণে। জাহিলী আমলে তিনি আনসারদের কবি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়াতের সময়কালে 'শা'ইরুর রাসূল' এবং ইসলামী আমলে গোটা য়ামনের কবি।৪৯

জাহিলী আরবে 'উকাজ মেলায় প্রতি বছর সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎসব ও প্রতিযোগিতা হতো। এ প্রতিযোগিতায় হাস্‌সানও অংশগ্রহন করতেন। একবার তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ কবি আন-নাবিগা আয্-যুবইয়ানী (মৃত্যু ঃ ৬০৪ খ্রী.) ছিলেন এ মেলার কাব্য বিচারক। কবি হাস্‌সান ছিলেন একজন প্রতিযোগী। বিচারক আন-নাবিগা, আল-আ'শাকে হাস্‌সানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কবি বলে রায় দিলে হাস্‌সান তার প্রতিবাদ করেন এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে দাবী করেন।৫০

আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী বলেন ঃ আল-আ'শা আবু বাসীর প্রথমে কবিতা পাঠ করেন। তারপর পাঠ করেন হাস্‌সান ও অন্য কবিরা। সবশেষে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি আল-খান্‌সা বিন্‌ত 'আমর তাঁর কবিতা পাঠ করেন। তাঁর পাঠ শেষ হলে বিচারক আন-নাবিগা বলেন ঃ আল্লাহর কসম! একটু আগে পঠিত আবু বাসীর আল-আ'শার কবিতাটি যদি আমি না শুনতাম তাহলে অবশ্যই বলতাম, তুমি জিন ও মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর এ রায় শোনার সাথে সাথে হাস্‌সান উঠে দাঁড়ান এবং বলেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি আপনার পিতা ও আপনার চেয়ে বড় কবি। আন-নাবিগা তখন নিজের দুইটি চরণ আবৃত্তি করে বলেন ঃ ভাতিজা! তুমি এ চরণ দুইটির চেয়ে সুন্দর কোন চরণ বলতে পারবে কি ? তখন হাস্‌সান তাঁর কথার জন্য লজ্জিত হন।৫১ অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আন-নাবিগার কথার জবাবে হাস্‌সান তাঁর-

---

৪৮. দিওয়ানে হাস্‌সান-২৮

৪৯. জুরজী যায়দান, তারীখুল আদাব-১/১৪৮; আল-ইসাবা-১/৩২৬

৫০. কিতাবুল আগানী-৯/৩৪০; জুরজী যায়দান-১/১০৩

৫১. আল-আগানী-১১/৬

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى
وأسيافنا يقطرن من نجدة دما

'আমাদের এমন অনেক উজ্জ্বল-শুভ্র পাত্র আছে যা পূর্বাহ্নকালে চক্‌চক্‌ করে।

আর আমাদের তরবারি সমূহ থেকে বীর-বাহাদুরের রক্ত টপটপ করে পড়তে থাকে।' –পংক্তি দুইটি আবৃত্তি করেন। আন-নাবিগা তখন পংক্তি দুইটির কঠোর সমালোচনা করে হাস্‌সানের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন।৫২

হাস্‌সান (রা) জাহিলী জীবনেই কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করেন। গোটা আরবে এবং পার্শ্ববর্তী রাজ দরবারসমূহে তিনি খ্যাতিমান কবিদের তালিকায় নিজের নামটি লেখাতে সক্ষম হন। এরই মধ্যে তাঁর জীবনের ষাটটি বছর পেরিয়ে গেছে। এরপর তিনি ইসলামের দা'ওয়াত লাভ করলেন। রাসূল (সা) মদীনায় হিজরাত করে আসলেন। হাস্‌সানের কাব্য-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হলো। তিনি স্বীয় কাব্য প্রতিভার যথাযথ হক আদায় করে 'শা'ইরুর রাসূল' খিতাব অর্জন করলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করে আসার পর মক্কার কুরায়শরা এ আশ্রয়স্থল থেকে তাঁকে উৎখাতের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এক দিকে তারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়, অন্যদিকে তারা তাদের কবিদের লেলিয়ে দেয়। তারা আল্লাহর রাসূল, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে কবিতা রচনা করতো এবং আরববাসীদেরকে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতো। এ ব্যাপারে মক্কার কুরায়শ কবি আবূ সুফইয়ান ইবনুল হারিছ ইবন 'আবদিল মুত্তালিব, 'আবদুল্লাহ ইবন যিবা'রী, 'আমর ইবনুল 'আস ও দাররার ইবনুল খাত্তাব অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও নিন্দাসূচক কবিতা রাসূল (সা) সহ মুসলমানদেরকে অস্থির করে তোলে। এ সময় মদীনায় মুহাজিরদের মধ্যে 'আলী (রা) ছিলেন একজন নামকরা কবি। মদীনার মুসলমানরা তাঁকে অনুরোধ করলো মক্কার কবিদের জবাবে একই কায়দায় ব্যঙ্গ কবিতা রচনার জন্য। 'আলী (রা) বললেন, রাসূল (সা) আমাকে অনুমতি দিলে আমি তাদের জবাব দিতে পারি। একথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কানে গেলে তিনি বললেন, 'আলী এ কাজের উপযুক্ত নয়। যারা আমাকে তরবারি দিয়ে সাহায্য করেছে, আমি 'আলীকে তাদের সাহায্যকারী করবো। হাস্‌সান উপস্থিত ছিলেন তিনি নিজের জিহ্‌বা টেনে ধরে বললেন ঃ আমি সানন্দে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। তাঁর জিহ্‌বাটি ছিল সাপের জিহ্‌বার মত, এক পাশে কালো দাগ। তিনি সেই জিহ্‌বা বের করে স্বীয় চিবুক স্পর্শ করলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, তুমি কুরায়শদের হিজা (নিন্দা) কিভাবে করবে ? তাতে আমারও নিন্দা হয়ে যাবে না ? আমিও তো তাদেরই একজন। হাস্‌সান বললেন ঃ আমি আমার নিন্দা ও ব্যঙ্গ থেকে আপনাকে এমনভাবে বের করে আনবো যেমন আটা চেলে

---

৫২. প্রাগুক্ত-৯/৩৪০; নাকদুশ শি'র-৯২

চুল ও অন্যান্য ময়লা বের করে আনা হয়। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি নসবনামার (কুষ্ঠিবিদ্যা) ব্যাপারে আবূ বকরের সাহায্য নেবে। তিনি কুরায়শদের নসব বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি আমার নসব তোমাকে বলে দেবেন।৫৩

জাবির (রা) বলেন। আহযাব যুদ্ধের সময় একদিন রাসূল (সা) বললেন ঃ কে মুসলমানদের মান-সম্মান রক্ষা করতে পারে ? কা'ব ইবন মালিক বললেন ঃ আমি। 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বললেন ঃ আমি। হাস্সান বললেন ঃ আমি। রাসূল (সা) হাস্সানকে বললেন ঃ হাঁ, তুমি। তুমি তাদের হিজা (নিন্দা) কর। তাদের বিরুদ্ধে রুহুল কুদুস জিবরীল তোমাকে সাহায্য করবেন।৫৪

হাস্সান (রা) আবূ বকরের (রা) নিকট যেতেন এবং কুরায়শ বংশের বিভিন্ন শাখা, ব্যক্তির নসব ও সম্পর্ক বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতেন। আবূ বকর বলতেন, অমুক অমুক মহিলাকে মুক্ত রাখবেন। তাঁরা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাদী। অন্য সকল মহিলাদের সম্পর্কে বলবেন। হাস্সান সে সময় কুরায়শদের নিন্দায় একটি কাসীদা রচনা করেন। তাতে তিনি কুরায়শ সন্তান 'আবদুল্লাহ, যুবায়র, হামযা, সাফিয়্যা, 'আব্বাস ও দাররার ইবন 'আবদিল মুত্তালিবকে বাদ দিয়ে একই গোত্রের তৎকালীন মুশরিক নেতা ও কবি আবূ সুফইয়ান ইবনুল হারেছ-এর মা সুমাইয়্যা ও তার পিতা আল-হারেছের তীব্র নিন্দা ও ব্যঙ্গ করেন।

উল্লেখ্য যে, এই আবূ সুফইয়ান ইবনুল হারেছ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাতো ও দুধ ভাই। ইসলামপূর্ব সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাথে তাঁর খুবই ভাব ছিল। নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর তার সাথে দুশমনি শুরু হয়। তিনি ছিলেন একজন কবি। রাসূল (সা) ও মুসলমানদের নিন্দায় কবিতা রচনা করতেন। মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুনায়ন যুদ্ধে যোগদান করেন। এই আবূ সুফইয়ানের নিন্দায় হাস্সান রচনা করেন এক অনবদ্য কাসীদা। তার কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ৫৫

هجوت محمدا فأجبت عنه + وعند الله فى ذاك الجزاء

هجوت مباركا برًا حنيفا + أمين الله شيمته الوفاء

أتهجوه ولست له بكفو + فشركما لخير كما الفداء

فإن أبى ووالده وعرضى + لعرض محمد منكم وقاء

১. তুমি মুহাম্মাদের নিন্দা করেছো আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি। আর এর

---

৫৩. বুখারী-২/৯০৯; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৪, ৫১৫; তাহযীবু ইবন 'আসাকির -৪/১৩০

৫৪. আল-আগানী-১৬/২৩২; সীয়ারু আ'লম আ-নুবালা-২/৫১৪

৫৫. আল-আগানী-৪/১৬৩; উসুদুলগাবা-২/৫; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৫,৫১৬; সীরতু ইবন হিশাম-২/৪২৪

প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর কাছে।

২. তুমি নিন্দা করেছো একজন পবিত্র, পুণ্যবান ও সত্যপন্থী ব্যক্তির। যিনি আল্লাহর পরম বিশ্বাসী এবং অঙ্গিকার পালন করা যাঁর স্বভাব।

৩. তুমি তাঁর নিন্দা কর ? অথচ তুমি তো তাঁর সমকক্ষ নও। অতএব, তোমাদের দুইজনের মধ্যে নিকৃষ্টতর ব্যক্তি তোমাদের উৎকৃষ্টতরের জন্য উৎসর্গ হোক।

৪. অতএব, আমার পিতা, তাঁর পিতা এবং আমার মান-ইজ্জত মুহাম্মাদের মান-সম্মান রক্ষায় নিবেদিত হোক।

হাস্‌সানের (রা) এ কবিতাটি শুনে আবূ সুফইয়ান ইবনুল হারিছ মন্তব্য করেন ঃ নিশ্চয় এর পিছনে আবূ বকরের হাত আছে। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসায় ও কাফিরদের নিন্দায় ৭০টি বয়েত (শ্লোক) রচনায় জিবরীল (আ) তাঁকে সাহায্য করেন।[৫৬]

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কাব্যের প্রতিরোধ ব্যূহ রচনায় হাস্‌সানের (রা) এমন প্রয়াসে রাসূলে কারীম (সা) দারুণ খুশী হতেন। একবার তিনি বলেন ঃ 'হাস্‌সান! আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে তুমি জবাব দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাকে রুহুল কুদুস জিবরীলের দ্বারা সাহায্য কর।'[৫৭]

আর একবার রাসূল (সা) হাস্‌সানকে (রা) বললেন ঃ 'তুমি কুরায়শদের নিন্দা ও বিদ্রুপ করতে থাক, জিবরীল তোমাদের সাথে আছেন। [৫৮]

একটি বর্ণনায় এসেছে। রাসূল (সা) বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে কুরায়শ কবিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের প্রত্যুত্তর করতে বললাম। সে সুন্দর প্রত্যুত্তর করলো। আমি কা'ব ইবন মালিককেও বললাম তাদের জবাব দিতে। সে উত্তম জবাব দিল। এরপর আমি হাস্‌সান ইবন ছাবিতকে বললাম। সে যে জবাব দিল তাতে সে নিজে যেমন পরিতৃপ্ত হলো, আমাকেও পরিতৃপ্ত করলো।[৫৯]

হাস্‌সানের (রা) কবিতা মক্কার পৌত্তলিক কবিদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো সে সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন ঃ 'হাস্‌সানের কবিতা তাদের মধ্যে তীরের আঘাতের চেয়েও তীব্র আঘাত করে।'[৬০]

'আয়িশা (রা) থেকে 'উরওয়া বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) তাঁর মসজিদে হাস্‌সানের জন্য একটি মিম্বর তৈরী করান। তার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি কাফির কবিদের জবাব দিতেন।[৬১] তিনি এ মিম্বরে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসা ও পরিচিতিমূলক কবিতা পাঠ করতেন এবং কুরায়শ কবিদের জবাব দিতেন, আর রাসূল (সা) তা শুনে

---

৫৬. তাহযীবুল কামাল-৬/২১৪

৫৭. সাহীহ বুখারী-৬/১২২; মুসলিম-(২৪৮৫); আহমাদ-৫/২২২,২২৩

৫৮. বুখারী-৬/২২২, ৭/৩২১; মুসলিম-(২৪৮৬);মুসনাদ-৪/২৯৯; আল-আগানী-৪/১৩৭

৫৯. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাব-২/৭৮

৬০. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০

৬১. আবু দাউদ-(৫০১৫); তিরমিজী-(২৮৪৬); তাহযীবুল কামাল-৬/২০

দারুণ তুষ্ট হতেন।[৬২] এ কারণে 'আয়িশা (রা) একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, তিনি তেমনই ছিলেন যেমন হাস্‌সান বলেছে।[৬৩]

হিজরী নবম সনে (খ্রী ঃ ৬৩০) আরবের বিখ্যাত গোত্র বানূ তামীমের ৭০ অথবা ৮০ জনের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এলো। এই দলে বানূ তামীমের আয্‌-যিবিরকান ইবন বদরের মত বাঘা কবি ও 'উতারিদ ইবন হাজিবের মত তুখোড় বক্তাও ছিলেন। তখন গোটা আরবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। তার আগের বছর মক্কাও বিজিত হয়েছে। জনসংখ্যা, শক্তি ও মর্যাদার দিক দিয়ে গোটা বানূ তামীমের তখন ভীষণ দাপট। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে আরবের প্রথা অনুযায়ী বললো ঃ 'মুহাম্মাদ! আমরা এসেছি আপনার সাথে গর্ব ও গৌরব প্রকাশের প্রতিযোগিতা করতে। আপনি আমাদের কবি ও খতীব (বক্তা) দেরকে বলার অনুমতি দিন।' রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আপনার খতীবদের অনুমতি দেওয়া হলো।' তখন বানূ তামীমের পক্ষে তাদের শ্রেষ্ঠ খতীব 'উতারিদ ইবন হাজিব উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের গৌরব ও কীর্তির বর্ণনা দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষে জবাব দিলেন প্রখ্যাত খতীব ছাবিত ইবন কায়স। তারপর বানূ তামীমের কবি যিবিরকান ইবন বদর দাঁড়ালেন এবং তাদের গৌরব ও কীর্তি কথায় ভরা স্বরচিত কাসীদা পাঠ করলেন। তাঁর আবৃত্তি শেষ হলে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'হাস্‌সান, ওঠো! লোকটির জবাব দাও।' হাস্‌সান দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষ কবির একই ছন্দ ও অন্ত্যমিলে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত এক দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। তাঁর এ কবিতা পক্ষ-বিপক্ষের সকলকে দারুণ মুগ্ধ করে। বানূ তামীমের শ্রোতারা এক বাক্যে সেদিন বলে, মুহাম্মদের খতীব আমাদের খতীব অপেক্ষা এবং তাঁর কবি আমাদের কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হযরত হাস্‌সানের (রা) সেই কবিতাটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ[৬৪]

إن الذوائب من فهرو إخوتهم + قد بيّنُوا سنّةً للنَّاسِ تتبع

يرضى بهم كل من كانت سريرته + تقوى الإلـه، وكل الخير يصطنع

قوم إذا حاربوا اضروا عدوهم + أوحاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا

سجية تلك فيهم غير محدثة + إن الخلائق، فاعلم شرها البدع

إن كان فى الناس سباقون بعدهم + فكل سبق لأدنى سبقهم تبع

---

৬২. *উস্‌দুল গাবা-২/৪; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৫*

৬৩. *উসদুল গাবা-২/৪*

৬৪. *আল-ইসতী'আব-১/১৩১; জুরজী যায়দান, তারীখ-১/১৪৯; ড.শাওকী দায়ফ, তারীখ-১/২২৯ ; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৫৬৪*

لا يرقع الناس ما أو هت أكفهم + عند الدفاع، ولا يوهون مارقعوا

إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم+ وزانوا أهل مجد بالندى متعوا

أعفة ذكرت فى الوحى عفتهم + لا يطبعون ولا يرديهم طمع

لا يفخرون إذا نالوا عدوّهم + وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع

اكرم بقوم رسول الله شيعتهم + إذا تفاوتت الاهواء والشيع

'মদীনার মুহাজির কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের ভায়েরা (আনসারগণ) মিলে মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য একটি নিয়ম-পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন।

যাঁদের অন্তরে খোদাভীতি আছে তাঁরা সকলে তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং সব ধরনের কল্যাণধর্মী কাজ তাঁরা করেন।

তাঁরা এমন একটি সম্প্রদায় যে, যুদ্ধ করলে তাঁদের শত্রুর ক্ষতি সাধন করেন এবং তাঁদের আপনজনদের উপকার করতে চাইলে তারা উপকার করেন।

ওটা তাঁদের জন্মগত স্বভাব, নতুন কোন জিনিস নয়। জেনে রাখ, সৃষ্টির সবচেয়ে খারাপ কর্ম হলো গোত্রের আদত-অভ্যাসের পরিপন্থী কোন নতুন পন্থা-পদ্ধতি চালু করা।

যদি তাঁদের পরে মানুষের মধ্যে অগ্রগামী লোকের জন্ম হয়, তাহলে তাদের প্রত্যেক অগ্রগামিতা তাঁদের নিম্নতম অগ্রগামিতার অনুসারী হবে।

যুদ্ধে তাঁরা যাদেরকে পরাজিত করেন কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়না। আর তাঁরা যাদেরকে সাহায্য করেন কেউ তাদেরকে পরাজিত করতে পারেনা।

যদি তাঁরা কোন দিন কোন ভালো কাজে মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা করেন তাহলে তাঁরাই বিজয়ী হন। আর যদি তাঁরা মহৎ প্রাণ ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে তাদের বদান্যতার বিপরীতে পাল্লায় ওজন দেয় তাহলে তাঁদের পাল্লাটিই ভারী হয়।

তাঁরা পূত:-পবিত্র লোক, তাঁদের পবিত্রতার কথা ওহীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা কদাচারে কলুষিত হননা এবং লোভ লালসাও তাঁদেরকে ধ্বংস করতে পারে না।

তাঁরা যখন দুশমনদেরকে বাগে পান, গর্ব করেন না। আর তাঁরা আক্রান্ত হলে দুর্বল ও অস্থির হয়ে পড়েন না।

তুমি এমন একটি সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর যাঁদের সাহায্যকারী হলেন আল্লাহর রাসূল। যখন বিভিন্ন জনের কামনা-বাসনা ও বিভিন্ন সাহায্যকারীরা বিভিন্নমুখী হয়ে পড়েছে।'

হাস্সানের (রা) জাহিলী কবিতার বিষয়বস্তু ছিল গোত্রীয় ও ব্যক্তিগত মাদাহ(প্রশংসা) ও হিজা (নিন্দা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ)। তাছাড়া শোকগাথা, মদ পানের আড্ডা ও মদের বর্ণনা,

বীরত্ব, গর্ব মূলক এবং প্রেম সংগীত রচনা করেছেন। ইসলামী জীবনের কবিতায় তিনি অন্তর দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসা করেছেন, আর নিন্দা করেছেন পৌত্তলিকদের যারা আল্লাহর রাসূল ও ইসলামের সাথে দুশমনী করেছে।

ইসলাম তাঁর কবিতায় সততা ও মাধুর্য দান করেছে। কবিতায় তিনি ইসলামের বহু বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। কবিতায় পবিত্র কুরআনের প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এ কারণে যারা আরবী কবিতায় গতানুগতিকার বন্ধন ছিন্ন করে অভিনবত্ব আনয়নের চেষ্টা করেছেন, হাস্‌সানকে তাদের পুরোধা বলা সঙ্গত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসা গীতি বা না'তে রাসূল রচনার সূচনাকারী তিনিই। আরবী কবিতায় জাহিলী ও ইসলামী আমলে মাদাহ (প্রশংসা গীতি) রচনায় যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, হাস্‌সান তাদের অন্যতম।[৬৫]

ইবনুল আছির বলেন ঃ পৌত্তলিক কবিদের নিন্দা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও অপপ্রচারের জবাব দানের জন্য তৎকালীন আরবের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁরা হলেন হাস্‌সান ইবন ছাবিত, কা'ব ইবন মালিক ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। হাস্‌সান ও কা'ব প্রতিপক্ষ কবিদের জবাব দিতেন তাদেরই মত বিভিন্ন ঘটনা, যুদ্ধ-বিগ্রহের জয়-পরাজয়, কীর্তি ও গৌরব তুলে ধরে, আর 'আবদুল্লাহ তাদের কুফরী ও দেব-দেবীর পূজার কথা উল্লেখ করে ধিক্কার দিতেন। তাঁর কবিতা প্রতিপক্ষের ওপর তেমন বেশী প্রভাব ফেলতো না। তবে অন্য দুইজনের কবিতা তাদেরকে দারুণভাবে আহত করতো।[৬৬]

হাস্‌সান (রা) আল্লাহ ও রাসূলের (সা) প্রতি কুরায়শদের অবাধ্যতা ও তাদের মূর্তিপূজার উল্লেখ করে নিন্দা করতেন না। কারণ তাতে তেমন ফল না হওয়ারই কথা। তারা তো রাসূলকে (সা) বিশ্বাসই করেনি। আর মূর্তি পূজাকেই তারা সত্য বলে বিশ্বাস করতো। তাই তিনি তাদের বংশগত দোষ-ত্রুটি, নৈতিকতার স্খলন, যুদ্ধে পরাজয় ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরে তাদেরকে চরমভাবে আহত করতেন। আর একাজে আবূ বকর (রা) তাঁকে জ্ঞান ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করতেন।

প্রাচীন আরবী কবিতার যতগুলি বিষয় বৈচিত্র আছে তার সবগুলিতে হাস্‌সানের (রা) পদচারণা পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে তাঁর কবিতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো ঃ

১. উপমার অভিনবত্ব ঃ একথা সত্য যে প্রাচীন আরবী কবিতা কোন উন্নত সভ্যতার মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। তবে একথাও অস্বীকার করা যাবে না, বড় সভ্যতা দ্বারা তা অনেক

---

৬৫. ড. 'উমার ফাররূখ, তারিখ-১/৩২৬

৬৬. উসুদুল গাবা-২/৫

ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছে। আরব সভ্যতার সত্যিকার সূচনা হয়েছে পবিত্র কুরআনের অবতরণ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাবের সময় থেকে। কুরআন আরবী বাচনভঙ্গি ও বাক্যালঙ্কারের সবচেয়ে বড় বাস্তব মুজিযা। এই কুরআন অনেক বড় বড় বাগ্মীকে হতবাক করে দিয়েছ। এ কারণে সে সময়ের যে কবি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁর মধ্যে বাক্‌পটুতা ও বাক্যালঙ্কারের এক নতুন শক্তির সৃষ্টি হয়। এ শ্রেণীর কবিদের মধ্যে হাস্‌সান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এ শক্তি তাঁর মধ্যে তুলনামুলকভাবে সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কিরামের গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- সিজদার চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলে স্পষ্ট বিদ্যমান। হাস্‌সান উক্ত আয়াতকে উছমানের (রা) প্রশংসায় রূপক হিসেবে ব্যবহার করে হত্যাকারীদের ধিক্‌কার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ[৬৭]

'তারা এই কাঁচা-পাকা কেশধারী, ললাটে সিজদার চিহ্ন বিশিষ্ট লোকটিকে জবাই করে দিল, যিনি তাসবীহ্ পাঠ ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করতেন।'

এই শ্লোকে কবি 'উছমানের চেহারাকে সিজদার চিহ্নধারী বলেছেন। তৎকালীন আরবী কবিতায় এ জাতীয় রূপকের প্রয়োগ সম্পূর্ণ নতুন।

২.চমৎকার প্রতীকের ব্যবহার ঃ আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে তাতবী' বা 'তাজাওয়ায' নামে এক প্রকার প্রতীকের নাম দেখা যায়। তার অর্থ হলো, কবি কোন বিষয়ের আলোচনা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু অকস্মাৎ অতি সচেতনভাবে তা ছেড়ে দিয়ে এমন এক বিষয়ের বর্ণনা করেন যাতে তাঁর পূর্বের বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। হাস্‌সানের কবিতায় এ জাতীয় প্রতীক বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আরবে অসংখ্য গোত্র দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে বসবাস করতো। তারা ছিল যাযাবর। যেখানে পানি ও পশুর চারণভূমি পাওয়া যেত সেখানেই তাঁবু গেড়ে অস্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলতো। পানি ও পশুর খাদ্য শেষ হলে নতুন কোন স্থানের দিকে যাত্রা করতো। এভাবে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতো। আরব কবিরা তাদের কাব্যে এ জীবনকে নানাভাবে ধরে রেখেছেন। তবে হাস্‌সান বিষয়টি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে বেশ অভিনবত্ব আছে। তিনি বলছেন ঃ[৬৮]

أولاد جفنه عند قبر أبيهم + قبرابن مارية الكريم المفضل

'জাফ্‌নার সন্তানরা তাদের পিতা ইবন মারিয়্যার কবরের পাশেই থাকে, যিনি খুবই উদার ও দানশীল।'

---

৬৭. কিতাবুল 'উমদাহ-১/১৮৬, ৬৮; আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা'-১৩৯
৬৮.আশ-শির'র ওয়াশ শু'আরা-১৩৯

প্রশংসিত ব্যক্তি যেহেতু আরব বংশোদ্ভূত। এ কারণে তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করে বলে দিলেন, এঁরা আরব হলেও যাযাবর নন, বরং রাজন্যবর্গ। কোন রকম ভীতি ও শঙ্কা ছাড়াই তাঁরা তাঁদের পিতার কবরের আশে-পাশেই বসবাস করেন। তাঁদের বাসস্থান সবুজ-শ্যামল। একারণে তাঁদের স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেড়ানোর প্রয়োজন পড়েনা।

৩. রূপকের অভিনবত্ব ঃ আরব কবিরা কিছু কথা রূপক অর্থে এবং পরোক্ষভাবে বর্ণনা করতেন। যেমন ঃ যদি উদ্দেশ্য হয় একথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি অতি মর্যাদাবান ও দানশীল, তাহলে তাঁরা বলতেন, এই গুণগুলি তার পরিচ্ছেদের মধ্যেই আছে। হাস্‌সানের (রা) কবিতায় রূপকের অভিনবত্ব দেখা যায়। যেমন একটি শ্লোকে তিনি বলতে চান, আমরা খুবই কুলিন ও সম্ভ্রান্ত। কিন্তু কথাটি তিনি বলেছেন এভাবে ঃ 'সম্মান ও মর্যাদা আমাদের আঙ্গিনায় ঘর বেঁধেছে এবং তার খুঁটি এত মজবুত করে গেঁড়েছে যে, মানুষ তা নাড়াতে চাইলেও নাড়াতে পারে না।' এই শ্লোকে সম্মান ও মর্যাদার ঘর বাঁধা, সুদৃঢ় পিলার স্থাপন করা এবং তা টলাতে মানুষের অক্ষম হওয়া এ সবই আরবী কাব্যে নতুন বর্ণনারীতি।

৪. ছন্দ, অন্ত্যমিল ও স্বর সাদৃশ্যের আশ্চর্য রকমের এক সৌন্দর্য তাঁর কবিতায় দেখা যায়। শব্দের গাঁথুনি ও বাক্যের গঠন খুবই শক্ত, গতিশীল ও সাবলীল। প্রথম শ্লোকের প্রথম অংশের শেষ পদের শেষ বর্ণটি তাঁর বহু কাসীদার প্রতিটি শ্লোকের শেষ পদের শেষ বর্ণ দেখা যায়। আরবী ছন্দ শাস্ত্রে যাকে 'কাফিয়া' বলা হয়। আরবী বাক্যের এ ধরনের শিল্পকারিতা এর আগে কেবল ইমরুল কায়সের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। তবে তাঁর পরে বহু আরব কবি নানা রকম শিল্পকারিতার সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। আব্বাসী আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি আবুল 'আলা আল মা'আররীর একটি বিখ্যাত কাব্যের নাম 'লুযূমু মালা ইয়ালযাম'। কবিতা রচনায় এমন কিছু বিষয় তিনি অপরিহার্যরূপে অনুসরণ করেছেন, যা আদৌ কবিতার জন্য প্রয়োজন নয়। তার এ কাব্যগ্রন্থটি এ ধরনের কবিতার সমষ্টি। এটা তাঁর একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

৫. হাস্‌সানের কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি প্রায়ই এমন সব শব্দ প্রয়োগ করেছেন যা ব্যাপক অর্থবোধক। তিনি হয়তো একটি ভাব স্পষ্ট করতে চেয়েছেন এবং সেজন্য এমন একটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন যাতে উদ্দিষ্ট বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় সুন্দরভাবে এসে গেছে।[৬৯]

৬. অতিরঞ্জন ও অতিকথন ঃ হাস্‌সানের ইসলামী কবিতা যাবতীয় অতিরঞ্জন ও অতিকথন থেকে মুক্ত বলা চলে। একথা সত্য যে কল্পনা ও অতিরঞ্জন ছাড়া কবিতা হয় না। তিনি নিজেই বলতেন, মিথ্যা বলতে ইসলাম নিষেধ করেছে। এ কারণে অতিরঞ্জন

৬৯; কুদামা ইবন জা'ফর ঃ নাকদুশ শি'র-১৪৫

ও অতিকথন, যা মূলত ঃ মিথ্যারই নামান্তর- আমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।[৭০]
শুধু তাই নয়, তাঁর জাহিলী আমলে লেখা কবিতায়ও এ উপাদান খুব কম ছিল। আর এ কারণে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ কবি আন-নাবিগা কবি হাস্‌সানের একটি শ্লোকের অবমূল্যায়ন করলে দুই জনের মধ্যে ঝগড়া হয়।[৭১]

হাস্‌সানের ইসলামী কবিতার মূল বিষয় ছিল কাফিরদের প্রতিরোধ ও নিন্দা করা। কাফিরদের হিজা ও নিন্দা করে তিনি বহু কবিতা রচনা করেছেন। তবে তাঁর সেই কবিতাকে অশ্লীলতা স্পর্শ করতে পারেনি। তৎকালীন আরব কবিরা 'হিজা' বলতে নিজ গোত্রের প্রশংসা এবং বিরোধী গোত্রের নিন্দা বুঝাতো। এই নিন্দা হতো খুবই তীর্যক ও আক্রমণাত্মক। এ কারণে কবিরা তাদের কবিতায় সঠিক ঘটনাবলী প্রাসঙ্গিক ও মনোরম ভঙ্গিতে তুলে ধরতো। জাহিলী কবি যুহায়র ইবন আবী-সুলমার 'হিজা' বা নিন্দার একটি স্টাইল আমরা তার দুইটি শ্লোকে লক্ষ্য করি। তিনি 'হিস্‌ন' গোত্রের নিন্দায় বলেছেনঃ[৭২]
'আমি জানিনে। তবে মনে হয় খুব শিগ্‌গীর জেনে যাব। 'হিস্‌ন' গোত্রের লোকেরা পুরুষ না নারী ? যদি পর্দানশীল নারী হয় তাহলে তাদের প্রত্যেক কুমারীর প্রাপ্য হচ্ছে উপহার।'

যুহায়রের এ শ্লোকটি ছিল আরবী কবিতার সবচেয়ে কঠোর নিন্দাসূচক। এ কারণে শ্লোকটি উক্ত গোত্রের লোকদের দারুণ পীড়া দিয়েছিল। হাস্‌সানের নিন্দাবাদের মধ্যে শুধু গালিই থাকতো না, তাতে থাকতো প্রতিরোধ ও প্রতিউত্তর। তাঁর স্টাইলটি ছিল অতি চমৎকার। কুরায়শদের নিন্দায় রচিত তাঁর একটি কবিতার শেষের শ্লোকটি সেকালে এতখানি জনপ্রিয়তা পায় যে তা প্রবাদে পরিণত হয়। শ্লোকটি নিম্নরূপ ঃ

وأشهد أن إلك من قرَيْش+ كإلّ السقب من ولد النعام

'আমি জানি যে তোমার আত্মীয়তা কুরায়শদের সংগে আছে। তবে তা এ রকম যেমন উট শাবকের সাথে উট পাখীর ছানার সাদৃশ্য হয়ে থাকে।'[৭৩]
পরবর্তীকালে কবি ইবনুল মুফারিরগ উল্লেখিত শ্লোকটির ১ম পংক্তিটি আমীর মু'আবিয়ার (রা) নিন্দায় প্রয়োগ করেছেন।[৭৪] আল-হারেছ ইবন 'আউফ আল-মুররীর গোত্রের বসতি এলাকায় রাসূলুল্লাহ (সা) প্রেরিত একজন মুবাল্লিগ নিহত হলে কবি হাস্‌সান তার নিন্দায় একটি কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন ঃ

إن تغدروا فالغدر منكم شيمة + والغدر ينبت فى أصول السخبر

---

৭০. উসুদুল গাবা-২/৫
৭১. নাকদুশ শি'র-৯২
৭২. কিতবুল 'উমাদাহ-২/১৩৯
৭৩. ড. শাওকী দায়ফ, তারিখ-২/৮২
৭৪. আশ-শি'র ওয়াশ- শু'আরা-১৭২

'যদি তোমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে থাক তাহলে তা এমন কিছু নয়। কারণ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা তোমাদের স্বভাব। আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মূল থেকেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ অঙ্কুরিত হয়।'

হাস্সানের এই বিদ্রূপাত্মক কবিতা শুনে আল-হারেছের দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন নেমে আসে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে ছুটে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং হাস্সানকে বিরত রাখার আবেদন জানান।[৭৫]

হাস্সান (রা) চমৎকার মাদাহ্ বা প্রশংসা গীতি রচনা করেছেন। আলে 'ইনানের প্রশংসায় তিনি যে সকল কবিতা রচনা করেছেন তার দুইটি শ্লোক এ রকম ঃ

يسقون من ورد البريص عليهم + بردى يصفق بالرحيق السلسل

'যারা তাদের নিকট যায় তাদেরকে তারা 'বারীস' নদীর পানি স্বচ্ছ শরাবের সাথে মিশিয়ে পান করায়।'

এই শ্লোকটিরই কাছাছাছি একটি শ্লোক রচনা করেছেন কবি ইবন কায়স, মুস'আব ইবন যুবায়রের প্রশসংসায়। কিন্তু যে বিষয়টি হাস্সানের শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে তা ইবন কায়সের শ্লোকে অনুপস্থিত।[৭৬]

অন্য একটি শ্লোকে তিনি গাসসানীয় রাজন্যবর্গের দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতার একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন চমৎকার স্টাইলে।

يغشون حتى ما تهر كلابهم + لا يسألون عن السواد المقبل

'তাঁদের গৃহে সব সময় অতিথিদের এত ভিড় থাকে যে তাঁদের কুকুরগুলিও তা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন আর তারা অন্ধকার রাতে নতুন আগন্তুককে দেখে ঘেউ ঘেউ করে না।'

আরবী কাব্য জগতের বিখ্যাত তিন কবির তিনটি শ্লোক প্রশংসা বা মাদাহ্ কবিতা হিসেবে সর্বোত্তম। এ ব্যাপারে প্রায় সকলে একমত। তবে এ তিনটির মধ্যে সবচেয়ে ভালো কোনটি সে ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। কবি হুতাইয়্যা হাস্সানের এ শ্লোকটিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। কিন্তু অন্যরা আবুত তিহান ও নাবিগার শ্লোক দুইটিকে সর্বোত্তম বলেছেন।[৭৭] উমাইয়্যা খলীফা 'আবদুল মালিক ছিলেন একজন বড় জ্ঞানী ও সাহিত্য রসিক মানুষ। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো 'আরবরা যত প্রশংসাগীতি রচনা করেছে তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো হাস্সানের শ্লোকটি।'[৭৮] তিনি রাসূলে কারীমের প্রশংসায় যে সকল কবিতা রচনা করেছেন তার স্টাইল ও শিল্পকারিতায় যথেষ্ট নতুনত্ব আছে। রাসূলুল্লাহর

৭৫. *ড. শাওকী দায়ফ, তারিখ-২/৭৮-৭৯*

৭৬. *কিতাবুল 'উমাদাহ-২/১০২; আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা'-১৩৯*

৭৭. *প্রাগুক্ত-২/১১০*

৭৮. *আল-ইসতী'আব-১/১৩০*

(সা) প্রশংসায় রচিত একটি শ্লোকে তিনি বলেছেন ঃ 'অন্ধকার রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র ললাট অন্ধকারে জ্বলন্ত প্রদীপের আলোর মত উজ্জ্বল দেখায়।'

হাস্‌সান (রা) জাহিলী ও ইসলামী জীবনে অনেক মারসিয়া বা শোকগাথা রচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল ছিল মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় শোক ও ব্যথা। হাস্‌সান রচিত কয়েকটি মারসিয়ায় সে শোক অতি চমৎকাররূপে বিধৃত হয়েছে। ইবন হিশাম তাঁর সীরাতে ও ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে মারসিয়াগুলি সংকলন করেছেন।[৭৯]

হাস্‌সান ছিলেন একজন দীর্ঘজীবনের অধিকারী অভিজ্ঞ কবি। তাছাড়া একজন মহান সাহাবীও বটে। এ কারণে তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় প্রচুর উপদেশ ও নীতিকথা। কবিতায় তিনি মানুষকে উন্নত নৈতিকতা অর্জন করতে বলেছেন। সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ বিষয়ে দুইটি শ্লোক ঃ

'অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে আমি আমার মান-সম্মান রক্ষা করি। যে অর্থ-সম্পদে সম্মান রক্ষা পায়না আল্লাহ তাতে সমৃদ্ধি দান না করুন!

সম্পদ চলে গেলে তা অর্জন করা যায়; কিন্তু সম্মান বার বার অর্জন করা যায় না।'[৮০]

মানুষের সব সময় একই রকম থাকা উচিত। প্রাচুর্যের অধিকারী হলে ধরাকে সরা জ্ঞান করা এবং প্রাচুর্য চলে গেলে ভেঙ্গে পড়া যে উচিত নয়, সে কথা বলেছেন একটি শ্লোকেঃ

'অর্থ-সম্পদ আমার লজ্জা-শরম ও আত্ম-সম্মানবোধকে ভুলিয়ে দিতে পারেনি। তেমনিভাবে বিপদ-মুসিবত আমার আরাম-আয়েশ বিঘ্নিত করতে পারেনি।'[৮১]

অত্যাচারের পরিণতি যে শুভ হয় না সে সম্পর্কে তাঁর একটি শ্লোক ঃ

'আমি কোন বিষয় সম্পর্কে অহেতুক প্রশ্ন ও অনুসন্ধান পরিহার করি। অধিকাংশ সময় গর্ত খননকারী সেই গর্তের মধ্যে পড়ে।'[৮২]

তিনি একটি শ্লোকে মন্দ কথা শুনে উপেক্ষা করার উপদেশ দিয়েছেন ঃ

'মন্দ কথা শুনে উপেক্ষা কর এবং তার সাথে এমন আচরণ কর যেন তুমি শুনতেই পাওনি।'[৮৩]

লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জীবন যাপন সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

'তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে তাদের চারণভূমি অন্যদের জন্য বৈধ করে দিয়েছে। তাই

৭৯. *তাবাকাত-২/৯০, ৯১,৯২; ড. 'উমার ফাররূখ-১/৩৩০*
৮০. *আবু তাম্মাম, হামাসা-২/৫৮-৫৯*
৮১. *হামাসাতুল বুহতরী-১১৯*
৮২. *প্রাগুক্ত-১১৩*
৮৩. *প্রাগুক্ত- ১৭২*

শত্রুরা সেখানে অপকর্ম সম্পন্ন করেছে।

তোমরা কি মৃত্যু থেকে পালাচ্ছো ? দুর্বলতার মৃত্যু তেমন সুন্দর নয়।'[৮৪]

'আবদুল কাহির আল-জুরজানী বলেছেন, হাস্‌সানের রচিত কবিতার সকল পদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় ঐক্য ও বন্ধন দেখা যায়। এমন কি সম্পূর্ণ বাক্যকে একটি শক্তিশালী রশি বলে মনে হয়।[৮৫]

একালের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক বুটরুস আর-বুসতানী বলেন ঃ 'হাস্‌সানের কবিতার বিশেষত্ব কেবল তাঁর মাদাহ্ ও হিজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাঁর রয়েছে এক বড় ধরনের বিশেষত্ব। আর তা হচ্ছে তাঁর সময়ের ঘটনাবলীর একজন বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকের বিশেষত্ব। কারণ, তিনি বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের যুদ্ধবিগ্রহ ও বিভিন্ন ঘটনাবলী। এ সকল যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে যাঁরা শহীদ হয়েছেন এবং বিরোধী পক্ষে যারা নিহত হয়েছে তাদের অনেকের নাম তিনি কবিতায় ধরে রেখেছেন। আমরা যখন তাঁর কবিতা পাঠ করি তখন মনে হয়, ইসলামের প্রথম পর্বের ইতিহাস পাঠ করছি।"[৮৬]

প্রাচীন আরবের অধিবাসীরা দেহাতী ও শহুরে-এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। মক্কা, মদীনা ও তায়েফের অধিবাসীরা ছিল শহরবাসী। অবশিষ্ট সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল দেহাতী বা গ্রাম্য। বেশীর ভাগ খ্যাতিমান কবি ছিলেন গ্রাম অঞ্চলের। এর মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু কবি শহরেও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে হাস্‌সানের স্থান সর্বোচ্চে।[৮৭]

ইবন সল্লাম আল-জুমাহী বলেন ঃ 'মদীনা, মক্কা, তায়িফ, ইয়ামামাহ, বাহরায়ন-এর প্রত্যেক গ্রামে অনেক কবি ছিলেন। তবে মদীনার গ্রাম ছিল কবিতার জন্য শীর্ষে। এখানকার শ্রেষ্ঠ কবি পাঁচজন। তিনজন খাযরাজ ও দুইজন আউস গোত্রের। খাযরাজের তিনজন হলেন ঃ হাস্‌সান ইবন ছাবিত, কা'ব ইবন মালিক ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। আউসের দুইজন হলেন ঃ কায়স ইবনুল খুতায়ম ও আবূ কায়স ইবন আসলাত। এঁদের মধ্যে হাস্‌সান শ্রেষ্ঠ।[৮৮] আবূ 'উবায়দাহ্ বলেন ঃ 'শহুরে কবিদের মধ্যে হাস্‌সান সর্বশ্রেষ্ঠ।'[৮৯] একথা আবূ 'আমর ইবনুল 'আলাও বলেছেন। কবি আল-হুতাইয়্যা বলেন ঃ 'তোমরা আনসারদের জানিয়ে দাও, তাদের কবিই আরবের

---

৮৪. প্রাগুক্ত-২৬
৮৫. দালায়িলুল- ই'জায-৭৪
৮৬. উদাবাউল-'আরব ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম-২৭৮
৮৭. আশ-শি'র- ওয়াশ শু'আরা-১৭০
৮৮. তাবাকাতুশ শু'আরা-৮৩-৯৪
৮৯. উসুদুল গাবা-২/৫

শ্রেষ্ঠ কবি।'[৯০] আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী বলেন ঃ হাস্‌সান শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ইমরাউল কায়স হচ্ছে দোযখী কবিদের পতাকাবাহী এবং হাস্‌সান ইবন ছাবিত তাদের সকলকে জান্নাতের দিকে চালিত করবে।[৯১]

ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন ঃ 'অকল্যাণ ও অপকর্মে কবিতা শক্তিশালী ও সাবলীল হয়। আর কল্যাণ ও সৎকর্মে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই যে হাস্‌সান, তিনি ছিলেন জাহিলী আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর কবিতার মান নেমে যায়। তাঁর জাহিলী কবিতাই শ্রেষ্ঠ কবিতা।[৯২]

হাস্‌সানের (রা) বার্ধক্যে একবার তাঁকে বলা হলো, আপনার কবিতা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে এবং তার উপর বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। বললেন ঃ ভাতিজা! ইসলাম হচ্ছে মিথ্যার প্রতিবন্ধক। ইবনুল আছীর বলেন, হাস্‌সানের একথার অর্থ হলো কবিতার বিষয়বস্তুতে যদি অতিরঞ্জন থাকে তাহলে কবিতা চমৎকার হয়। আর যে কোন অতিরঞ্জনই ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যাচার, যা পরিহারযোগ্য। সুতরাং কবিতা ভাল হবে কেমন করে?[৯৩]

বুট্‌রুস আল-বুসতানী হাস্‌সানের (রা) কবিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন ঃ 'আমরা দেখতে পাই হাস্‌সান তাঁর জাহিলী কবিতায় ভালো করেছেন। তবে সে কালের শ্রেষ্ঠ কবিদের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেননি। আর তাঁর ইসলামী কবিতার কিছু অংশে ভালো করেছেন। বিশেষত ঃ হিজা ও ফখর (নিন্দা ও গর্ব) বিষয়ক কবিতায়। তবে অধিকাংশ বিষয়ে দুর্বলতা দেখিয়েছেন। বিশেষত ঃ রাসূলের (সা) প্রশংসায় রচিত কবিতায় ও তাঁর প্রতি নিবেদিত শোকগাথায়। তবে ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়ে এ সকল কবিতা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ইসলামী কবিতায় এমন সব নতুন ষ্টাইল দেখা যায় যা জাহিলী কবিতায় ছিল না। ইসলামী আমলে হাস্‌সান একজন কবি ও ঐতিহাসিক এবং একই সাথে একজন সংস্কারবাদী কবিও বটে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রাজনৈতিক কবিদের পুরোধা।'[৯৪]

একবার কবি কা'ব ইবন যুহায়র একটি শ্লোকে গর্ব করে বলেন ঃ কা'বের মৃত্যুর পর কবিতার ছন্দ ও অন্ত্যমিলের কি দশা হবে? শ্লোকটি শোনার সাথে সাথে তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি সাম্মাখের ভাই তোমরূয বলে উঠলেন ঃ আপনি অবশ্যই

---

৯০. তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব-২/২১৭

৯১. উদাবাউল 'আরাব-২৮১

৯২. আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা-১৩৯; ড. 'উমার ফাররূখ-১/৩৩৬

৯৩. উসুদুল গাবা-২/৫

৯৪. উবাদাবাউল 'আরব-২৭৮

ছাবিতের ছেলে তীক্ষ্মধী হাস্‌সানের মত কবি নন।[৯৫] যাই হোক, তিনি যে একজন বড় মাপের কবি ছিলেন তা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য।

হাস্‌সানের (রা) সকল কবিতা বহুদিন যাবত মানুষের মুখে মুখে ও অন্তরে সংরক্ষিত ছিল। পরে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। তাঁর কবিতার একটি দিওয়ান আছে যা ইবন হাবীব বর্ণনা করেছেন। তবে এতে সংকলিত বহু কবিতা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ইমাম আল-আসমা'ঈ একবার বললেন ঃ হাস্‌সান একজন খুব বড় কবি। একথা শুনে আবু হাতেম বললেন ঃ কিন্তু তাঁর অনেক কবিতা খুব দুর্বল। আল-আসমা'ঈ বললেন ঃ তাঁর প্রতি আরোপিত অনেক কবিতাই তাঁর নয়।[৯৬] ইবন সাল্লাম আল 'জুমাহী বলেন ঃ হাস্‌সানের মানসম্পন্ন কবিতা অনেক। যেহেতু তিনি কুরায়শদের বিরুদ্ধে প্রচুর কবিতা লিখেছেন, এ কারণে পরবর্তীকালে বহু নিম্নমানের কবিতা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। মূলত ঃ তিনি সেসব কবিতার রচয়িতা নন।[৯৭]

হাস্‌সানের (রা) নামে যাঁরা বানোয়াট কবিতা বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন প্রখ্যাত সীরাত বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক। তিনি তাঁর মাগাযীতে হাস্‌সানের (রা) প্রতি আরোপিত বহু বানোয়াট কবিতা সংকলন করেছেন। পরবর্তীকালে ইবন হিশাম যখন ইবন ইসহাকের মাগাযীর আলোকে তাঁর 'আস-সীরাহ্‌ আন-নাবায়িয়্যাহ্‌' সংকলন করেন তখন বিষয়টি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। তখন তিনি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রাচীন আরবী কবিতার তৎকালীন পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞদের, বিশেষত ঃ বসরার বিখ্যাত রাবী ও ভাষাবিদ আবূ যায়দ আল-আনসারীর শরণাপন্ন হন। তিনি ইবন ইসহাক বর্ণিত হাস্‌সানের কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, আর তার কিছু সঠিক বলে মত দিতেন, আর কিছু তাঁর নয় বলে মত দিতেন। এই পণ্ডিতরা যে সকল কবিতা হাস্‌সানের নয় বলে মত দিয়েছেন তাঁরও কিছু কবিতা ইবন হাবীব বর্ণনা করেছেন। আর তা দিওয়ানেও সংকলিত হয়েছে।[৯৮]

প্রকৃতপক্ষে হাস্‌সানের (রা) ইসলামী কবিতায় যথেষ্ট প্রক্ষেপণ হয়েছে। এ কারণে দেখা যায় তাঁর প্রতি আরোপিত কিছু কবিতা খুবই দুর্বল। মূলত ঃ এসব কবিতা তাঁর নয়। আর এই দুর্বলতা দেখেই আল-আসমা'ঈর মত পণ্ডিতও মন্তব্য করেছেন যে, হাস্‌সানের ইসলামী কবিতা দারুণ দুর্বল।

হাস্‌সানের (রা) কবিতার একটি দিওয়ান ভারত ও তিউনিসিয়া থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে সেটি ১৯১০ সনে প্রফেসর গীব মেমোরিয়াল সিরিজ হিসেবে ইংল্যান্ড থেকে

---

৯৫. টীকা ঃ দিওয়ানু হাস্‌সান-২৮

৯৬. আল-ইসতী'আব-১/১৩০

৯৭. তাবাকাতশ শু'আরা-৮৩-৯৪

৯৮. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ-১/৭৯-৮০

প্রকাশ পায়। লন্ডন, বার্লিন, প্যারিস ও সেন্টপিটার্সবুর্গে দিওয়ানটির প্রাচীন হস্তলিখিত কপি সংরক্ষিত আছে।[৯৯]

শেষ জীবনে একবার হাস্‌সান (রা) গভীর রাতে একটি অনুপম কবিতা রচনা করেন। সাথে সাথে তিনি ফারে' দুর্গের ওপর উঠে চিৎকার দিয়ে নিজ গোত্র বানূ কায়লার লোকদের তাঁর কাছে সমবেত হওয়ার আহবান জানান। লোকেরা সমবেত হলে তিনি তাদের সামনে কবিতাটি পাঠ করে বলেন ঃ আমি এই যে কাসীদাটি রচনা করেছি, এমন কবিতা আরবের কোন কবি কখনও রচনা করেন নি। লোকেরা প্রশ্ন করলো ঃ আপনি কি একথা বলার জন্যই আমাদেরকে ডেকেছেন? তিনি বললেন ঃ আমার ভয় হলো, আমি হয়তো এ রাতেই মারা যেতে পারি। আর সে ক্ষেত্রে তোমরা আমার এ কবিতাটি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।[১০০]

আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেছেন ঃ সেকালে ছোট মঞ্চের ওপর গানের আসর বসতো। সেখানে বর্তমান সময়ের মত অশ্লীল কোন কিছু হতো না। বনী নাবীতে এরকম একটি বিনোদনের আসর বসতো। বার্ধক্যে হাস্‌সান (রা) যখন অন্ধ হয়ে যান, তখন তিনি এবং তাঁর ছেলে এ আসরে উপস্থিত হতেন। একদিন দুইজন গায়িকা তাঁর জাহিলী আমলে রচিত একটি গানে কণ্ঠ দিয়ে গাইতে থাকলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তখন তাঁর ছেলে গায়িকাদ্বয়কে বলতে থাকেন ঃ আরো গাও, আরো গাও।[১০১] তাঁর মানসপটে তখন অতীত জীবনের স্মৃতি ভেসে উঠছিল।

হাস্‌সানের (রা) মধ্যে স্বভাবগত ভীরুতা থাকলেও নৈতিক সাহস ছিল অপরিসীম। একবার খলীফা 'উমার (রা) মসজিদে নববীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। দেখলেন, হাস্‌সান মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করছেন। 'উমার বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদে কবিতা পাঠ? হাস্‌সান গর্জে উঠলেন ঃ 'উমার! আমি আপনাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে এখানে কবিতা আবৃত্তি করেছি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। 'উমার (রা) বললেন ঃ সত্য বলেছো।[১০২]

হাস্‌সান (রা) ইসলাম-পূর্ব জীবনে মদ পান করতেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর মদ চিরদিনের জন্য পরিহার করেন। একবার তিনি তাঁর গোত্রের কতিপয় তরুণকে মদপান করতে দেখে ভীষণ ক্ষেপে যান। তখন তরুণরা তাঁর একটি চরণ আবৃত্তি করে বলে, আমরা তো আপনাকেই অনুসরণ করছি। তিনি বললেন, এটা আমার ইসলাম পূর্ব

---

৯৯. জুরজী যায়দান, তারীখ-১/১৫০

১০০. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৯

১০১. প্রাগুক্ত-২/৫২০; দিওয়ান-৬৬

১০২. বুখারী-৬/২২১; মুসলিম-(২৪৮৫); আবু দাউদ-(৫০১৩); আন-নাসাঈ-২/৪৮, মুসনাদ-৫/২২২, ২২৩

জীবনের কবিতা। আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণের পর আমি মদ স্পর্শ করিনি।[১০৩]

হাস্সানের মধ্যে আমরা খোদাভীতির চরম রূপ প্রত্যক্ষ করি। কুরায়শ কবিদের সংগে যখন তাঁর প্রচণ্ড বাক্যুদ্ধ চলছে, তখন কবিদের নিন্দায় নাযিল হলো সূরা আশ-শু'আরার ২২৪ নং আয়াত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তিন কবি হাস্সান, কা'ব ও 'আবদুল্লাহ কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন ঃ 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আয়াতের আওতায় তো আমরাও পড়েছি। আমরাও তো কাব্য চর্চা করি। আমাদের কি দশা হবে?' তখন রাসূল (সা) তাঁদেরকে আয়াতটির শেষাংশ অর্থাৎ ব্যতিক্রমী অংশটুকু পাঠ করে বলেন, এ হচ্ছো তোমরা।[১০৪]

হাস্সানের (রা) সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারের কবি ছিলেন। তিনি মসজিদে নববীতে রাসূলকে (সা) স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। এ ছিল এক বড় গৌরবের বিষয়। তাঁকে যথার্থই 'শা'ইরুল ইসলাম' ও 'শা'ইরুর রাসূল' উপাধি দান করা হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর পাশে থেকে কুরায়শ, ইহুদী ও আরব পৌত্তলিকদের প্রতি বিষাক্ত তীরের ফলার ন্যায় কথামালা ছুড়ে মেরে আল্লাহর রাসূলের (সা) মর্যাদা রক্ষা ও সমুন্নত করেছেন।

রাসূলে কারীম (সা) যখন যুদ্ধে যেতেন তখন তাঁর সহধর্মীগণকে হাস্সান (রা) তাঁর সুরক্ষিত ফারে' দুর্গের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসূল (সা) তাঁকে গণীমতের অংশ দিতেন। এমন কি উম্মুল মু'মিনীন মারিয়্যা আল-কিবতিয়্যার বোন সীরীনকেও (রা) তুলে দেন হাস্সানের হাতে। খুলাফায়ে রাশেদীনের দরবারেও ছিল তাঁর বিশেষ মর্যাদা। খলীফাগণ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলতেন এবং তাঁর জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেন। এভাবে একটি একটি করে হাস্সানের (রা) সম্মান ও মর্যাদার বিষয়গুলি গণনা করলে দীর্ঘ তালিকা তৈরী হবে।

---

১০৩. আল-ইসতী'আব-১/১২৯

১০৪. হায়াতুস সাহাবা-৩/৭৭, ১৭২; তাফসীরে ইবন কাছীর-৩/৩৫৪

কা'ব ইবন মালিক (রা)

কা'ব (রা) ইতিহাসের সেই তিন ব্যক্তির একজন যাঁরা আলস্যবশতঃ তাবুক যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত থাকেন এবং আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা) ও মু'মিনদের বিরাগভাজনে পরিণত হন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁদের তাওবা কবুলের সুসংবাদ দিয়ে আয়াত নাযিল করেন।[১] হিজরাতের ২৫ বছর পূর্বে ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইয়াছরিবে জন্ম গ্রহণ করেন।[২] তাঁর অনেকগুলি কুনিয়াত বা ডাকনাম ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ আবূ 'আবদিল্লাহ, আবূ 'আবদির রহমান, আবূ মুহাম্মদ ও আবূ বাশীর।[৩] ইবনে হাজারের একটি বর্ণনায় জানা যায়, জন্মের পর তাঁর পিতা মালিক ইবন আবী কা'ব 'আমর ছেলের ডাক নাম রাখেন আবূ বাশরী। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলে কারীম (সা) রাখেন আবূ 'আবদিল্লাহ। তিনি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান।[৪] মাতার নাম ঃ লায়লা বিনতু যায়দ। পিতামাতা উভয়ে মদীনার খাযরাজ গোত্রের বানূ সালিমা শাখার সন্তান।[৫] তিনি একজন 'আকাবী ও উহুদী সাহাবী। ইবন আবী হাতেম বলেনঃ তিনি ছিলেন আহলুস সুফ্ফা'রও অন্যতম সদস্য।[৬] পঁচিশ বছর বয়সে গোত্রীয় লোকদের সাথে বায়'য়াতে 'আকাবায় শরীক হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭]

ইবনুল আছীর বলেনঃ প্রায় সকল সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে, কা'ব 'আকাবার শেষ বায়'য়াতে শরীক ছিলেন।[৮] 'উরওয়া সেই সত্তর জনের মধ্যে তাঁর নামটি উল্লেখ করেছেন যাঁরা 'আকাবায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।[৯] বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, কা'ব বলেছেনঃ আমি বায়'য়াতে 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। আমরা ইসলামের ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম। তবে অপর একটি বর্ণনায় এসেছে। তিনি বলেন, আমি লায়লাতুল 'আকাবার বায়'য়াত থেকে বঞ্চিত হই।[১০]

কা'ব ইবন মালিক যে 'আকাবার শেষ বায়'য়াতে শরীক ছিলেন তা ইবন ইসহাকের বর্ণনায় স্পষ্টভাবে জানা যায়। এ বায়'য়াতের বিস্তারিত বিবরণ কা'ব দিয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে। সীরাত ইবন হিশামে কা'বের জবানীতে তা হুবহু

---

১. *শাযারাতুয যাহব-১/৫৬*
২. *ডঃ 'উমার ফাররূখ, তারীখ-আল-আদাব আল 'আরবী- ১/৩২৩*
৩. *তাহযীবুত তাহযীব- ৮/৩৯৪; আয-যাহাবী,তারীখ- ২/২৪৩*
৪. *আল-ইসাবা- ৩/৩০২*
৫. *উসুদুল গাবা- ৪/২৪৭*
৬. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৩, ৫২৪*
৭. *'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব- ১/৩২৩*
৮. *উসুদুল গাবা-৪/২৪৭*
৯. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২২, ২২৩; আল-ইসাবা-৩/৩০২*
১০. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৭*

এসেছে। সংক্ষেপে তার কিছু এখানে তুলে ধরছি। ইবন ইসহাক কা'ব-এর ছেলে 'আবদুল্লাহ ও মা'বাদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কা'ব মদীনা থেকে স্বগোত্রীয় পৌত্তলিক হাজীদের একটি কাফেলার সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। এ কাফেলার সাথে পূর্বেই ইসলাম গ্রহণকারী কিছু মুসলমানও ছিলেন। তারা দীন বুঝেছিলেন এবং নামাযও পড়তেন। এ কাফেলায় তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা আল-বারা' ইবন মা'রূরও ছিলেন। চলার পথে তিনি একদিন বললেন, আমি আর এই কা'বার দিকে পিঠ দিয়ে নামায পড়তে চাইনে। এখন থেকে কা'বার দিকে মুখ করেই নামায পড়বো। কা'ব ও অন্যরা তাঁর এ কথায় আপত্তি জানিয়ে বললেন, আমাদের নবী (সা) তো শামের বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করে থাকেন। তাঁর বিরোধিতা হয়, আমরা এমনভাবে নামায পড়তে চাইনা। এরপরও আল-বারা' তাঁর মতে অটল থাকলেন।

পথে নামাযের সময় হলে আল-বারা' কা'বার দিকে, কা'ব ও অন্যরা শামের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে করতে মক্কায় পৌঁছলেন। তাঁরা আল-বারা'কে তাঁর এ কাজের জন্য তিরস্কার করলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলোনা, তিনি স্বীয় মতে অনড় থাকলেন।

মক্কায় পৌঁছে আল-বারা' কা'ব কে বললেনঃ তুমি আমাকে একটু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়ে চলো। আসার পথে আমি যে কাজ করেছি সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমাদের বিরোধিতা করে আমার মনটা ভালো যাচ্ছে না। কা'ব তাঁকে সংগে করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে চললেন। দুইজনের কেউই এর আগে রাসূলুল্লাহকে (সা) চিনতেন না এবং দেখেন নি। পথে মক্কার দুই ব্যক্তির সাথে তাঁদের দেখা হলো। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তারা বললোঃ আপনারা কি তাঁকে চেনেন ? কা'ব ও আল বারা' বললেন ঃ না। তারা আবার প্রশ্ন করলো ঃ তাঁর চাচা 'আব্বাসকে চেনেন ? তাঁরা জবাব দিলেন ঃ হাঁ, 'আব্বাসকে চিনি। ব্যবসা উপলক্ষে তিনি আমাদের ওখানে যাতায়াত করেন। তখন তারা বললো ঃ আপনারা মসজিদে ঢুকে দেখবেন 'আব্বাসের সাথে একটি লোক বসে আছেন। তিনি সেই ব্যক্তি।

কা'ব ও আল-বারা' লোক দুইটির কথামত মসজিদে হারামে ঢুকে 'আব্বাসকে এবং তাঁর পাশে রাসূলুল্লাহকে (সা) বসা দেখতে পেলেন। সালাম দিয়ে তাঁদের পাশে বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) 'আব্বাসকে বললেনঃ আবুল ফাদল! আপনি কি এ দুই ব্যক্তিকে চেনেন ? 'আব্বাস বললেনঃ হাঁ, ইনি আল-বারা' ইবন মা'রূর। তাঁর সম্প্রদায়ের নেতা। আর ইনি কা'ব ইবন মালিক। কা'ব বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই প্রশ্নবোধক শব্দটি আজও ভুলিনি-'কবি ?' অর্থাৎ রাসূল (সা) 'আব্বাসকে প্রশ্ন করেনঃ একি সেই কবি কা'ব ইবন মালিক ? 'আব্বাস জবাব দেনঃ হাঁ,

ইনি সেই কবি কা'ব। এরপর কা'ব বর্ণনা করেছেন, কিভাবে কেমন করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো এবং কোন কথার ওপর তাঁরা বায়'য়াত করলেন। [১১] রাসূল (সা) যে বারোজন নাকীব মনোনীত করেন, কা'ব একটি কবিতায় তাঁদের পরিচয়ও ধরে রেখেছেন। ইবন হিশাম সে কবিতাটিও বর্ণনা করেছেন।[১২]

রাসূলে করীম (সা) মদীনায় এসে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে দীনী মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। 'আশারা মুবাশ্শারার সদস্য তালহা ইবন 'উবায়দুল্লাহ (রা)-এর সাথে কা'বের এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। একথা ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন।[১৩] তবে 'উরওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) যুবায়র ও কা'বের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[১৪] উহুদের দিন কা'ব আহত হলে যুবায়র তাঁকে মুমূর্ষ অবস্থায় কাঁধে বহন করে নিয়ে আসেন। সেদিন কা'ব মারা গেলে যুবায়র হতেন তাঁর উত্তরাধিকারী। পরবর্তীকালে সূরা আল আনফালের ৭৫ নং আয়াত-'বস্তুতঃ যারা উলুল আরহাম' বা রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তাঁরা পরস্পর বেশী হকদার'- নাযিল করে এ বিধান রহিত করা হয়।[১৫]

একমাত্র বদর ও তাবুক ছাড়া অন্য সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি রাসূলে কারীম (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। ইবনুল কালবীর মতে, তিনি বদরে যোগদান করেন।[১৬] তবে অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞের নিকট এ মতটি স্বীকৃত হয়নি। আসল ঘটনা হলো, যে তাড়াহুড়ো ও দ্রুততার সাথে বদর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় তাতে অনেকের মত কা'বও অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকেন। এ কারণে রাসূল (সা) কাউকে কিছুই বলেননি।

কা'ব বলেন ঃ তাবুক পর্যন্ত একমাত্র বদর ছাড়া সকল যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেছি। বদরে যাঁরা যাননি, রাসূল (সা) তাঁদেরকে কোন প্রকার তিরস্কার করেননি। মূলত রাসূল (সা) মদীনা থেকে বের হন আবূ সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফিলার উদ্দেশ্যে। আর এদিকে কুরায়শরা মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ে আবূ সুফইয়ানের কাফেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মক্কায় পৌছার সুযোগ করে দিতে। বদরে উভয় পক্ষ মুখোমুখী হয় কোন রকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই। কা'ব আরও বলেন,

---

১১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩৯-৪৪৩

১২. প্রাগুক্ত-১/৪৪৫

১৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৪, ৫২৭; শাযারাতুয যাহাব-১/৫৬; উসুদুল গাবা-৪/২৪৭

১৪. তাবাকাত-৩/১০২; আয-যাহাবী, তারীখ-২/২৪৩; আনসাবুল আশরাফ-১/২৭১

১৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৪, ৫২৬

১৬. সুয়ূতী, আসবাব আন- নুযূল-৩৭৭; তাহযীবুত-তাহযীব-৮/৩৯৫; উসুদুল গাবা-৪/২৪৭

বদর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বলে মানুষের নিকট বিবেচিত। তবে 'লাইলাতুল 'আকাবা'-যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে ইসলামের ওপর বায়'য়াত (অঙ্গীকার) করেছিলাম, তার পরিবর্তে বদর আমার নিকট মোটেই প্রাধান্যযোগ্য নয়। এরপর একমাত্র তাবুক ছাড়া আর কোন যুদ্ধ থেকে পিছনে থাকিনি।[১৭]

তবে কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় কা'ব বদরে অংশ গ্রহণ করেছেন। ইবন ইসহাক কা'বের নামটি বদরে অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন।[১৮] তাছাড়া একটি বর্ণনায় এসেছে, কা'ব বলেছেনঃ আমি মুসলমানদের সাথে বদরে যাই। যুদ্ধ শেষে দেখলাম পৌত্তলিক যোদ্ধাদের বিকৃত লাশ মুসলিম শহীদদের সাথে পড়ে আছে। আমি ক্ষণিক দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন পৌত্তলিক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মুসলিম শহীদদের অতিক্রম করছে। একজন অস্ত্রসজ্জিত যোদ্ধাও যেন তার অপেক্ষা করছিল। আমি একটু এগিয়ে এ দুইজনের ভাগ্য দেখার জন্য তাদের পিছনে দাঁড়ালাম। পৌত্তলিকটি ছিল বিরাট বপুধারী। আমি তাকিয়ে থাকতেই মুসলিম সৈনিকটি তার কাঁধে তরবারির এমন এক শক্ত কোপ বসিয়ে দেয় যে, তা তার নিতম্ব পর্যন্ত পৌঁছে তাকে দুই ভাগ করে ফেলে। তারপর লোকটি মুখের বর্ম খুলে ফেলে বলেঃ কা'ব কেমন দেখলে? আমি আবূ দুজানা।[১৯] তবে অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ তাঁর বদরে অনুপস্থিত থাকার বর্ণনাগুলি সঠিক বলে মনে করেছেন।

উহুদ যুদ্ধে কা'ব ও তাঁর দীনী ভাই তালহা (রা) সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই যুদ্ধে তিনি পরেন রাসূলুল্লাহর (সা) বর্ম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) পরেন তাঁর বর্ম। রাসূল (সা) নিজ হাতে তাঁকে বর্ম পরিয়ে দেন। এই উহুদে তাঁর দেহে মোট এগারো স্থানে যখম হয়।[২০] তবে বহু মুহাদ্দিছ তাঁর দেহে সতেরোটি আঘাতের কথা বর্ণনা করেছেন।[২১]

এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসূলে করীম (সা) শাহাদাত বরণ করেছেন। এতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একটা দারুণ হৈ চৈ পড়ে যায়। এ অবস্থায় কা'বই সর্বপ্রথম রাসূলকে (সা) দেখতে পান এবং গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে

---

১৭. উসুদুল গাবা-৪/২৪৭, ২৪৮; আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৮, ২৮৯; সহীহ বুখারী-২/৬৩৪;

১৮. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৬২

১৯. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৫৮

২০. উসুদুল গাবা-৪/২৪৭

২১. যাহাবী, তারীখ-২/২৪৩; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৪; আল মুসতাদরিক-৩/৪৪১

ওঠেন –রাসূল (সা) এই যে, এখানে। তোমরা এদিকে এসো। কা'ব তখন উপত্যকার মধ্যস্থলে। রাসূল (সা) তখন তাঁর হলুদ বর্ণের বর্ম দ্বারা তাঁকে ইঙ্গিত করে চুপ থাকতে বলেন।[২২]

উহুদের পরে যত যুদ্ধ হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে কা'ব (রা) দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে যোগদান করেছেন। তবে ভাবতে অবাক লাগে যে, নবী (সা)-এর জীবনের প্রথম যুদ্ধ বদরের মত শেষ যুদ্ধ তাবুকেও তিনি যোগদান করতে ব্যর্থ হন। তাবুক ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ অভিযান। নানা কারণে একে কষ্টের যুদ্ধও বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রীতি ছিল, যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে স্পষ্টভাবে কিছু বলতেন না। কিন্তু এবার রীতি বিরুদ্ধ কাজ করলেন। এবার তিনি ঘোষণা করে দিলেন। যাতে দীর্ঘ ও কষ্টকর সফরের জন্য মুসলমানরা যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে। কা'ব এই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য দুইটি উট প্রস্তুত করেন। তাঁর নিজের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি পূর্বের কোন যুদ্ধেই এতখানি সচ্ছল ও সক্ষম ছিলেন না, যতখানি এবার ছিলেন।

এ যুদ্ধের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এতখানি গুরুত্বদান ও সতর্কতা অবলম্বনের কারণ এই ছিল যে, মূলত সংঘর্ষটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সুপার পাওয়ার প্রবল পরাক্রমশালী রোমান বাহিনীর সাথে। সাজ-সরঞ্জাম, সংখ্যা, ঐক্য ও অটুট মনোবলের দিক দিয়ে তাদের বাহিনী ছিল বিশ্বের সেরা ও শক্তিশালী বাহিনী।

নবম হিজরীর রজব মাস শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড গরমের মওসুম। রাসূল (সা) তাবুক অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন এবং সকলকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশও দিলেন।[২৩] সংগত ও অসংগত নানা অজুহাতে মোট তিরাশিজন সক্ষম মুসলমান এ যুদ্ধে গমন থেকে বিরত থাকেন। তাদের কিছু ছিল মুনাফিক (কপট মুসলমান)। কারও বাগানের ফল পাকতে শুরু করেছিল, তা ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছা হয়নি। কেউ ভয় পেয়েছিল প্রচণ্ড গরম ও দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার। আবার কেউ ছিল অতি দরিদ্র, যার কোন বাহন ছিল না।[২৪]

ইবন ইসহাক বলেনঃ যাঁরা সন্দেহ সংশয় বশত: নয়; বরং আলস্যবশতঃ যোগদানে ব্যর্থ হন তারা মোট চার জন। কা'ব ইবন মালিক, মুরারা ইবন রাবী', হিলাল ইবন উমাইয়্যা ও আবূ খায়ছামা। তবে আবূ খায়ছামা একেবারে শেষ মুহূর্তে তাবুকে পৌঁছেন ও রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন।[২৫] কারও কারও মতে প্রচণ্ড গরমের কারণে তাঁরা তাবুক গমনে বিরত থাকেন।[২৬] রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে

---

২২. *তাবাকাত: মাগাযী-৩২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২২*
২৩. *ইবন কাছীর, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ-২/২৬৬*
২৪. *'উমার ফাররূখ, তারীখ, ১/৩২৩*
২৫. *আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ-২/২৭০*
২৬. *উসুদুল গাবা-৪/২৪৭*

বেরিয়ে পড়লেন। কা'ব (রা) প্রতিদিনই যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে তার সময় বয়ে যায়। তিনি প্রতিদিনই মনে মনে বলতেন আমি যেতে পারবো। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত পাল্টে যেত। যাত্রার উদ্যোগ নিয়ে আবার থেমে যেতেন। এ অবস্থায় একদিন মদীনায় খবর এলো, রাসূল (সা) তাবুক পৌঁছে গেছেন।

মদিনা ও তার আশ-পাশের সকল সক্ষম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাবুক চলে যান। কা'ব (রা) যখন মদীনা শহরে বের হতেন তখন শুধু শিশু, বৃদ্ধ ও কিছু মুনাফিক ছাড়া আর কোন মানুষের দেখা পেতেন না। লজ্জা ও অনুশোচনায় জর্জরিত হতেন। সুস্থ, সবল ও সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কেন পিছনে থেকে গেলেন, সারাক্ষণ এই অনুশোচনার অনলে দগ্ধিভূত হতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেনা বাহিনীর কোন দপ্তর ছিলনা। সুতরাং এত মানুষের মধ্যে কা'বের মত একজন লোক এলো কি এলো না, তা তাঁর জানা থাকার কথা নয়। একমাত্র আল্লাহ পাকের ওহীই ছিল তাঁর জানার মাধ্যম। তাবুক পৌঁছে একদিন তিনি কা'ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কোন এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার এত সময় কোথায় যে সে এখানে আসবে ? মু'আজ ইবন জাবাল কাছেই ছিলেন। তিনি প্রতিবাদের সুরে বললেন, আমরা তো তাঁর মধ্যে খারাপ কোন কিছু দেখিনি। একথা শুনে রাসূল (সা) চুপ থাকলেন।

রোমানদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন মারাত্মক সংঘর্ষ হলো না। উত্তর আরবের অনেক গোত্র জিযিয়ার বিনিময়ে সন্ধি করলো। রাসূল (সা) মদীনায় ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফিরে আসার খবর কা'ব পেলেন। তাঁর অন্তরে তখন নানা রকম চিন্তার ঢেউ খেলছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার উপায় কি, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন পরিবারের লোকদের কাছে। কখনও এমন চিন্তাও তাঁর মনে উদয় হলো যে, সত্য অসত্য মিলিয়ে কিছু কারণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে তুলে ধরবেন। কিন্তু পরক্ষণেই এ চিন্তা যেন কোথায় হাওয়া হয়ে যেত। এ রকম দ্বিধা দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, কপালে যা আছে তাই হোক, কোনরকম ছল-চাতুরীর আশ্রয় তিনি নেবেন না। যা সত্য তাই বলবেন।

এর মধ্যে দলে দলে আশি জনের মত লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য রাখলো। রাসূল (সা) তাদের সকলের ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য মনে করলেন। সকলের অপরাধ ক্ষমার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন এবং পুনরায় তাদের বায়'য়াত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।

কা'ব (রা) আসলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট। তাঁকে দেখে রাসূল (সা) মৃদু হেসে বললেনঃ এসো। কা'ব সামনে এসে বসার পর প্রশ্ন করলেনঃ যুদ্ধে যাওনি কেন? কা'ব বললেন ঃ আপনার কাছে কী আর গোপন করবো? দুনিয়ার কোন রাজা-বাদশাহ হলে নানারকম কথার জাল তৈরী করে তাকে খুশী করতাম। সে শক্তি আমার আছে। আমি তো একজন বাগ্মী ও তর্কবাগিশ। আমি আপনার নিকট সত্য গোপন করবো না। এতে হতে পারে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু মিথ্যা বললে এ মুহূর্তে আপনি খুশী হয়ে যাবেন। তবে আল্লাহ্ আপনাকে আমার ব্যাপারে নাখোশ করে দেবেন। আর তা আমার জন্য মোটেই সুখকর নয়। মূলত আমার না যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। আমি ছিলাম সুস্থ– সবল এবং অর্থে-বিত্তে ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামে সমর্থ। তবুও আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি যেতে পারিনি। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) বললেনঃ সত্য বলেছো। তুমি এখন যাও। দেখা যাক আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত দান করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবার থেকে উঠে আসার পর বানূ সালিমার কিছু লোক তাঁকে বললো, আপনি এর আগে আর কোন অপরাধ করেন নি। এটাই আপনার প্রথমবারের মত একটি অপরাধ। অথচ এর জন্য ভালোমত কোন ওজর ও আপত্তি উপস্থাপন করতে পারলেন না। অন্যদের মত আপনিও কিছু ওজর পেশ করতেন, রাসূল (সা) আপনার গোনাহ্ মাফের জন্য দু'আ করতেন, আর আল্লাহ মাফ করে দিতেন। কিন্তু তা আপনি পারলেন না। তাদের কথা শুনে কা'বের ইচ্ছা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরে গিয়ে পূর্বের বর্ণনা প্রত্যাহার করেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি প্রশ্ন করলেনঃ আমার মত আর কেউ কি আছে? তিনি জানতে পেলেন, আরও দুইজন আছেন। তাঁরা হলেনঃ মুরারা ইবন রাবী' ও হিলাল ইবন উমাইয়্যা। তাঁরা দু'জনই অতি নেক্কার বান্দা ও বদরী সাহাবী। তাঁদের নাম শুনে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হলেন এবং নতুন করে ওজর পেশ করার ইচ্ছা দমন করলেন।

রাসূলে করীম (সা) পূর্বে উল্লেখিত তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকে। মানুষ তাঁদের প্রতি আড় চোখে তাকিয়ে দেখতো। কোন কথা বলতো না। মুরারা ও হিলাল নিজেদেরকে আপন আপন গৃহে আবদ্ধ করে রাখেন। দিন রাত তাঁরা শুধু কাঁদতেন। কা'ব ছিলেন যুবক। ঘরে বসে থাকা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল? পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই তিনি মসজিদে আসা যাওয়া করতেন, হাটে-বাজারেও ঘোরাঘুরি করতেন। কিন্তু কোন মুসলমান ভুলেও তাঁর সাথে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না।

কা'ব মসজিদে যেতেন এবং নামাযের পর রাসূলকে (সা) সালাম করতেন। রাসূল (সা) জায়নামাযে বসে থাকতেন। রাসূল (সা) সালামের জবাব দিচ্ছেন কিনা বা তাঁর ঠোঁট নড়ছে কিনা, কা'ব তা গভীরভাবে লক্ষ্য করতেন। তারপর আবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

নিকটেই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। চোখ আড় করে একটু একটু করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে তাকাতেন এবং রাসূলও (সা) তাকে আড় চোখে দেখতেন। যখন কা'ব নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে ফিরতেন তখন তিনি কা'বের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

কা'বের (রা) সাথে তাঁর পরিবারের সদস্যদের আচরণও ছিল অভিন্ন। আবূ কাতাদাহ (রা) ছিলেন চাচাতো ভাই। একদিন কা'ব তাঁর বাড়ীর প্রাচীরের ওপর উঠে তাঁকে সালাম করলেন। কিন্তু কাতাদাহ্ জবাব দিলেন না। কা'ব তিনবার কসম খেয়ে বললেন, তুমি তো জান আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কত ভালবাসি। শেষবার কাতাদাহ্ শুধু মন্তব্য করলেন-বিষয়টি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

কাতাদাহ (রা)-এর এমন জবাবে কা'ব (রা) দারুণ হতাশ হলেন। আপন মনে বললেন, এখন তো আমার ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষী দেয়ারও কেউ নেই। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি বাজারের দিকে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে বাজারে তখন শামের এক নাবাতী ব্যক্তি তাঁকে খুঁজছিলেন। কা'বকে দেখে লোকেরা ইঙ্গিত করে বললো, ঐ যে তিনি আসছেন। লোকটি কা'বের নামে লেখা গাস্সানীয় রাজার একটি চিঠি নিয়ে এসেছিলো। তাঁর নিকট থেকে চিঠিটি নিয়ে কা'ব পড়লেন। তাঁতে লেখা ছিল-'তোমার বন্ধু রাসূল (সা) তোমার প্রতি খুব অবিচার করেছেন। তুমি তো কোন সাধারণ ঘরের সন্তান নও। তুমি আমার কাছে চলে এসো।' চিঠিটি পড়ে তিনি মন্তব্য করলেন, এটাও এক পরীক্ষা। চিঠিটি তিনি জ্বলন্ত চুলায় ফেলে দিলেন।

এভাবে চল্লিশ দিন কেটে গেল। চল্লিশ দিন পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট গিয়ে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ হলো, তোমার স্ত্রী থেকে তুমি দূরে থাকবে। কা'ব জানতে চাইলেন, আমি কি তাঁকে তালাক দেব ? তিনি বললেনঃ না। শুধু পৃথক থাকবে।

কা'ব (রা) স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার কাছে চলে যাও। আমার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত সেখানেই থাক। অন্য দুইজন হিলাল ও মুরারাকেও (রা) একই নির্দেশ দেওয়া হয়। হিলাল ছিলেন বৃদ্ধ। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বামী সেবার বিশেষ অনুমতি নিয়ে আসেন। কা'বের পরিবারের লোকেরা তাঁর স্ত্রীকেও বললেন, তুমিও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যেয়ে স্বামী সেবার অনুমতি নিয়ে এসো। কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। বললেনঃ আমি যাব না। না জানি, রাসূলুল্লাহ (সা) কি বলবেন।'

পঞ্চাশ দিনের মাথায় ফজরের নামায আদায় করে কা'ব (রা) ঘরের ছাদে বসে আছেন। ভাবছেন, এখন তো আমার জীবনটাই বোঝা হয়ে উঠেছে। আসমান-যমীন আমার জন্য

সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এ ধরনের আকাশ-পাতাল চিন্তা করছেন, এমন সময় সালা' পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে কারও কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'কা'ব শোন! তোমার জন্য সুসংবাদ'! তিনি বুঝলেন, তাঁর দু'আ ও তাওবা কবুল হয়েছে। সাথে সাথে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন। নিজের ভুলের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন। কিছুক্ষণ পর দুই ব্যক্তি যাদের একজন ছিল ঘোড় সাওয়ার, এসে তাঁকে সুসংবাদ দান করেন। কা'ব নিজের গায়ের কাপড় খুলে তাদেরকে দান করেন। অতিরিক্ত কাপড় ছিল না তাই সেই দান করা কাপড় আবার চেয়ে নিয়ে পরেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ছুটে যান।

ইতিমধ্যে খবরটি মদীনায় ছড়িয়ে পড়েছে। দলে দলে মানুষ তাঁর বাড়ীর দিকে আসতে শুরু করেছে। পথে যার সাথেই দেখা হচ্ছে, তাঁকে মুবারকবাদ দিচ্ছে। তিনি মসজিদে নববীতে পৌঁছে রাসূলকে (সা) সাহাবীদের মাঝে বসা অবস্থায় পেলেন। মসজিদে ঢুকতেই তালহা (রা) দৌড়ে এসে হাত মিলালেন। তবে অন্যরা নিজ নিজ স্থানে বসে থাকলেন। কা'ব (রা) এগিয়ে গিয়ে রাসূলে কারীমকে (সা) সালাম করলেন। তাবারানী বর্ণনা করেছেনঃ তাওবা কবুল হওয়ার পর কা'ব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে তাঁর দুইখানি পবিত্র হাত ধরে চুমু দিয়েছিলেন।[২৭] তখন রাসূলে করীমের চেহারা মুবারক চাঁদের মত দীপ্তিমান দেখাচ্ছিল। তিনি কা'বের (রা) উদ্দেশ্যে বললেনঃ 'তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি। তোমার জন্মের পর থেকে আজকের দিনটির মত এত ভাল দিন তোমার জীবনে আর আসেনি।'

আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেছেন? রাসূল (সা) বললেনঃ 'আমি কেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করেছেন।' এ কথা বলে তিনি তাদের সম্পর্কে সদ্য নাযিল হওয়া সূরা তাওবার ১১৭ নং আয়াতটি পাঠ করে শোনান। 'আল্লাহ্ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সংগে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁদের প্রতি দয়াশীল ও করণাময়।' তিলাওয়াত শেষ হলে আনন্দের আতিশয্যে কা'ব বলে উঠলেন, 'আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ সাদাকা করে দিচ্ছি।' রাসূল (সা) বললেনঃ 'সব নয়, কিছু দান কর।' কা'ব তাঁর খায়বারের সম্পত্তি দান করেন। এরপর তিনি মন্তব্য করেনঃ 'আল্লাহ্ আমার সততার জন্যই মুক্তি দিয়েছেন। আমি অঙ্গীকার করছি, বাকী জীবনে আমি শুধু সত্যই বলবো।'

সত্য বলার জন্য কা'ব ও তাঁর অপর দুই সঙ্গীকে যে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, ইসলামের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর। এত বড় বিপদেও তাঁদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে তাঁদের সেই করুণ অবস্থা অতি

---

২৭. *হায়াতুস সাহাবা-২/৪৯৭*

চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছেঃ

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتبوأ إن الله هو التواب الرحيم - يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين .

'এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পিছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতিত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই–অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।'

এ আয়াতে যাদেরকে পিছনে রাখা হয়েছিল– বলা হয়েছে। এর অর্থ যুদ্ধ থেকে পিছনে থেকে যাওয়া নয়। বরং এর অর্থ যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন।

কা'ব বলেনঃ আমাদের তাওবাহ কবুল সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয় রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে। উম্মু সালামা তখন বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! আমরা কি কা'বকে সুসংবাদটি জানিয়ে দেব? রাসূল (সা) বললেনঃ 'তাহলে তো মানুষের ঢল নামবে এবং তোমরা আর ঘুমাতে পারবে না।[২৮]

কা'বের (রা) মৃত্যু সন নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি 'আলী (রা)-এর শাহাদাতের সময়কালে মারা যান। ইবন আবী হাতেম বলেন, মুআবিয়ার (রা) খিলাফতকালে তিনি অন্ধ হয়ে যান। ইমাম বুখারী তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে শুধু এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, তিনি 'উছমানের মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করেছেন এবং মু'আবিয়া ও 'আলী (রা)-এর দ্বন্দ্বে তাঁর ভূমিকার বিষয়ে আমরা কোন তথ্য পাইনি। ইমাম বাগাবী বলেন, আমি জেনেছি, তিনি মু'আবিয়ার (রা) খিলাফত কালে শামে মারা যান। আবুল ফারাজ আল–ইসপাহানী 'কিতাবুল আগানী' গ্রন্থে একটি দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন

---

২৮. হযরত কা'ব ও তাঁর সঙ্গীদের এ ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-- ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৭-৫৩০; সীরাতু ইবন হিশাম- ২য় খন্ড, পৃ. ৫৩১; মুসানাদে ইমাম আহমাদ-৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৮৭, ৩৯০; হায়াতুস সাহাবা-১ম খন্ড, পৃ.: ৪৬৪-৪৬৮; উসুদুল গাবা-৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৪৮; ইবন কাছীরের আস-সীরাহ- ২য় খন্ড, পৃ. ২৬৬-২৭০। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এবং ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে এই তিনজনের ঘটনাটি একটি পৃথক শিরোনামে বর্ণনা করেছেন।

যে, হাস্‌সান ইবন ছাবিত, কা'ব ইবন মালিক ও আন-নু'মান ইবন বাশীর (রা) একবার 'আলীর (রা) কাছে যান এবং 'উছমানের (রা) হত্যার বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হন। তখন কা'ব (রা) উছমানের (রা) শানে তাঁর রচিত একটি শোকগাথা আবৃত্তি করে 'আলীকে শোনান। তারপর তাঁরা সেখান থেকে উঠে সোজা মু'আবিয়ার কাছে চলে যান। মু'আবিয়া (রা) তাঁদেরকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করেন।[২৯]

আল-হায়ছাম ও আল-মাদায়িনীর মতে কা'ব হিজরী ৪০ সনে মারা যান। তবে তাঁর থেকে হিজরী ৫১ সনের কথাও বর্ণিত হয়েছে। আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, হিজরী ৫০ সনে তাঁর মৃত্যুর কথা বর্ণিত আছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সঠিক মত এই যে, হিজরী ৫০ থেকে ৫৫ (৬৭০-৬৭৩ খ্রী.)-এর মধ্যে প্রায় ৭৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান।[৩০]

সীরাত গ্রন্থসমূহে তাঁর পাঁচ ছেলের নাম পাওয়া যায়। তারা হলেন, 'আবদুল্লাহ, 'উবায়দুল্লাহ, 'আবদুর রহমান, মা'বাদ ও মুহাম্মাদ। শেষ জীবনে কা'ব (রা) অন্ধ হয়ে যান।[৩১] ছেলেরা তাঁকে হাত ধরে নিয়ে বেড়াতেন।[৩২] ইবন ইসহাক তাঁর ছেলে 'আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ শেষ জীবনে আমার পিতা অন্ধ হয়ে গেলে আমি তাঁকে নিয়ে বেড়াতাম। আমি যখন তাঁকে জুম'আর নামাযের জন্য নিয়ে বের হতাম তখন আযান শোনার সাথে সাথে তিনি আবূ উমামা আস'য়াদ ইবন যুরারার জন্যে মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করতেন। জুম'আর আযান শুনলেই তাঁকে আমি সব সময় এ কাজটি করতে দেখতাম। বিষয়টি আমার কাছে রহস্যজনক মনে হলো। আমি একদিন জুম'আর দিনে তাঁকে নিয়ে বের হয়েছি, পথে আযানের ধ্বনি শোনার সাথে সাথে তিনি আবূ উমামার জন্য দু'আ করতে শুরু করেন। আমি বললামঃ আব্বা, জুম'আর আযান শুনলেই আপনি এভাবে আবু উমামার জন্য দু'আ করেন কেন? বললেন, বাবা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় আসার আগে সেই আমাদেরকে সমবেত করে সর্বপ্রথম জুম'আর জামা'য়াত কায়েম করে। সেটি অনুষ্ঠিত হতো হাররার বানূ বায়দার 'হাযমুন নাবীত' পাহাড়ের 'নাকী' আল-খাদিমাত' নামক স্থানে। আমি প্রশ্ন

---

২৯. আল ইসাবা-৩/৩০২; তাহযীবুত তাহযীব-৮/৩৯৯

৩০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: শাযারাতুয যাহাব-১/৫৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৬; আয-যাহাবী: তারীখ-২/২৪৩; ডঃ 'উমার ফাররূখ: তারীখুল আদাব-১/৩২৪; আনসাবুল আশরাফ-১/২২৮

৩১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা--২/৫২৪; শাযারুতুয যাহাব-১/৫৬; তাহযীবুত তাহযীব-৮/৩৯৫

৩২. বুখারী-২/৬৩২

করলামঃ তখন আপনারা কতজন ছিলেন? বললেনঃ চল্লিশজন।[৩৩]

হাদীছের গ্রন্থসমূহে কা'বের (রা) বর্ণিত মোট আশিটি হাদীছ পাওয়া যায়।[৩৪] তবে ইমাম যাহাবী বলেনঃ তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ত্রিশে পৌছবে। তার মধ্যে তিনটি মুত্তাফাক আলায়হি। একটি বুখারী ও দুইটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩৫] তিনি খোদ রাসূল (সা) ও উসাইদ ইবন হুদাইর (রা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৩৬]

কা'ব (রা) থেকে যে সকল মনীষী হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কতিপয় ব্যক্তি হলেনঃ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ ও আবূ উমামা আল-বাহিলী। উল্লেখিত তিনজনই হলেন সাহাবী। আর তাবে'ঈদের মধ্যে ইমাম বাকের, 'আমর ইবন হাকাম ইবন ছাওবান, 'আলী ইবন আবী তালহা, 'উমার ইবন কাছীর ইবন আফলাহ, 'উমার ইবন আল-হাকাম ইবন রাফে', কা'বের পাঁচ পুত্র ও পৌত্র 'আবদুর রহমান ইবন 'আবদিল্লাহ প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩৭]

বালাযুরীর বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলে করীম (সা) আসলাম, গিফার ও জুহায়না গোত্রের যাকাত-সাদাকা আদায়ের জন্য কা'বকে নিয়োগ করেন।[৩৮]

'উছমানের (রা) শাহাদাতের দুঃখজনক ঘটনায় কা'ব (রা) একটি মারসিয়া (শোকগাথা) রচনা করেন এবং 'আলীকে (রা) আবৃত্তি করে শোনান। তার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপঃ[৩৯]

فكف يديه ثم أغلق بابه + وأيقن أن الله ليس بغافل

وقال لمن فى داره لا تقاتلوا + عفا الله عن كل امرئ لم يقاتل

فكيف رأيت الله صب عليهم الـ + ـعداوة والبغضاء بعد التواصل

وكيف رأيت الخير أدبرعنهم + وولى كإدبار النعام الجوافل

১. 'উছমান তাঁর হাত দু'টি গুটিয়ে নিলেন, তারপর দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করলেন, আল্লাহ উদাসীন নন।

---

৩৩. *সীরাতু ইবন হিশাম--১/৪৩৫; হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৮৭*

৩৪. *আল আ'লাম -৫/২২৮*

৩৫. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৩*

৩৬. *তাহযীবুত তাহযীব-৮/৩৯৫*

৩৭. *আয-যাহাবী, তারীখ-২/২৪৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৩; আল-ইসাবা-২/১৫৩; তাহযীবুত তাহযীব-৮/৩৯৫*

৩৮. *আনসাবুল আশরাফ- ১/৫৩১*

৩৯. *সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা-২/৫২৭*

২. গৃহে যারা ছিল তাদের বললেন, তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। যারা যুদ্ধ করেনি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন।

৩. বন্ধুত্ব সৃষ্টির পর আল্লাহ্ কেমন করে তাঁদের অন্তরে শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিলেন?

৪. আর কল্যাণ কিভাবে তাঁদের দিকে পশ্চাদ্দেশ ফিরিয়ে উঠ পাখীর মত দৌড় দিল?

'আলী (রা) কবিতাটি শোনার পর মন্তব্য করলেনঃ 'উছমান আত্মত্যাগ করেছেন। আর এ ত্যাগ ছিল অতীব দুঃখজনক। আর তোমরা তখন ভীত হয়ে পড়েছিলে। সে ভীতি ছিল অতি নিকৃষ্ট ধরনের।

'আলী ও মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটেছিল তাতে কা'ব (রা) কোন পক্ষে যোগ না দিয়ে উভয়ের থেকে দূরে থাকেন।

সততা ও সত্য বলা ছিল কা'বের (রা) চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যকে যেভাবে তিনি ধারণ করেন সেভাবে অনেকেই ধারণ করতে পারেন নি। দু'আ কবুল হওয়ার পর জীবনে কোন দিন বিন্দুমাত্র মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তিনি নিজেই বলেছেনঃ 'আল্লাহর কসম! যে দিন আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) সেই কথাগুলি বলেছিলাম সেদিন থেকে আজকের দিনটি পর্যন্ত আর কোন প্রকার মিথ্যা বলিনি।[৪০] তাবুক যুদ্ধের পূর্বের জীবনটি ছিল তাঁর অতি পরিচ্ছন্ন। এ কারণে তার জীবনে যখন তাবুকের বিপর্যয় নেমে এলো তখন তাঁর নিজ গোত্র বানূ সালিমা তাঁকে বলতে পেরেছিল-'আল্লাহর কসম! তোমাকে তো আমরা এর পূর্বে আর কোন অপরাধ করতে দেখিনি।[৪১]

কা'ব (রা) ছিলেন তাঁর সময়ের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তৎকালীন আরব কবিদের মধ্যে যাঁরা বেশী বেশী কবিতা রচনা করেছেন তিনি তাঁদেরই একজন। জাহিলী আমলেও কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, তাঁর কবিতা খুবই উন্নতমানের।[৪২] মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে যে তিনজন কবি কুরায়শ ও তাদের স্বগোত্রীয় কবিদের মুকাবিলায় দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করেন, কা'ব (রা) সেই ত্রয়ীর অন্যতম। তাঁরা ইসলামবিদ্বেষী কবিদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন।[৪৩] ইবন সীরীন বলেন ঃ এ তিন কবি হলেন, হাস্সান ইবন ছাবিত, 'আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা ও কা'ব ইবন মালিক। তাঁরাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।[৪৪]

কা'ব ইসলাম গ্রহণের পর কুরায়শদের দেব-দেবীর সমালোচনা করে প্রচুর কবিতা রচনা

---

৪০. সহীহ মুসলিম-২/২৫৪

৪১. বুখারী-২/৬৩৫

৪২. ডঃ 'উমার ফাররূখ-তারীখুল আদাব-১/৩২৪

৪৩. শাযারাতুয যাহাব-১/৫৬

৪৪. আয-যাহাবী, তারীখ-২/২৪৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৫; উসুদুল গাবা-৪/২৪৮

করেছেন। তিনি একটি শ্লোকে বলেছিলেন,[৪৫]

ننسى اللات والعزى وودا + ونسلبها القلا ئد و الشنوفا

'আমরা আল-লাত, আল-'উয্যা ও উদ্দাকে ভুলে যাব। তাদের গলার হার ও কানের দুল ছিনিয়ে নেব।'

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারের প্রধান তিন কবির কবিতার বিষয় ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কা'বের কবিতার মূল বিষয় ছিল যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে কাফিরদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করা এবং মুসলমানদের অন্তর থেকে ভীতি দূর করে তাদেরকে অটল ও দৃঢ় করা। ইবন সীরীন বলেনঃ[৪৬] কা'ব তো কবিতায় যুদ্ধের কথা বলে কাফিরদের ভয় দেখাতেন। বলতেন ঃ আমরা এমন করেছি, এমন করছি বা করবো। হাস্‌সান তাঁর কবিতায় কাফিরদের দোষ-ত্রুটি এবং তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বর্ণনা করতেন। আর ইবন রাওয়াহা কুফরী এবং আল্লাহ ও রাসূলের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতার উল্লেখ করে তাদেরকে ধিক্কার ও নিন্দা জানাতেন।

কা'বের (রা) ছেলে 'আবদুর রহমান বলেন, আমার পিতা একদিন বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! কবিদের সম্পর্কে আল্লাহ তো যা নাযিল করার তা করেছেন। উত্তরে রাসূল (সা) বললেন ঃ একজন প্রকৃত মুজাহিদ তার তরবারি ও জিহবা-উভয়টি দিয়ে জিহাদ করে। আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে তার নামের শপথ! তোমরা তো শত্রুদের দিকে (জিহবা দিয়ে) তীরের ফলাই ছুড়ে মারছো।

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। যখন সূরা আশ-শূ'আরার ২২৪ থেকে ২২৬ নং আয়াত-বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখনা যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফেরে ? এবং এমন কথা বলে, যা তারা করেনা-নাযিল হলো তখন তিন কবি-হাস্‌সান, 'আবদুল্লাহ ও কা'ব কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ যখন এ আয়াত নাযিল করেছেন তখন তো অবশ্যই জেনেছেন, আমরা কবি। রাসূল (সা) তখন তাঁদেরকে আয়াতের ব্যতিক্রমী অংশ-তবে তাদের কথা ভিন্ন যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে-পাঠ করে শোনালেন। তারপর বললেনঃ এ হচ্ছো তোমরা।[৪৮]

---

৪৫. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭৮
৪৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৫, উসদুল গাবা-৪/২৪৮
৪৭. আয যাহাবী, তারীখ-২/২৪৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৫; মুসনাদ-৬/৩৮৭
৪৮. তাফসীর ইবন কাছীর-৩/৩৫৪

কা'ব (রা) ইসলামের প্রতিপক্ষ কুরাইশদের নিন্দায় বহু শ্লোক রচনা করেছেন। আল্লাহর দরবারে অন্ততঃ তার একটি শ্লোক যে গৃহীত হয়েছে, সে কথা খোদ রাসূল (সা) বলেছেন। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। একদিন রাসূল (সা) কা'বকে বললেনঃ তুমি যে শ্লোকটি বলেছো, তাতে তোমার রব তোমাকে ভোলেন নি। কা'ব জানতে চাইলেন ঃ কোন শ্লোকটি ? রাসূল (সা) তখন আবূ বকরকে বললেনঃ আপনি শ্লোকটি একটু আবৃত্তি করুন তো। আবূ বকর তখন শ্লোকটি আবৃত্তি করে শোনান।[৪৯] প্রাচীন আরবী সূত্রসমূহে শ্লোকটি সংকলিত হয়েছে।[৫০] শ্লোকটি এই ঃ

جاءت سخينة كى تغالب ربها + فليغلبن مغالب الغلاب

'সাখীনা ধারণা করেছে, সে তার রবকে (প্রভু) পরাভূত করবে। সকল বিজয়ীদের ওপর বিজয়ী (আল্লাহ) অবশ্যই জয়ী হবেন।'

এখানে 'সাখীনা' অর্থ আটা ও ঘি অথবা আটা ও খোরমা দিয়ে তৈরী এক প্রকার খাবার। এটি ছিল কুরায়ইশদের খুবই প্রিয় খাদ্য। তারা খেতও খুব বেশী বেশী। এ কারণে কবি কুরায়ইশদেরকে 'সাখীনা' বলেছেন। এ দ্বারা মূলতঃ তাদেরকে হেয় ও অপমান করা হয়েছে।[৫১]

কা'ব (রা) কবিতা রচনা করে রাসূলকে (সা) শোনাতেন। মাঝে মাঝে রাসূল (সা) তাতে কিছু শব্দ রদ-বদল করে সংশোধন করে দিতেন। কা'ব তা সবিনয়ে গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। যেমন হুবায়রা ইবন আবী ওয়াহাবকে লক্ষ্য করে কা'ব (রা) একটি কবিতা রচনা করেন। তার একটি শ্লোক ছিল নিম্নরূপঃ[৫২]

مجالدنا عن جذمنا كل فخمة + مذربة فيها القوانس تلمع

'আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে এমন সব বীর পুরুষ যাদের চকচকে ধনুকগুলি তীর নিক্ষেপ করে।'

রাসূল (সা) শ্লোকটি শুনে বললেন ঃ শ্লোকটি مجالدنا عن ديننا অর্থাৎ আমাদের দীনের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে– হলে ভাল হয় না? কা'ব (রা) বললেন ঃ হাঁ। রাসূল

---

৪৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৫; আয-যাহাবী; তারিখ-২৪৩

৫০. দেখুন; কানযুল 'উম্মাল-১৩/৫৮১; শাযারাতুয যাহাব-১/৫৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৬;

৫১. দেখুন: টীকা : সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৫; কানযুল 'উম্মাল-১৩/৫৮১

৫২. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৩৬; কিতাবুল আগানী: ১৫/৩৮

(সা) বললেন, এভাবে হওয়াই উত্তম। অতঃপর কা'ব শ্লোকটি সেভাবে সাজিয়ে নেন।

সমকালীনর আরব সমাজে কা'বের (রা) কবিতা এক অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। রাসূলে কারীম (সা) হুনায়ন যুদ্ধ শেষ করে যখন তায়েফের দিকে যাত্রা করেন তখন কা'ব দুটি শ্লোক রচনা করেন। শ্লোক দু'টি দাউস গোত্রের ওপর এত গভীর প্রভাব ফেলে যে, তারা তা শুনেই ইসলাম গ্রহণ করে। শ্লোক দু'টি নিম্নরূপ ঃ

قضينا من تهامة كل ريب+ وخيبر ثم أجممنا السيوفا
نخيرها ولونطقت لقالت + قواطعهن : دوسا أو ثقيفا

'তিহামা ও খায়বার থেকে আমরা সকল প্রকার হিংসা- বিদ্বেষ বিদূরিত করে তরবারি কোষে আবদ্ধ করে ফেলেছি।

এখন আবার আমরা তাকে যে কোন দু'টির মধ্যে একটি স্বাধীনতা দিচ্ছি। যদি তরবারি কথা বলতে পারতো তাহলে বলতো এবার দাউস অথবা ছাকীফের পালা।'

ইবনে সীরীন বলেন ঃ দাউস গোত্র যখন উক্ত পংক্তি দু'টি শুনলো তখন তারা ভীত হয়ে পড়লো। তারা বললো, এখন মুসলমান হয়ে যাওয়াই উচিত। তা না হলে আমাদের দশাও হবে অন্যদের মত। এরপর তারা একযোগে ইসলাম গ্রহণ করে।[৫৩]

কা'ব (রা) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বীয় কাব্য প্রতিভাকে ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় নিয়োগ করেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি যেমন তরবারি হাতে তুলে নিয়েছেন তেমনিভাবে ভাষার যুদ্ধও চালিয়েছেন। তাঁর জীবনকালের ইসলামের ইতিহাসের সকল ঘটনা তিনি তাঁর কবিতায় ধরে রেখেছেন। বদর যুদ্ধে শহীদদের স্মরণে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। বদরে 'উবায়দাহ ইবনুল হারেছ শহীদ হন। তাঁর স্মরণে রচনা করেন এক শোকগাথা।[৫৪] উহুদ যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে শহীদদের সম্পর্কে বহু কবিতা তিনি রচনা করেছেন। এ যুদ্ধের অন্যতম শহীদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা সায়্যিদুশ শুহাদা হামযার (রা) স্মরণে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। এ সময় মক্কার পৌত্তলিক কবিদের সাথে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সীরাতে ইবন হিশামে তার একটি চিত্র পাওয়া যায়।[৫৫]

হামযার (রা) শানে রচিত একটি মরসিয়াতে তিনি হামযার বোন সাফিয়্যা বিনতু

---

৫৩. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৭৯; উসুদুল গাবা-৪/২৪৮; আল ইসাবা-৩/৩০২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২৫; আয-যাহাবী; তারিখ-২৪৩

৫৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৭৪; ২/১৪;২৪,২৫,২১০

৫৫.প্রাগুক্ত-২/১৩২,১৩৮,১৩৯,১৪৪,১৪৭,১৫৬,১৫৮,১৬১,১৬৩

'আবদিল মুত্তালিবকে লক্ষ্য করে বলছেন ঃ[৫৬]

صفية قومى ولا تعجزى+ وبكى النساء على حمزة
ولا تسأمى أن تطيلى البكا + على أسد الله فى الهزة
فقد كان عزا لأيتامنا + وليث الملاحم فى البزة
يريد بذاك رضا أحمد+ ورضوان ذى العرش والعزة

১. ওঠো সাফিয়্যা, ভেঙ্গে পড়োনা। হামযার স্মরণে বিলাপের জন্য নারীদের প্রতি আহবান জানাও।

২. মানুষের অন্তর কাঁপানো যে বিপদ আল্লাহর সিংহের ওপর আপতিত হয়েছে, সেজন্য দীর্ঘ ক্রন্দনে ক্লান্ত হয়ো না।

৩. তিনি ছিলেন পিতৃ-মাতৃহীনদের জন্য মর্যাদার প্রতীক। অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ছিলেন সিংহের মত।

৪. তাঁর সকল কর্ম দ্বারা তিনি শুধু আহমাদের সন্তুষ্টি এবং আরশ ও ইজ্জতের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহর খুশীই কামনা করতেন।

বীরে মা'উনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিনিধিদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে কবি কা'বের যবান সোচ্চার হয়ে ওঠে। তিনি হত্যাকারীদের নিন্দায় অনেক কবিতা রচনা করেন।[৫৭] মদীনার ইহুদী গোত্র বানূ নাদীরের নির্বাসন ও ইহুদী নেতা কা'ব ইবন আশরাফের হত্যার চিত্র তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতায় ধরা পড়েছে। এ ঘটনা লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষ কবিদের নিন্দাবাদের জবাবও তিনি দিয়েছেন।[৫৮]

খন্দক যুদ্ধের চিত্রও তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। প্রতিপক্ষের বাহিনী ও কবিদের নিন্দায় তিনি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন।[৫৯] বানূ লিহ্ইয়ানের যুদ্ধও তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে।[৬০] জ্বি-কারাদের ঘটনায়ও তাঁকে সোচ্চার দেখা যায়।[৬১] খায়বার বিজয়ের

৫৬. ডঃ 'উমার ফাররূখ, তারীখ ১/৩২৪-৩২৫; কিতাবুল আগানী-১৬/২২৬; সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৫৮

৫৭. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৮৯

৫৮. প্রাগুক্ত- ২/৫৭; ১৯৮-২০২

৫৯. প্রাগুক্ত- ২/২৫৫-২৫৮; ২৫৯-২৬৬

৬০.প্রাগুক্ত- ২/২৮০;২৮১

৬১. প্রাগুক্ত- ২/২৮৭-২৮৮

চিত্রও তাঁর কবিতায় বিধৃত হয়েছে।[৬২] মূতার যুদ্ধের শহীদরা তাঁর হৃদয়ে দারুণ ছাপ ফেলেছে। তাঁদের স্মরণে তিনি রচনা করেছেন আবেগ-ভরা এক কাসীদা।[৬৩] এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) এ মহান কবির জিহ্বা ইসলামের প্রথম পর্বের সকল ঘটনা ও যুদ্ধে সোচ্চার থেকে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিভার যথাযথ ব্যবহার করে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর কিছু কিছু পংক্তি আরবী ভাষা- সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনে পরিণত হয়েছে। রাওহ্ ইবন যান্‌বা বলেন, কা'বের নিজ গোত্রের এক ব্যক্তির প্রশংসায় রচিত তাঁর একটি শ্লোক আরবী কাব্য জগতে সর্বাধিক বীরত্বব্যঞ্জক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।[৬৪]

৬২.প্রাগুক্ত- ২/৩৩৩;৩৪৮; কিতাবুল আগানী- ১৬/২২৬
৬৩. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৩৮৫
৬৪. কিতাবুল আগানী- ১৫/২৯; আল-আ'লাম- ৫/২২৮

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)

'আবদুল্লাহ নাম। কুনিয়াত বা উপনামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। যথা: আবূ মুহাম্মাদ, আবূ রাওয়াহা অথবা আবূ 'আমর। 'শায়িরু রাসূলিল্লাহ'-'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবি' তাঁর উপাধি। মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনী আল-হারিছ শাখার সন্তান। পিতা রাওয়াহা ইবন ছা'লাবা এবং মাতা কাবশা বিনতু ওয়াকিদ। সাহাবিয়্যা 'আমরাহ বিনতু রাওয়াহা তাঁর বোন এবং কবি সাহাবী নু'মান ইবন বাশীর তাঁর ভাগ্নে। ইতিহাসে তাঁর জন্মের সময়কাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয় জীবনে অতি মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন।[১] তিনি তৃতীয় 'আকাবায় সত্তর (৭০) জন মদীনাবাসীর সাথে অংশগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বাই'য়াত করেন এবং সা'দ ইবনুর রাবী'র সাথে তিনিও বানূ আল-হারিছার 'নাকীব' (দায়িত্বশীল) মনোনীত হন।[২]

তবে সম্ভবতঃ তিনি এই তৃতীয় 'আকাবার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় তিনি প্রথম 'আকাবায় ছয়জনের সাথে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়'য়াত করেন।[৩]

ইসলাম গ্রহণের পর মদীনায় ইসলামের তাবলীগ ও দা'ওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে হিজরাত করে কুবায় উপস্থিত হলেন। তিনি যেদিন কুবা থেকে সর্বপ্রথম মদীনায় পদার্পণ করেন, সেদিন 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, সা'দ ইবনুর রাবী' ও খারিজা ইবন যায়দ তাঁদের গোত্র বানূ আল-হারিছার লোকদের সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উটনীর পথরোধ করে দাঁড়ান এবং তাঁকে তাদের গোত্রে অবতরণের বিনীত আবেদন জানান। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাদের বলেন, উটনীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর নির্দেশমত চলছে, আল্লাহর যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থামবে। তারা পথ ছেড়ে দেন।[৪]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মিকদাদ ইবন আসওয়াদ আল-কিন্দীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।

বদর, উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়া, খাইবার, 'উমরাতুল কাদা–প্রত্যেকটি অভিযানে তিনি অংশগ্রহন করেন। কেবল হিজরী চতুর্থ সনে সংঘটিত 'বদর আস-সুগরা' অভিযানে

---

১. তাবাকাত-৩/৫২৫, আল-আ'লাম-৪/২১৭, তাহজীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত-১/২৬৫

২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪৩, ৪৫৮, তাবাকাত-৩/৫২৬, আনসাবুল আশরাফ-১/২৫২, তারীখুল ইসলাম ও তাবাকাতুল মাশাহীর-১/১৮১

৩. হায়াতুস সাহাবা-১/১০৫

৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৫.

যোগদান করতে পারেন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মদীনায় স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে যান।৫

উল্লেখ্য যে, উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় কুরায়শ নেতা আবূ সুফইয়ান ইবন হারব ঘোষণা দেয় যে, এখন থেকে ঠিক এক বছরের মাথায় 'বদর আস-সুগরা'-তে আবার তোমাদের মুখোমুখি হব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানরা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হন। কিন্তু কুরায়শরা অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হয়। এই বদর আস-সুগরা-তে রাসূল (সা) বাহিনীসহ আট দিন অপেক্ষা করেন। এটা হিজরী চতুর্থ সনের জ্বিলকা'দা মাসের ঘটনা।৬

বদর যুদ্ধের সূচনা পর্বে কুরাইশ পক্ষের বাহাদুর 'উতবা ইবন রাবী'আ' তার ভাই শায়বা ইবন রাবী'আ ও ছেলে আল-ওয়ালীদ ইবন 'উতবাকে সংগে করে প্রতিপক্ষ মুসলিম বাহিনীকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানায়। তার আহবানে সাড়া দিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে 'আউফ, মুয়াওয়াজ ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা সর্বপ্রথম এগিয়ে যান। 'উতবা তাঁদের জিজ্ঞেস করেঃ তোমরা কারা? তাঁরা জবাব দেন, আনসারদের একটি দল। 'উতবা বলল, তোমাদের সাথে আমরা লড়তে চাইনা।৭

বদরের বিজয় বার্তা দিয়ে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনার চতুর্দিকে লোক পাঠান। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে পাঠান মদীনার উঁচু অঞ্চলের দিকে।৮

রাসূলুল্লাহ (সা) বদর যুদ্ধের পর মুসলমানদের হাতে বন্দী কুরায়শদের সম্পর্কে সাহাবীদের মতামত জানতে চান। তাঁদের সম্পর্কে নানাজন নানা মত প্রকাশ করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রচুর জ্বালানী কাঠে পরিপূর্ণ একটি উপত্যাকায় তাদেরকে জড় করে তার মধ্যে ফেলে দেয়া হোক। তারপর আমিই সেই কাঠে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলবো।৯

খন্দক যুদ্ধের সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার রচিত কবিতা বার বার আবৃত্তি করেছিলেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপঃ

والله لولا الله ما اهتدينا # ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا # وثبت الأقدام إن لاقينا

إن الأولى قدبغوا علينا # إذا أرادوا فتنة أبينا

---

৫. তাবাকাত-৩/৫২৬, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫৮.

৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৯-৩৪০.

৭. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬২৫.

৮. প্রাগুক্ত-১/৬৪২.

৯. হায়াতুস সাহাবা-২/৪২.

'হে আল্লাহ, তোমার সাহায্য না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না,
আমরা যাকাত দিতাম না, সালাত আদায় করতাম না
তুমি আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল কর,
যুদ্ধে আমাদেরকে অটল রাখ।
যারা আমাদের ওপর জুলুম করেছে,
তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করলে, আমরা অস্বীকার করবো।'[১০]

এই খন্দক যুদ্ধের সময় মদীনার ইহুদী গোত্র বানূ কুরায়জার নেতা কা'ব ইবন আসাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সম্পাদিত তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। খবরটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কানে পৌঁছে। তিনি খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কয়েকজন লোককে কা'বের নিকট পাঠান। তাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও ছিলেন।[১১]

খন্দক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি মু'জিযা বা অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আর তার সাথে 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার নামটি উচ্চারিত হয়েছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার ভাগ্নী তথা নু'মান ইবন বাশীরের বোন বলেনঃ একদিন আমার মা 'উমরাহ বিনতু রাওয়াহা আমাকে ডেকে আমার কাপড়ে কিছু খেজুর বেঁধে দিয়ে বললেন ঃ এগুলি তোমার বাবা বাশীর ও মামা 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে দিয়ে এসো, তাঁরা দুপুরে খাবেন। আমি সেগুলি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশ দিয়ে যাচ্ছি, আর আমার বাবা ও মামাকে খোঁজ করছি। রাসূল (সা) আমাকে দেখে ডাক দিলেন ঃ এই মেয়ে, এদিকে এসো। তোমার কাছে কি? বললাম ঃ খেজুর। আমার মা আমার বাবা বাশীর ইবন সা'দ ও মামা 'আবদুল্লাহর দুপুরের খাবারের জন্য পাঠিয়েছেন। বললেন ঃ আমার কাছে দাও। আমি খেজুরগুলি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুই হাতে ঢেলে দিলাম, কিন্তু হাত ভরলো না। তিনি কাপড় বিছাতে বললেন এবং খেজুরগুলি কাপড়ের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। তারপর পাশের লোকটিকে বললেন ঃ যাও, খন্দকবাসীদের দুপুরের খাবার খেয়ে যেতে বল। ঘোষণার পর সবাই চলে আসলো এবং খাবার খেতে শুরু করলো। তাঁরা খাচ্ছে, আর খেজুরও বাড়ছে। তাঁরা পেট ভরে খেয়ে চলে গেল, আর তখনও কাপড়ের ওপর কিছু খেজুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকলো।[১২]

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বাই'য়াতে রিদওয়ানেও 'আবদুল্লাহ যোগদান করেন।

---

১০. সীয়ারে আনসার-২/৫৯, আল-বুখারী, আল-জামি আস-সাহীহ, ২/৫৮৯, ৯০৮.
১১. সীরাতু ইবন হিশাম-২/২২১, আসাহ আস-সীয়ার-১৯০.
১২. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১১৮, হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৩১.

আবূ রাফে'র পরে উসাইর ইবন রাযিম ইহুদীকে খাইবরের শাসক নিয়োগ করা হয়েছিল। ইসলামের শত্রুতায় সে ছিল উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। সে গাতফান গোত্রে ঘোরাঘুরি করে তাদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) খবর পেয়ে ষষ্ঠ হিজরীর রমাদান মাসে তিরিশ সদস্যের একটি দলের সাথে 'আবদুল্লাহকে খায়বারে পাঠান। তিনি গোপনে উসাইর ইবন রাযিমের সকল তথ্য সংগ্রহ করে রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। রাসূল (সা) তিরিশ সদস্যের একটি বাহিনী আবদুল্লাহর অধীনে ন্যস্ত করে উসাইরকে হত্যার নির্দেশ দেন।১৩

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা উসাইরের সাথে দেখা করে বলেন, যদি আপনি নিরাপত্তার আশ্বাস দেন তাহলে একটি কথা বলি। সে আশ্বাস দিল। 'আবদুল্লাহ বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনাকে খায়বারের নেতা বানানো তাঁর ইচ্ছা। তবে আপনাকে একবার মদীনায় যেতে হবে। সে প্রলোভনে পড়ে এবং তিরিশজন ইহুদীকে সংগে করে 'আবদুল্লাহর বাহিনীর সাথে চলতে শুরু করলো। পথে 'আবদুল্লাহ প্রত্যেক ইহুদীর প্রতি নজর রাখার জন্য একজন করে মুসলমান নির্দিষ্ট করে দিলেন। এতে উসাইরের মনে সন্দেহের উদ্রেক হল এবং ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলো। ধোঁকা ও প্রতারণার অপরাধে মুসলিম মুজাহিদরা খুব দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে তাদের সকলকে হত্যা করেন। এই ঘটনার পর খায়বারের মাথাচাড়া দেয়া বিদ্রোহ দমিত হয়।১৪

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) 'আবদুল্লাহকে খাইবারে উৎপাদিত খেজুর পরিমাপকারী হিসাবে আবারও সেখানে পাঠান। কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট 'আবদুল্লাহর কঠোরতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো। এক পর্যায়ে তারা ঘুষও দিতে চাইল। ইবন রাওয়াহা তাদেরকে বললেন : ওহে আল্লাহর দুশমনরা। তোমরা আমাকে হারাম খাওয়াতে চাও? আমার প্রিয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমি এসেছি। আমার নিকট তোমরা বানর ও শুকর থেকেও ঘৃণিত। তোমাদের প্রতি ঘৃণা এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা তোমাদের ওপর কোন রকম জুলুমের দিকে নিয়ে যাবে না। একথা শুনে তারা বলল : এমন ন্যায়পরায়ণতার ওপরই আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত।১৫ হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী সে বছরের মূলতবী 'উমরাহ রাসূল (সা) পরের বছর হিজরী সপ্তম সনে আদায় করেন। একে 'উমরাতুল কাদা বা কাজা 'উমরা বলে। এই সফরে রাসূলে করীম (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন এবং উটের পিঠে বসে 'হাজারে আসাওয়াদ' চুম্বন করেন তখন 'আবদুল্লাহ তার বাহনের লাগাম ধরে একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। কবিতাটির কিছু অংশের মর্ম নিম্নরূপ :

---

১৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৭৮

১৪. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬১৮, সীয়ারে আনসার-২/৬০.

১৫. হায়াতুস সাহাবা-২/১০৮, আল-বিদায়া-৪/১৯৯

ওরে কাফিরের সন্তানরা! তোরা তাঁর পথ থেকে সরে যা, তোরা পথ ছেড়ে দে। কারণ, সকল সৎকাজ তো তাঁরই সাথে। আমরা তোদের মেরেছি কুরআনের ব্যাখ্যার ওপর, যেমন মেরেছি তার নাযিলের ওপর। এমন মার দিয়েছি যে, তোদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বন্ধু ভুলে ফেলে গেছে তাঁর বন্ধুকে। প্রভু, আমি তাঁর কথার ওপর ঈমান এনেছি।'১৬

এক সময় হযরত 'উমার (রা) ধমক দিয়ে বলেন ঃ আল্লাহর হারামে ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে এভাবে কবিতা পাঠ? রাসূল (সা) তাকে শান্ত করে বলেনঃ 'উমার! আমি তার কথা শুনছি। আল্লাহর কসম! কাফিরদের ওপর তার কথা তীর-বর্শার চেয়েও বেশী ক্রিয়াশীল।১৭ তিনি 'আবদুল্লাহকে বলেন ঃ তুমি এভাবে বল ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, নাসারা 'আবদাহু ওয়া আ'আয্‌যা জুনদাহু, ওয়া হাযামাল আহ্‌যাবা ওয়াহ্‌দাহু'- এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন এবং একাই প্রতিপক্ষের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা উপরোক্ত বাক্যগুলি আবৃত্তি করছিলেন, আর তার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ করছিলেন সমবেত মুসলিম জনমণ্ডলী। তখন মক্কার উপত্যকা সমূহে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল।১৮

হিজরী অষ্টম সনের জামাদি-উল-আওয়াল মাসে মূতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বসরার শাসকের নিকট দূত মারফত একটি চিঠি পাঠান। পথে মূতা নামক স্থানে এক গাসসানী ব্যক্তির হাতে দূত নিহত হয়। দূতের হত্যা মূলত যুদ্ধ ঘোষণার ইঙ্গিত। রাসূল (সা) খবর পেয়ে যায়দ ইবন হারিছার নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মূতায় পাঠান।

যাত্রার প্রাক্কালে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেনঃ যায়দ হবে এ বাহিনীর প্রধান। সে নিহত হলে জা'ফর ইবন আবী তালিব তার স্থলাভিষিক্ত হবে। জা'ফরের পর হবে 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। আর সেও যদি নিহত হয় তাহলে মুসলমানরা আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের আমীর বানিয়ে নেবে।

বাহিনী মদীনা থেকে যাত্রার সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'ছানিয়্যাতুল বিদা' পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাদের বিদায় জানান। বিদায় বেলা মদীনাবাসীরা তাদেরকে বলল ঃ তোমরা নিরপদে থাক এবং কামিয়াব হয়ে ফিরে এসো। 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা বলল ঃ কাঁদার কি আছে? তিনি বললেন, দুনিয়ার

---

১৬. তাবাকাত-৩/৫২৬-৫২৭, আল-ইসাবা-২/৩০৭.

১৭. আল-ইসাবা-২/৩০৭.

১৮. সীয়ারে আনসার-২/৬১.

মুহাব্বতে আমি কাঁদছিনা। তিনি সূরা মারইয়াম-এর ৭১ নং আয়াত-'তোমাদের প্রত্যেককেই তা (পুলসিরাত) অতিক্রম করতে হবে। এটা তোমার রব-এর অনিবার্য সিদ্ধান্ত'- পাঠ করেন। তারপর তিনি বলেন, আমি কি সেই পুলসিরাত পার হতে পারবো ? লোকেরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল ঃ আল্লাহ্ তোমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আবার মিলিত করবেন। তখন তিনি স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটির কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ

ولكنى أسأل الرحمن مغفرة # وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا
أو طعنة بيدى حرّان مجهزة # بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا
حتى يقال إذا مروا على جدثى # أرشده الله من غازو قد رشدا

'তবে আমি রহমানের কাছে মাগফিরাত কামনা করি, আর কামনা করি অসির অন্তরভেদী একটি আঘাত, অথবা কলিজা ও নাড়িতে পৌঁছে যায় নিযার এমন একটি খোঁচা। আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী যেন বলে–হায় আল্লাহ, সে কত ভালো যোদ্ধা ও গাজী ছিল।'[১৯]

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, যায়দ ও জা'ফর বাহিনীসহ সকালে মদীনা ত্যাগ করলেন। ঘটনাক্রমে সেটা ছিল জুমআ'র দিন। 'আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জুম'আর নামায আদায় করে রওয়ানা হব। তিনি নামায আদায় করলেন। রাসূল (সা) নামায শেষে তাঁকে দেখে বললেন ঃ সকালে তোমার সংগীদের সাথে যাওনি কেন ? 'আবদুল্লাহ বললেন, আমি ইচ্ছা করেছি, আপনার সাথে জুম'আ আদায় করে তাদের সাথে মিলিত হব। রাসূল (সা) বললেন, তুমি যদি দুনিয়ার সবকিছু খরচ কর তবুও তাদের সকালে যাত্রার সাওয়াবের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবে না।[২০]

মদীনা থেকে শামের 'মা'আন' নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা জানতে পারেন যে, রোমান সম্রাট হিরাকল এক লাখ রোমান সৈন্যসহ 'বালকা'-র 'মাব' নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছে। আর তাদের সাথে যোগ দিয়েছে লাখম, জুজাম, কায়ন, বাহ্রা, বালী-সহ বিভিন্ন গোত্রের আরও এক লাখ লোক। এ খবর পেয়ে তাঁরা মা'আনে দুই দিন ধরে চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করেন। মুসলিম সৈনিকদের কেউ কেউ মত প্রকাশ করে যে, আমরা শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ও প্রস্তুতির সব খবর রাসূলকে (সা) অবহিত করি। তারপর তিনি আমাদেরকে অতিরিক্ত সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন অথবা অন্য কোন নির্দেশ দেবেন এবং আমরা সেই মোতাবিক কাজ করব।

'আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা তখন সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি

১৯. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৭৩,৩৭৪, হায়াতুস সাহাবা-১/৫২৯,৫৩০।

২০. হায়াতুস সাহাবা-১/৪৬৩।

বলেন, ওহে জনমণ্ডলী, এখন তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হতে পসন্দ করছো না; অথচ তোমরা সবাই শাহাদাত লাভের উদ্দেশে বের হয়েছো। আমরা তো শত্রুর সাথে সংখ্যা, শক্তি ও আধিক্যের দ্বারা লড়বো না। আমরা লড়বো দীনের বলে বলীয়ান হয়ে- যে দীনের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তোমরা সামনে ঝাঁপিয়ে পড়। তোমাদের সামনে আছে দুইটি কল্যাণের যে কোন একটি - হয় বিজয়ী হবে নতুবা শাহাদাত লাভ করবে। সৈনিকরা তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলল ঃ আল্লাহর কসম! ইবনে রাওয়াহা ঠিক কথাই বলেছেন। তারা তাদের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হন। 'আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহাও একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তাদের সাথে চলেন।২১

তাঁরা 'মা'আন' ত্যাগ করে মূতায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। এখানে অমুসলিমদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী অসম যুদ্ধ হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'মূতার যুদ্ধ' নামে খ্যাত। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা মাত্র তিন হাজার আর শত্রুবাহিনীর সংখ্যা অগণিত।২২

প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল। সেনাপতি যায়দ ইবন হারিছা যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হলেন। জা'ফর তাঁর পাতাকাটি তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনিও শাহাদাত বরণ করলেন। এবার 'আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি ছিলেন ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার মুহূর্তে তাঁর মনে একটু দ্বিধার ভাব দেখা দিল। তিনি সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আপন মনে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ

أقسمت يانفس لتنزلنة # لتنزلن أولتكرهنه

إن أجلب الناس وشروا الرنة # مالي أراك تكرهين الجنة

وقدطال ما قدكنت مطمئنه # هل أنت إلانطفة فى شنه

يانفس إلا تقتلي تموتى # هذا حمام الموت قدصليت

وما تمنيت فقدأعطيت # إن تفعلى فعلهما هديت

'হে আমার প্রাণ! আমি কসম করেছি, তুমি অবশ্যই নামবে, তুমি স্বেচ্ছায় নামবে অথবা নামতে বাধ্য করা হবে। মানুষের চিৎকার ও ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, তোমার কী হয়েছে যে, এখনও জান্নাতকে অবজ্ঞা করছো? সেই কত দিন থেকে না এই জান্নাতের প্রত্যাশা করে আসছো, পুরানো ফুটো মশকের এক বিন্দু পানি ছাড়া তো তুমি আর কিছু নও। হে আমার প্রাণ, আজ তুমি নিহত না হলেও একদিন তুমি মরবে, এই মৃত্যুর হাম্মাম এখানে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। তুমি যা কামনা করতে এখন তোমাকে তাই দেয়া

২১. *সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৭৫, আসাহ আস-সীয়ার-২৮০*

২২. *সীয়ারে আনসার-২/৬২।*

হয়েছে, তুমি তোমার সঙ্গীদ্বয়ের কর্মপন্থা অনুসরণ করলে হিদায়াত পাবে।'

উপরোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। তখন তাঁর এক চাচাতো ভাই গোশতসহ একটুকরো হাড় নিয়ে এসে তার হাতে দেন। তিনি সেটা হাতে নিয়ে যেই না একটু চাটা দিয়েছেন, ঠিক তখনই প্রচণ্ড যুদ্ধের শোরগোল ভেসে এলো। 'তুমি এখনও বেঁচে আছ'-এ কথা বলে হাতের হাড়টি ছুড়ে ফেলে দিয়ে তরবারি হাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুপক্ষের এক সৈনিক এমন জোরে তীর নিক্ষেপ করে যে, মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। একটি তীর তাঁর দেহে বিদ্ধ হয়। তিনি রক্তরঞ্জিত অবস্থায় সাথীদের আহবান জানান। সাথীরা ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।২৩

মূতায় অবস্থানকালে শাহাদাতের পূর্বে একদিন রাতে তিনি একটি মর্মস্পর্শী কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। আবৃত্তি শুনে যায়দ ইবন আরকাম কাঁদতে শুরু করেন। তিনি যায়দের মাথার ওপর দুররা উঁচু করে ধরে বলেন ঃ তোমার কী হয়েছে ? আল্লাহ আমাকে শাহাদাত দান করলে তোমরা নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে যাবে।২৪

হযরত রাসূলে কারীম (সা) ওহীর মাধ্যমে মূতার প্রতি মুহূর্তের খবর লাভ করে মদীনায় উপস্থিত লোকদের সামনে বর্ণনা করছিলেন। সহীহ্ বুখারীতে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, মূতার খবর আসার পূর্বেই রাসূল (সা) মদীনায় যায়দ, জা'ফর ও 'আবদুল্লাহর শাহাদাতের খবর দান করেন। তিনি বলেন ঃ যায়দ ঝাণ্ডা হাতে নেয় এবং শহীদ হয়। তারপর জা'ফর তুলে নেয়, সেও শহীদ হয়। অতঃপর 'আবদুল্লাহ্ তুলে নেয় এবং সেও শহীদ হয়। তিনি একথা বলছিলেন আর তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।২৫

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, যায়দ ও জা'ফরের শাহাদাতের খবর দেয়ার পর রাসূল (সা) একটু চুপ থাকেন। এতে আনসারদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তারা ধারণা করে যে, 'আবদুল্লাহর এমন কিছু ঘটেছে যা তাদের মনঃপুত নয়। তারপর রাসূল (সা) বলেন ঃ অতঃপর 'আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা পতাকা উঠিয়ে নেয় এবং যুদ্ধ করে শহীদ হয়। তিনি আরও বলেন, তাদের সকলকে জান্নাতে আমার কাছে আনা হয়েছে। আমি দেখলাম, তারা সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে। তবে 'আবদুল্লাহর পালঙ্কটি তার অন্য দুই

---

২৩. *তাবাকাত-৩/৫২৯, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৭৯, হায়াতুস সাহাবা-১/৫৩৩, সীয়ারে আনসার-২/৬৩, আনসাবুল আশরাফ-১/৩৮০, ২৪৪*

২৪. *আল-ইসাবা-২/৩০৭*

২৫. *আসাহ আস-সীয়ার-২৮১*

সঙ্গীর থেকে একটু বাঁকা। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা এমন কেন ? বলা হল ঃ তারা দুইজন দ্বিধাহীন চিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু 'আবদুল্লাহর চিত্ত দ্বিধা-সংকোচে একটি দোল খায়। তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে।২৬

মূতার তিন সেনাপতির মৃত্যুর খবর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং তাঁদের কর্মকাণ্ড বর্ণনা করে এই বলে দু'আ করেন ঃ আল্লাহ তুমি যায়দকে ক্ষমা করে দাও। একথা তিনবার বলেন, তারপর বলেন ঃ আল্লাহ তুমি জা'ফর ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে ক্ষমা করে দাও।২৭

মূতায় যাওয়ার পূর্বে তিনি একবার মদীনায় অসুস্থ অবস্থায় অচেতন হয়ে পড়েন। তখন তাঁর বোন 'উমরাহ নানাভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে আরবদের প্রথা অনুযায়ী বিলাপ শুরু করেন। চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি বোনকে বলেন, তুমি আমার সম্পর্কে অতিরঞ্জন করে যা কিছু বলছিলে, তার সবই আমার কাছ থেকে সত্যায়িত করা হচ্ছিল। এই কারণে তার মৃত্যুর সময় তারই উপদেশ মত সকলে 'সবর' (ধৈর্য্য) অবলম্বন করে। সহীহ বুখারীতে এসেছে, তিনি যখন মারা যান তাঁর জন্য কান্নাকাটি বা বিলাপ করা হয়নি।২৮

মূতা রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী ও সন্তান ছিল। কিন্তু উসুদুল গাবা গ্রন্থাকার বলেছেন, তিনি নিহত হন এবং কোন সন্তান রেখে যাননি।২৯

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার স্ত্রী সম্পর্কে আল-ইসতীআব গ্রন্থে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, তুমি যদি পাক অবস্থায় থাক তাহলে একটু কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাও। তখন 'আবদুল্লাহ চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। যার কিছু নিম্নরূপ ঃ

شهدت بأن وعد الله حق # وأن النارمثوى الكافرينا
وأن العرش فوق الماء حق # وفوق العرش رب العلمينا
تحمله ملائكة غلاظ # ملائكة الإله مسومينا

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহর ওয়াদা সত্য,
কাফিরদের ঠিকানা দোযখ,
'আরশ ছিল পানির ওপর,
'আরশের ওপর ছিলেন বিশ্বের প্রতিপালক,
আর সেই 'আরশ বহন করে তাঁরই শক্তিশালী ফিরিশতারা।
আল্লাহর ফিরিশতারা শ্বেত-শুভ্র চিহ্ন বিশিষ্ট।'

---

২৬. *সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৮০*
২৭. *হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৪*
২৮. *উসুদুল গাবা-৩/১৫৭-১৫৯, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৮০*
২৯. *উসুদুল গাবা-৩/১৫৯, সীয়ারে আনসার-২/২৬৫*

তাঁর স্ত্রী কুরআনে পারদর্শী ছিলেন না। এই কারণে তিনি বিশ্বাস করেন যে, 'আবদুল্লাহ কুরআন থেকেই তিলাওয়াত করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ সত্যবাদী, আমার চোখ দেখতে ভুল করেছে। আমি অহেতুক তোমাকে দোষারোপ করেছি। দাসীর সাথে উপগত হওয়ার পর স্ত্রীর ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য হযরত 'আবদুল্লাহ এমন বাহানার আশ্রয় নেন। তিনি পরদিন সকালে এ ঘটনা রাসূলুল্লাহকে (সা) জানালে তিনি হেসে দেন।৩০

সামরিক দক্ষতা ছাড়াও হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার আরও অনেক যোগ্যতা ছিল। একারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সমাদর করতেন। সেই জাহিলী আরবে যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক আবরীতে লেখা জানতো, 'আবদুল্লাহ তাদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা) তাঁকে স্বীয় 'কাতিব' (লেখক) হিসেবে নিয়োগ করেন। তবে কখন কিভাবে তিনি লেখা শিখেছিলেন, সে সম্পর্কে ইতিহাস কিছু বলে না।

তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন বিখ্যাত কবি। ডক্টর 'উমার ফাররুখ বলেন, মদীনায় ইসলাম রাষ্টশক্তি অর্জন করলে আরবের মুশরিকগণ আরও শংকিত হয়ে পড়ে। মক্কার পৌত্তিলিক কবিগণ বিশেষতঃ 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যিবা'রী, কা'ব ইন যুহায়র ও আবূ সুফইান ইবন আল হারিছ রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইসলামের নিন্দা ও কুৎসা রটনা করে কবিতা লিখতো। তখন মদীনায় হাসসান ইবন ছাবিত, 'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও কা'ব ইবন মালিক তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে সমুচিত জবাব দেন এবং ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরেন। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত দু'পক্ষের এ কবিতার যুদ্ধ চলতে থাকে। 'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ছিলেন তাঁর যুগের ভালো কবিদের একজন। তিনি হাসসান ও কা'বের সমপর্যায়ের কবি। জাহিলী যুগে তিনি কবি কায়স ইবনূল খুতায়ম-এর সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ মূলক কবিতা লিখে প্রতিযোগিতা করতেন। আর ইসলামী যুগে রাসূলের (সা) প্রশংসা এবং মুশরিক কবিদের প্রতিবাদ ও নিন্দায় কবিতা রচনা করতেন।৩১

জুরজী যায়দান বলেন ঃ 'মক্কার পৌত্তলিক কবিদের মধ্যে যারা মুসলমানদের নিন্দা করে কবিতা বলতো তাদের মধ্যে 'আবূদুল্লাহ ইবন আয-যিবা'রী, আবূ সুফইয়ান ইবন আল-হারিছ ও 'আমর ইবন আল-'আস ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। একদিন নবী (সা) বললেন ঃ যারা তাদের অস্ত্রের দ্বারা আল্লাহর রাসূলকে সাহায্য করেছে, জিহ্বা দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে তাদেরকে কিসে বিরত রেখেছে ? এই কথার পর যে তিন কবি উপরোক্ত কবিদের প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে যান তাঁরা হলেন, হাস্সান, কা'ব, ও 'আবদুল্লাহ। রাসূল (সা) মনে করতেন, এই তিনি কবির কবিতা শত্রুদের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া

---

৩০. আল-ইসতী'আব-১/৩৬২, হায়াতুস সাহাবা-৩/১৫

৩১. তারীখুল আদাব আল-'আরাবী-১/২৫৮,২৬১,২৬২

সৃষ্টি করে। তিনি বলেছেন ঃ এই তিন কবি কুরায়শদের কাছে তীরের ফলার চেয়েও বেশী শক্তিশালী।৩২

কবি হাস্‌সান কুরায়শদের বংশ ও রক্তের ওপর আঘাত হানতেন, কবি কা'ব কুরায়শদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অতীত ইতিহাস বর্ণনা করে তাদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরতেন। পক্ষান্তরে 'আবূদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহ্ তাদের কুফরীর জন্য নিন্দা ও ধিক্কার দিতেন।৩৩

আবূল ফারাজ আল-ইস্পাহানী বলেন ঃ হাসসান ও কা'ব প্রতিপক্ষ কুরায়শ কবিদের মত যুদ্ধ বিগ্রহ ও গৌরবমূলক কাজ-কর্ম নিয়ে কবিতা রচনা করতেন এবং তার মধ্যে কুরায়শদের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি তুলে ধরতেন। আর 'আবূদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা তাদের কুফরীর জন্য ধিক্কার জানাতেন। কুরায়শদের ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পূর্বোক্ত দু'জনের কবিতা ছিল তাদের নিকট 'আবূদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহার কবিতা অপেক্ষা অধিকতর পীড়াদায়ক। কিন্তু যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে তার মর্মবাণী উপলব্ধি করলো তখন 'আবূদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহার কবিতা সর্বাধিক প্রভাবশালী ও পীড়াদায়ক বলে তাদের নিকট প্রতিভাত হলো।৩৪

'আবূদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা ছিলেন স্বভাব কবি। উপস্থিত কবিতা রচনায় দক্ষ ছিলেন। হযরত যুবায়র ইবনূল 'আওয়াম (রা) বলেন ঃ তাৎক্ষণিক কবিতা বলার ক্ষেত্রে আমি 'আবূদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা অপেক্ষা অধিকতর সক্ষম আর কাউকে দেখিনি।৩৫

একদিন তিনি মসজিদে নববীতে গেলেন। পূর্বেই সেখানে হযরত রাসূলে কারীম (সা) একদল সাহাবীর সাথে বসে ছিলেন। তিনি 'আবূদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহাকে কাছে ডেকে বলেন, তুমি এখন মুশরিকদের সম্পর্কে কিছু কবিতা শোনাও। 'আবূদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা কিছু কবিতা শোনালেন। তার একটি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ

فثبت الله ما أتاك من حسن # تثبيت موسى ونصراكالذى نصروا

'আল্লাহ্ আপনাকে যে সৌন্দর্য ও শোভা দান করেছেন তা স্থির ও দৃঢ় করুন,
যেমন দৃঢ়তা দান করেছিলেন মূসা (আ) কে এবং বিজয় দান করুন,
যেমন তাঁদেরকে বিজয় দান করেছিলেন।'

কবিতা শুনে রাসূল (সা) একটু হাসি দিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে অটল রাখুন।৩৬

'আবূদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহার সব কবিতা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তবে এখনও

---

৩২. *তারীখু আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ-১/১৯১*
৩৩. *উসুদুল গাবা-৪/২৪৮*
৩৪. *কিতাবুল আগানী-৪/১৩৬*
৩৫. *তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/২৬৫*
৩৬. *আল ইসতী'আব-১/৩৬২, তাবাকাত-৩/৫২৮, আল ইসাবা-২/৩০৭*

পঞ্চাশটি শ্লোক (verse) সীরাত ও ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। সীরাত ইবন হিশামে তার অধিকাংশ পাওয়া যায়।৩৭

যখন সূরা আশশু'আরা-এর ২২৪-২২৬ নং আয়াতগুলো-'কবিদেরকে তারাই অনুসরণ করে যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনা তারা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় এবং যা করে না তাই বলে বেড়ায়?' নাযিল হয় তখন হাস্সান, 'আবূদুল্লাহ্ ও কা'ব এত ভীত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে রাসলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছুটে যান। তাঁরা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই আয়াত নাযিলের সময় আল্লাহ্ তো জানতেন আমরা কবি। তখন রাসূল (সা) আয়াতের পরবর্তী অংশ–'কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ্কে বার বার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে'-পাঠ করেন এবং বলেন, এই হচ্ছো তোমরা।৩৮

'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা থেকে কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি হাদীছগুলি খোদ রাসূল (সা) ও বিলাল থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন ইবন 'আব্বাস, উসামা ইবন যায়দ, আনাস ইবন মালিক, নু'মান ইবন বাশীর ও আবূ হুরায়রা।৩৯

'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ছিলেন একজন দুনিয়া বিরাগী 'আবিদ ও সব সময় আল্লাহকে স্মরণকারী (জাকির) ব্যক্তি। আবূদ দারদা বলেন ঃ এমন কোন দিন যায়না যেদিন আমি তাঁকে স্মরণ করিনা। আমার সঙ্গে একত্র হলেই তিনি বলতেন, এসো, কিছুক্ষণের জন্য আমরা মুসলমান হয়ে যাই। তারপর বসে 'জিকর' শুরু করতেন। 'জিকর' শেষ হলে বলতেন, এটা ছিল ঈমানের মজলিস।৪০

আনাস ইবন মালিক বলেন। 'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) -এর কোন সাহাবীর দেখা হলে বলতেন, এসো, আমরা কিছু সময়ের জন্য ঈমান আনি। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর এমন কথায় খুব রেগে গেল। সে সোজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অভিযোগ করে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আপনি কি দেখেন না, ইবন রাওয়াহা আপনার ঈমান ত্যাগ করে কিছুক্ষণের ঈমানকে পসন্দ করছে? তিনি বললেন, আল্লাহ ইবন রাওয়াহার ওপর রহম করুন। সে এমন সব মজলিস পসন্দ করে যার জন্য ফিরিশতারাও ফখর করে থাকে।

একবার তো তাঁর এমনি ধরনের আহবানে এক ব্যক্তি প্রতিবাদ করে বলে বসলো, কেন আমরা কি মু'মিন নই? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমরা মু'মিন। তবে আমরা জিকর

---

৩৭. দায়িরা-ই- মা'আরিফ ইসলামিয়্যা (উর্দু)১২/৭৮০

৩৮. আল-ইসাবা-২/৩০৭, তাবাকাত-৩/৫২৮, হায়াতুস সাহাবা-৩/৭৭, ১৭২

৩৯. আল ইসাবা-২/৩০৬

৪০. উসুদুল গাবা-৩/১৫৭

করবো, তাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে।[৪১]

তাঁর স্ত্রী বর্ণনা করেন, যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন, দুই রাকাআত নামায আদায় করতেন। আবার ঘরে ফিরে এসে ঠিক একই রকম করতেন। এ ব্যাপারে কখনও অলসতা করতেন না।[৪২]

একবার এক সফরে এত প্রচণ্ড গরম ছিল যে, মানুষ সূর্যের তেজ থেকে বাঁচার জন্য নিজ নিজ মাথার ওপর হাত দিয়ে রেখেছিল। এমন গরমে কে রোযা রাখে? কিন্তু তার মধ্যেও কেবল হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও 'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা 'সাওম' পালন করেন।[৪৩]

জিহাদের প্রতি ছিল তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ। বদর থেকে নিয়ে মূতা পর্যন্ত যত যুদ্ধ হয়েছে তার একটিতেও তিনি অনুপস্থিত থাকেননি। রিজাল শাস্ত্রবিদরা (চরিত অভিধান) বলেছেন ঃ 'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা সবার আগে যুদ্ধে বের হতেন এবং সবার শেষে ঘরে ফিরতেন।[৪৪]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আদেশ-নিষেধ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। একটি ঘটনায় এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার হযরত রাসূলে কারীম (সা) মসজিদে খুতবা (ভাষণ) দিচ্ছেন। আর ইবন রায়াহা যাচ্ছেন মসজিদের দিকে। তিনি যখন মসজিদের বাইরে রাস্তায় এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন রাসূল (সা) বলছেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে বসে পড়। এই নির্দেশ ইবন রাওয়াহার কানে যেতেই সেখানে বসে পড়েন। রাসূল (সা) খুতবা শেষ করার পর কোন এক ব্যক্তি ইবন রাওয়াহার ব্যাপারটি তাঁকে শোনান। শুনে তিনি মন্তব্য করেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের লালসা আল্লাহ তার মধ্যে আরো বৃদ্ধি করে দিন।[৪৫]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা যেমন রাসূলকে (সা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন তেমনি রাসূলও (সা) তাঁকে ভালোবাসতেন। একবার 'আবদুল্লাহ অসুখে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। রাসূল (সা) দেখতে গেলেন। তিনি দু 'আ করলেনঃ হে আল্লাহ, যদি তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসে থাকে তাহলে সহজে তার মরণ দাও, অন্যথায় তাকে ভালো করে দাও।[৪৬]

উসামা ইবন যায়দ বলেন ঃ সা'দ ইবন 'উবাদা অসুস্থ হলে রাসূল (সা) তাঁকে দেখার জন্য বের হলেন। আমাকেও বাহনের পিছনে বসিয়ে নিলেন। 'আবূদুল্লাহ ইবন উবাই তার মুযাহিম দূর্গের ছায়ায় নিজ গোত্রের আরও কিছু লোকের সাথে বসে ছিল। রাসূল (সা) মনে করলেন, কোন কথা না বলে তাদের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া শিষ্টাচারের

---

৪১. *আল-ফাতহুর রাব্বানী-২২/২৮৬, হায়াতুস সাহাবা-৩/১৫*

৪২. *আল -ইসাবা-২/৩০৭, হায়াতুস সাহাবা-৩/১৪৮।*

৪৩. *সহীহ বুখারী-১/২৬১, মুসলিম-১/৩৫৭, হায়াতুস সাহাবা-১/৪৭৯, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/২৬৫*

৪৪. *আল -ইসাবা-২/৩০৭*

৪৫. *আল ইসাবা-২/৩০৬, হায়াতুস সাহাবা-২/৩৫৬।*

৪৬. *আল-ইসাবা- ২/৩০৬*

পরিপন্থী। তাই তিনি বাহনের পিঠ থেকে নামলেন এবং সালাম দিয়ে কিছুক্ষণ বসলেন। তারপর কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে তাদের সকলকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এতক্ষণ 'আবূদুল্লাহ ইবন উবাই চুপ করে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা শেষ হলে সে বলল ঃ দেখুন, আপনার কথা সত্য হলে বাড়ীতে গিয়ে বসে থাকুন। কেউ আপনার কাছে গেলে তাকে যত পরেন শুনাবেন। এমন অবাঞ্ছিতভাবে কোন মজলিসে উপস্থিত হয়ে কাউকে বিরক্ত করবেন না। সেখানে উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে 'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও ছিলেন। তিনি গর্জে উঠলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, তার কথা কক্ষণও মানবেন না। আপনি আসবেন! আপনি আমাদের মজলিসে, ঘরে ঘরে এবং বাড়ীতে বাড়ীতে আসবেন। সেটাই পসন্দ করি। আপনার আগমনের দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, আমাদের হিদায়াত দান করেছেন।৪৭

একদিন আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কাঁদা শুরু করলেন। তাই দেখে স্ত্রীও কাঁদতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কাঁদছো কেন ? স্ত্রী বললেন ঃ তোমাকে কাঁদতে দেখে আমি কাঁদছি। তখন তিনি সূরা মরিয়াম-এর ৭১ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন, আমি এই আয়াতটি স্মরণ করে কাঁদছি। জানিনে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাব কিনা।৪৮

বিখ্যাত আনসারী সাহাবী আবূ দারদা-র ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে 'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার ভূমিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাহিলী যুগে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। 'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার ইসলাম গ্রহণের পরও আবূ দারদা মূর্তি উপাসক থেকে যান। তাঁর বাড়ীতে ছিল বিরাট এক মূর্তি। একদিন আবূ দারদা বাড়ী থেকে বের হলেন, আর ঠিক সেই সময় ভিন্ন পথ দিয়ে 'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি আবূ দারদা-র স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আবূ দারদা কোথায় ? স্ত্রী জবাব দিলেন ঃ এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন। 'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা মূর্তির ঘরে প্রবেশ করে সেখানে রক্ষিত একটি হাতুড়ী দিয়ে মূর্তিটি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেললেন। শব্দ শুনে আবূ দারদার-স্ত্রী ছুটে গেলেন। 'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কাজ শেষ করে চলে গেলেন। এ দিকে আবূ দারদা-র স্ত্রী ভয়ে মাথায় হাত দিয় কাঁদতে শুরু করলেন। আবূ দারদা ঘরে ফিরে স্ত্রীর নিকট সব কিছু শুনে প্রথমে খুব রেগে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করলেন, যদি মূর্তির কোন ক্ষমতা থাকতো তাহলে সে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হতো। এই উপলব্ধির পর তিনি 'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কে সংগে করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যান এবং ইসলামের ঘোষণা দেন।৪৯

উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্টসমূহের কারণে রাসূল (সা) তাঁর প্রশংসায় বলেছেন ঃ 'নি'মার রাজুলু 'আবূদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা'-''আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কতই না ভালো মানুষ।৫০

---

৪৭. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫৮৭, হায়াতুস সাহাবা-২/৫০৯

৪৮. হায়াতুস সাহাবা-৩/৪৫

৪৯. হায়াতু সাহাবা-১/৩৩২,৩৩৩

৫০. আল ইসাবা-২/৩০৬

কবি লাবীদ ইবন রাবী'আ (রা)

জীবন

জহিলী আরবের বিখ্যাত কবি লাবীদ-এর পিতা রাবী'আ ইবন মালিক আল-'আমিরী এবং মাতা তামির বিনত যুনবা'।[১] তামির-এর প্রথম স্বামী জায'আ ইবন খালিদ এবং তার ঔরসে পুত্র 'আমর-যিনি আরবাদ নামে প্রসিদ্ধ-এর জন্ম হয়। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী রাবী'আ ইবন মালিক। আর এই স্বামীর ঔরসে পুত্র আবু 'আকীল লাবীদ-এর জন্ম হয়। তাঁর জন্মের সনটি সঠিক ভাবে জানা না গেলেও ধারণা করা হয় যে, খ্রী. ৫৪০ থেকে ৫৪৫ সনের মধ্যবর্তী কোন এক সময় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।[২] পিতা রাবী'আ যী 'আলাক[৩] যুদ্ধে মারা যান। তখন লাবীদ একটি ছোট্ট শিশু। তিনি চাচাদের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। চাচাদের মধ্যে আবু বারা' 'আমির মুলা'ইবুল আসিন্না সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[৪] তিনি ছিলেন একজন সাহসী বীর যোদ্ধা। অপর চাচা আত-তুফায়ল ছিলেন একজন দক্ষ অশ্বারোহী। অশ্বচালনার জন্য গোটা আরবে বিখ্যাত ছিলেন। আর মু'আবিয়া ছিলেন একজন সুচিন্তার অধিকারী জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি আরববাসীর নিকট থেকে মু'আওবিয আল-হুকামা' উপাধি লাভ করেন। লাবীদের পিতা বানূ কিলাবের 'আমিরী শাখা এবং মাতা বানূ আবস-এর সন্তান।[৫]

লাবীদ খুব প্রাচুর্যের মধ্যে বেড়ে ওঠেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন উদার ও দানশীল ধনী ব্যক্তি। দানশীলতার কারণে তিনি সেই জাহিলী আরবে 'রাবী'আতুল মুকতারীন'[৬] হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৭] চাচাদের তত্ত্বাবধানেও তিনি প্রাচুর্যের মধ্যে পালিত হন। কিন্তু তাঁর জীবনে এ বিত্ত-বৈভব ও প্রাচুর্য বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। এক সময় তার গোত্র বানূ 'আমিরের দুই শাখার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। লাবীদ-এর গোত্র পরাজিত হয়। তারপর তাঁর গোত্রের সকল সদস্যকে তাদের আবাস স্থল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। প্রথমে তারা নাজদে যায়। তারপর একটু দক্ষিণে অগ্রসর

---

১. *ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, ২/৮৯.*
২. *ড, 'উমার ফাররুখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, ১/২৩১. অনেকে বলেছেন, আনুমানিক ৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে কবি লাবীদ-এর জন্ম হয়। ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে যখন আরবে ইসলাম প্রচারিত হয় তখন তাঁর বয়স প্রায় আশি বছর। (নূর উদ্দীন আহমদ, অস-সব 'উল মু'আল্লাকত' ১৪২.*
৩. *যী 'আলাক' যুদ্ধটি হয় 'শি'আবু জাবালা' যুদ্ধের পূর্বে ('উমার ফাররুখ, ১/২৩১).*
৪. *জাহিলী কবি আওস ইবন হাজার-এর একটি পংক্তিতে তাঁকে 'মুলা'ইবুল আসিন্না' বলে উল্লেখ করায় তিনি এ নামে খ্যাত হন। (আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা', ১২৪.*
৫. *শাওকী দায়ফ, ২/৮৯*
৬. *'আল-মুকতার' অর্থ এমন অভাবী মানুষ যে তার উপার্জন দ্বারা নিজের প্রয়োজনের অতি সামান্য পূরণ করতে পারে। সুতরাং 'রাবী 'আতুল মুকতারীণ' অর্থ অভাবী মানুষদের রাবী'আ।*
৭. *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা', ১২৩.*

হয়ে ইয়ামনের একটি উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে।[৮] বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায়, কিছুকাল তারা দেশান্তরিত থাকার পর আবার তাদের পূর্বের আবাস ভূমিতে ফিরে আসে। এরপর লাবীদ হীরা অধিপতি আন-নু'মান ইবন আল-মুনযির আবূ কাবূসের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এই আন-নু'মান ৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে হীরার সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৯]

লাবীদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ইসলামী সময়কাল। নবী মুহাম্মাদ (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার পর ইসলাম আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। লাবীদের গোত্রেও তার ছোঁয়া লাগে। এক পর্যায়ে তাঁর চাচা আবূ বারা' তাঁকে একটি পত্রসহ মদীনায় মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট পাঠান।[১০] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর অন্তরে ঈমান দৃঢ়মূল হয়ে যায়। তবে তিনি সেখানে ঈমানের ঘোষণা না দিয়ে নিজ গোত্রে ফিরে যান। পরবর্তী বছর তাঁর গোত্রের আরেকটি প্রতিনিধি দলের সাথে তিনি আবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসেন। এবার এই দলের সবার সাথে ইসলামের ঘোষণা দেন।

ইতিপূর্বে হিজরী ৮ম সনে জুমাদা আল-আখিরা (অক্টোবর ৬২৯) মাসে তাঁর চাচাতো ভাই 'আমির ইবন আত-তুফায়ল ও বৈপিত্রেয় ভাই আরবাদ একটি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যায়। আল্লাহ তাদের অনিষ্ট থেকে তাঁর রাসূলকে রক্ষা করেন। রাসূল (সা) তাদের প্রতি বদ দু'আ করেন। তারা মদীনা থেকে স্বগোত্রে ফেরার পথে 'আমির তা'উন নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। আর আরবাদ বজ্রাঘাতে নিহত হয়। মতান্তরে কুকুর অথবা নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে।[১১]

হযরত লাবীদ (রা) মদীনায় ইসলামের ঘোষণা দিয়ে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর আবার স্বগোত্রের আবাস ভূমিতে ফিরে যান। কোন কোন লেখকের ধারণা তিনি তাঁর ইসলামী জীবনের প্রথম পর্বে ভালো মুসলমান হতে পারেননি। মুসলিম ইতিহাস বেত্তাগণ তাঁকে 'আল-মুআল্লাফাতু কুলূবুহুম'[১২] এর মধ্যে গণ্য করেছেন।[১৩] কিন্তু এর বিপরীতে এমন সব বর্ণনা পাওয়া যায় যা দ্বারা প্রমাণ হয়, তিনি একজন নিষ্ঠাবান

---

৮. 'উমার ফাররুখ, ১/২৩১.

৯. প্রাগুক্ত

১০. কিতাবুল আগানী, ১৫/১২১

১১. বুলূগ আল-আরিব,২/১৩০; আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা', ১২৪

১২. যে সকল অমুসলিমকে ইসলামের প্রতি নমনীয় ও আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে অথবা যে সকল নও-মুসলিমকে ইসলামের উপর সুদৃঢ় ও অটল করার উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ সম্পদ দেয়া হয় তাদেরকে 'আল-মুআল্লাফাতু কুলূবুহুম' বলা হয়। (দ্রষ্টব্য: আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর.১/৩৭২

১৩. আল-কুরতুবী, আল-ইসতী'আব, টীকা: আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা' ৩/৩২৭

মুসলমান হতে পেরেছিলেন। ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী (হি.২৩১/খ্রী. ৮৪৬) বলেছেন, 'তিনি ছিলেন একজন মুসলমান, সত্যের অনুসারী ব্যক্তি।'[১৪] তবে ইবন হিশাম (হি.২১৮/খ্রী. ৮৩৮)-এর বর্ণনায় জানা যায়, হুনায়ন যুদ্ধের গনীমতের মাল রাসূল (স:) আরবের বিভিন্ন গোত্রের নওমুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করেন। তিনি তাঁদের একটা তালিকাও তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত লাবীদ (রা)-এর নামটিও আছে।[১৫] তবে এ সব অর্থ-সম্পদ কেউ লাভ করলেই যে তিনি খাঁটি মুসলমান হতে পারবেন না, এমন কথা বাস্তবতার পরিপন্থী।

খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফত কালে হি. ১৪/খ্রী. ৬৩৫ সনে বসরা ও কূফা শহর দুইটির পত্তন হলে লাবীদ (রা) কূফায় চলে যান এবং সেখানে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন। কূফার দিওয়ানে নিজের নাম অন্তর্ভূক্ত করেন। তাঁর বাৎসরিক ভাতা নির্ধারিত হয় দুই হাজার দিরহাম। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই নগরীতে বসবাস করেন এবং এখানেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। বানূ জা'ফার ইবন কিলাবের মরু ভূমিতে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৬] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা আবার মরুভূমির বেদুঈন জীবনে ফিরে যায়।

হযরত লাবীদ (রা)-এর জন্ম সনের মত মৃত্যুর সন এবং তিনি কত বছর জীবন লাভ করেন, সে ব্যাপারে দারুণ মতবিরোধ দেখা যায়। অনেকে বলেছেন, তিনি হিজরী ৩৫,মতান্তরে ৩৮ (খ্রী. ৬৬৫-৬৬৯) সনে ইনতিকাল করেন।[১৭] ইবন সা'দ বলেছেন, মু'আবিয়া (রা) যে দিন হাসান ইবন 'আলী (রা)-এর সাথে আপোষ মীমাংসার জন্য 'নুখায়লা' যান, সেই রাতে লাবীদ (রা) মারা যান।[১৮] ইবন কুতায়বা (হি.২৭৬/খ্রী. ৮৮৯) বলেছেন, তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফতকালে ১৫৭ বছর বয়সে মারা যান।[১৯] তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা প্রমাণ করে যে, তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইবন দুরায়দ (হি. ৩২১/ খ্রী.৯৩৩)-এর মতে তিনি ১৪৫ বছর জীবন লাভ করেন। তার মধ্যে ৯০ বছর জাহিলী এবং ৫৫ বছর ইসলামী যুগে।[২০] এভাবে ১৩০ ও ১২০ বছরের কথাও বর্ণিত হয়েছে।[২১] তাঁর জীবন কাল নিয়ে

---

১৪. তাবাকাত আশ-শু'আরা', ৪৯

১৫. ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন আন-নাবাবিয়্যা, ২/৪৯৪,৪৯৫

১৬. আত-তাবাকাত আল-কুবরা, ৬/৩৩

১৭. 'উমার ফাররূখ ১/২৩২

১৮. তাবাকাত, ৬/৩৩

১৯. আশ-'শি'রু ওয়াশ-শুআরা'-১২৩

২০. বুলূগ আল-আরিব, ৩/১৩২; জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগা আল-'আরাবিয়্যা, ১/১১৭

২১. বুলূগ আল-আরিব, ৩/১৩০

মত পার্থক্য থাকলেও তিনি যে একজন দীর্ঘজীবী মানুষ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।আর তা জাহিলী ও ইসলামী দুই যুগে বিভক্ত ছিল।

কাব্য প্রতিভা

পিতৃহারা লাবীদ একটু বড় হয়ে তাঁর গোত্র ও পরিবারের সম্মান, গৌরব ও খ্যাতি গভীর ভাবে উপলব্ধি করতেন। যৌবনের সূচনাতেই তিনি স্বীয় গোত্রের বিভিন্ন যুদ্ধে, আক্রমণে ও হীরার রাজাদের নিকট গোত্রের বিভিন্ন প্রতিনিধিদলে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁর তরুণ বয়সে একবার তাঁর চাচা আবু বারা'-এর নেতৃত্বে গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল হীরার রাজা আন-নু'মান ইবন আল-মুনযিরের নিকট যায়। এই দলটির সাথে তিনিও ছিলেন। সেখানে তারা আর-রাবী' ইবন যিয়াদের নেতৃত্বে বানূ 'আবসের একটি প্রতিনিধি দলকে আগেই উপস্থিত দেখতে পায়। বানূ 'আবস ও লাবীদ-এর গোত্র বানূ 'আমিরের মধ্যে পূর্ব-শত্রুতা ছিল। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গোত্রের লোকেরা একত্র হতেই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর-রাবী' বানূ 'আমিরের বিরুদ্ধে গোপনে আন-নু'মানের নিকট কিছু কান কথা লাগায়। লাবীদ তা জানতে পেরে ভীষণ ক্ষেপে যান। তিনি আন-নু'মানের উপস্থিতিতে বানূ'আব্সের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ভাষণ দান করেন এবং তাদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপমূলক রাজায ছন্দের একটি কবিতা শুনিয়ে দেন। তরুণ লাবীদের এমন কাব্য-প্রতিভায় আন-নু'মান মুগ্ধ হন। তিনি আর-রাবী'র পক্ষ থেকে সরে এসে 'আমিরীদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং তাদেরকে যথেষ্ট সমাদর করেন।২২

বাল্যকালেই কাব্য-প্রতিভার দীপ্তি তাঁর চোখে-মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বর্ণিত আছে, একবার বাল্যকালে তিনি চাচাদের সাথে হীরার রাজ দরবারে যান। সেখানে তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি আন-নাবিগা আয-যুবয়ানী তাঁকে দেখেই তাঁর মধ্যে কাব্য-প্রতিভার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেন। তিনি লাবীদ-এর পরিচয় জানতে চান। তারপর বলেন: বালক, তোমার চোখ দুইটি তো কবির চোখ। তুমি কি একটু কাব্য চর্চা কর? লাবীদ বললেন: হাঁ, চাচা! তা একটু করে থাকি। নাবিগা বললেন: তা আমাকে কিছু শ্লোক শোনাওতো। লাবীদ তাঁকে কিছু শ্লোক শোনালেন। আন-নাবিগা বললেন: তুমি বানূ 'আমিরের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হবে। তুমি আমাকে আরো কিছু শ্লোক শোনাও। তিনি শোনালেন। তখন কবি আন-নাবিগা লাবীদ-এর কপালে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলেন: যাও, তুমি গোটা কায়স গোত্রের শ্রেষ্ঠ কবি হবে।২৩

উল্লেখিত বর্ণনা দুইটি সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, একথা সঠিক যে, কবি লাবীদ-এর জিহ্বা থেকে যে দিন কবিতার প্রস্রবণ বইতে আরম্ভ করে সে দিন থেকেই স্বগোত্রের যা কিছু গর্ব, গৌরব ও সম্মান ছিল তা কবিতার মাধ্যমে সবার সামনে তুলে

---

২২. আল-আগানী, ১৪/৯১: জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব, ১/৬৭-৬৮
২৩. জুরজী যায়দান, ১/১০৭

ধরার প্রতি তিনি সীমাহীন গুরুত্ব দিয়েছেন। একথা বলা হয়েছে যে, প্রথম প্রথম তিনি তাঁর কাব্য চর্চার বিষয়টি গোপন রাখতেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁর বিখ্যাত 'মু'আল্লাকা'[২৪] কাসীদাটি রচনা করলেন তখন তা আর গোপন থাকলো না। আরবের সকল গোত্রে তাঁর নামটি ছড়িয়ে পড়লো।[২৫]

জাহেলী কবিদের মধ্যে লাবীদ 'আল-মু'আল্লাকাত' কবিদের অন্তর্ভূক্ত। তাঁকে সপ্ত মু'আল্লাকার কবিদের মধ্যে গণনা করা হয়েছে।[২৬] জাহেলী যুগেই তিনি কবি হিসেবে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তখন তাঁর প্রতিষ্ঠা মূলত ভদ্রোচিত ও মার্জিত 'মু'আল্লাকা' নির্ভর হলেও তিনি আরো বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেছিলেন। ফলে সেই প্রাক-ইসলামী আরবী কাব্য জগতে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত ও স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বেদুঈন আরব সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা-ভব্যতার ধারক ও বাহকরূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি কাসীদা ও রাজায-উভয় ধরনের কবিতা রচনা করেছেন। তিনি একজন ভালো খতীবও ছিলেন।[২৭] তাই তিনি চাচাতো ভাই 'আমির ইবন আত-তুফায়লের সাথে এক যোগে 'আলকামা ইবন 'উলাছার বিরুদ্ধে হারিম ইবন কুতবা আল-ফাযারীর সামনে মুফাখারা বা পারস্পরিক গর্ব ও অহঙ্কার প্রকাশ মূলক খুতবা দানের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন।[২৮]

হযরত লাবীদ (রা) ইসলাম গ্রহণের পর কুরআন তিলাওয়াত ও তা বুঝার প্রতি মনোনিবেশ করেন। বর্ণিত হয়েছে যে, কাব্যচর্চা প্রায় এক রকম ছেড়েই দেন। জাহিলী যুগের তুলনায় এ যুগে খুব কম কবিতা রচনা করেছেন। কুরআন মাজীদের অতুলনীয় ভাষা এবং এর অপূর্ব আলঙ্কারিক সৌন্দর্য ও প্রকাশ শৈলী কবিকে এমন মুগ্ধ ও মোহিত করে যে, কাব্য চর্চার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন। বর্ণিত হয়েছে, তখন একবার তাঁর এভাবে কাব্য চর্চা ত্যাগ করার কারণ জানতে চাইলে বলেন-'কবিতার পরিবর্তে আল্লাহ্

---

২৪. মু'আল্লাকাত (এক বচনে মু'আল্লাকা) নামে পরিচিত গীতি কবিতাগুলো আরবী সাহিত্য জগতে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মু'আল্লাকাহ্ শব্দটি আরবী 'ইলক্ ধাতু থেকে নির্গত। 'ইলক্ অর্থ মূল্যবান বস্তু, প্রতিটি বস্তুর সুন্দর অংশ। ক্রিয়াপদে এর অর্থ ঝুলানো; রূপক অর্থে সেই দামী বস্তু যা লাভের তীব্র বাসনা জাগে, যেহেতু সেটি বিশিষ্ট স্থানে ঝুলানো আছে। এ কবিতাগুলো সকলের নিকট সমাদৃত বলে এবং পবিত্র কা'বা গৃহে ঝুলানো হয়েছিল বলে এগুলোর নাম মু'আল্লাকা। কথিত আছে যে, এ গুলোকে দামী মিসরীয় বস্ত্রে সোনালী অক্ষরে লিখে কা'বা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। (আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৪৮-৪৯)

২৫. শাওকী দায়ফ, ২/৯০

২৬. শারহুল কাসাইদ আস-সাব'ই আত-তিওয়াল আল-জাহিলিয়্যাত, ৫১৭,৫৯৭

২৭. আল-জাহিজ 'আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ৪/৮৪: 'উমার ফাররুখ. ১/২৩২

২৮. আল-আগানী, ১৫/৫২

আমাদেরকে আল-কুরআন দান করেছেন।'২৯ শেষ জীবনে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত করেন।৩০

তাঁর কূফা অবস্থান কালে একবার খলীফা 'উমার (রা) তৎকালীন কূফার ওয়ালী মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-কে লেখেন, 'তোমার শহরের কবিরা ইসলাম সম্পর্কে কি বলে তা জানার জন্য তাদের কিছু কবিতা পাঠাও।' মুগীরা (রা) লাবীদের (রা) নিকট তাঁর কিছু কবিতা চাইলেন। লাবীদ (রা) একটি পুস্তিকার আকারে সূরা আল-বাকারা ও সূরা আলে 'ইমরান লিখে মুগীরার (রা) হাতে দিয়ে বলেন; 'ইসলামে আল্লাহ্ আমাকে কবিতার পরিবর্তে এটা দিয়েছেন।' মুগীরা (রা) লাবীদের (রা) এ মন্তব্য ও চিন্তার কথা খলীফা 'উমারকে (রা) লিখে জানালেন। 'উমার (রা) লাবীদের (রা) ভাতা পূর্বে নির্ধারিত দুই হাজারের উপর পাঁচ শো বাড়িয়ে আড়াই হাজার দিরহাম করেন।৩১

হযরত লাবীদের (রা) জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে একবার হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, আপনার ভাতা তো দুই হাজার। অতিরিক্ত এ পাঁচ শো দিরহাম কেন? তিনি পাঁচ শো কমিয়ে দিতে চাইলেন। লাবীদ (রা) বললেন, আমি এখনই মারা যাব। আপনার এ ভাতা ও অতিরিক্ত পাঁচ শো সবই তখন পড়ে থাকবে। একথা শুনে মু'আবিয়া (রা) তাঁর প্রতি সদয় হন এবং ভাতা পূর্বের মত বহাল রাখেন। এর অল্প কিছু দিন পর লাবীদ (রা) মারা যান।৩২

কাব্য প্রতিভার মূল্যায়ন

হযরত লাবীদ (রা) ছিলেন একজন 'মুখাদরাম' কবি। যাঁরা জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ লাভ করেছেন তাঁদেরকেই বলা হয় 'মুখাদরাম'। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ইতিহাসের এ দীর্ঘ সময়ে তাঁর কবিতার নানা ভাবে মূল্যায়ন হয়েছে। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তাগণ হযরত লাবীদের (রা) কাব্য জীবনকে ইসলামী ও জাহিলী-এ দু' ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর ইসলামী যুগে কাব্য চর্চার ব্যাপারে তাঁরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। একদলের ধারণা, তিনি ইসলামী জীবনে কোন কবিতা রচনা করেননি। অন্যদলের মতে, ইসলামী জীবনে তাঁর কাব্য চর্চার ধারা পূর্বের মত অব্যাহত ছিল। এ সময়ে রচিত তাঁর কবিতা প্রচুর।৩৩ মরণ কালে তিনি তাঁর দুই কন্যাকে লক্ষ্য করে

---

২৯. *তাবাকাত, ৬/৩৩*
৩০. *কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা, ১৮২*
৩১. *তাবাকাত আশ-শু'আরা', ৪৯: আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা, ২/৩২৬*
৩২. *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা', ১২৪; বুলুগ আল-আরিব, ৩/১৩২*
৩৩. *'উমার ফারূক, ১/২৩২*

অনেক শ্লোক রচনা করেছেন, বিভিন্ন গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে।[৩৪]

আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সূত্র সমূহ এ ব্যাপারে একমত যে, লাবীদ ইসলামী জীবনে কাব্য চর্চা করুন বা না করুন, নিম্নের চরণটি কিন্তু রচনা করেছেন।[৩৫]

الحمد لله إذا لم يأتني أجلي. # حتى اكتسيت في الاسلام سربالا.

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কারণ, ইসলামী জীবনের পরিচ্ছদ না পরা পর্যন্ত আমার মৃত্যু আসেনি।'

বর্ণনাকারীগণ কবি লাবীদের এমন কিছু দ্বিপদী চরণ বর্ণনা করেছেন যা তিনি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে রচনা করেছেন। যেমন, নীচের চরণ দুটি তিনি সাতাত্তর বছর বয়সে রচনা করেছেন:[৩৬]

قامت تشكى إلى النفس مجهشة. # وقد حملتك سبعابعد سبعينا

فإن تزادى ثلاثا تبلغى أملا. # وفى الثلاث وفاء للثمانينا.

'আমার অন্তর কান্নাজড়িত কণ্ঠে আমার নিকট অভিযোগ করলো, অথচ আমি তোমাকে সাতাত্তরটি বছর বহন করে চলেছি। যদি তিনটি বছর বাড়িয়ে নাও, তাহলে তুমি তোমার উদ্দেশ্যে পৌঁছে যাবে। আর এ তিন বছরে আশি পূর্ণ হবে।'

এভাবে তিনি নববই, একশো ও একশো বছরের অধিক বয়সে পৌঁছার পর অনেক চরণ রচনা করেছেন। নীচের চরণটি তিনি এক শো বিশ বছর বয়সে রচনা করেছেন।[৩৭]

ولقد سئمت من الحياة وطولها. # وسؤال هذا الناس :كيف لبيد؟

'আমি জীবন ও জীবনের দীর্ঘতায় বিরক্ত হয়ে পড়েছি। আর বিরক্ত হয়ে পড়েছি মানুষের এই প্রশ্নে-'লাবীদ কেমন আছ'?

কবি লাবীদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থায় রচিত একটি কাসীদায় ভ্রাতুস্পুত্রকে কি ভাবে কাফন-দাফন করতে হবে সে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন।[৩৮] উক্ত কাসীদার একটি চরণ নিম্নরূপ:

وإذا دفنت أباك فاجـ # ـعل فوقه خشبا وطينا

'যখন তোমার বাবার দাফন করবে তখন তাঁর কবরের উপর শুকনো কাঠ ও মাটি দেবে।'

---

৩৪. বুলূগ আর-আরিব, ৩/১৩২

৩৫. প্রাগুক্ত; আল-ইসাবা, ৩/৩২৫, অবশ্য পংক্তিটির ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে। কোন কোন গ্রন্থে অন্য একটি পংক্তি বর্ণিত হয়েছে।(আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা', ১২৩; আল-আগানী, ১৫/৩৬৯)

৩৬. আল-আগানী, ১৪/৯৪

৩৭. আল-ইসতী'আব, ৩/৩২৮

৩৮. সীরাতু ইবন হিশাম, ১/২৪৩-২৪৪,৩৬৬; আশ-শি'রু ওয়াশ-শু'আরা, ১২৪-১২৭

উল্লেখ্য যে, আরববাসীরা চাচাকে বাবার মতই মনে করে। তাই এখানেও বাবা বলা হয়েছে।

এই কাসীদায় তিনি তার দুই কন্যাকে অনেক উপদেশ দান করেছেন। এ পৃথিবীর সকল সন্তানই চায় তাদের পিতা-মাতা চিরকালই বেঁচে থাকুন। কবি লাবীদের কন্যাদ্বয়ও তাই চাইতেন। কবি সে কথা বলেছেন। কবির মৃত্যুর পর তাঁর কন্যাদের কি করতে হবে সেকথাও তিনি বলে গেছেন। উক্ত কাসীদার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ:

تمنى ابناتى أن يعيش أبوهما # وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر
فقوما وقولا بالذى تعلمناه # ولا تخشما وجهاولا تحلقا شعر
وقولا: هو المرأ لا صديقه # أضاع ولا خان الأمين ولا غدر

'আমার কন্যা দুইটি আশা করেছে তাদের পিতা যেন চিরকাল বেঁচে থাকেন। কিন্তু আমি তো রাবী'আ অথবা মুদার গোত্রের অন্যদের মত একজন সদস্য ছাড়া আর কিছু নই। সুতরাং তোমরা উঠে দাঁড়িয়ে সেই কথা বল যা তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর নাক-মুখ ক্ষত বিক্ষত করবেনা এবং মাথার কেশও মুড়ে ফেলবে না। আর তোমরা দুইজন একথা বলেবে যে, তিনি এমন মানুষ ছিলেন যিনি তাঁর কোন বন্ধুর ক্ষতি করেননি, কোন মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ করেননি, প্রতারণা করেননি।'

যাই হোক না কেন, লাবীদের (রা) কবি স্বভাবের স্ফুরণ ঘটেছিল তাঁর জাহিলী জীবনে। আর ইসলামী যুগে রচিত তাঁর কবিতা, যদিও তার সংখ্যা একেবারে নগন্য নয়, তৎকালীন প্রচলিত ও নন্দিত রীতি-পদ্ধতিতে চলেনি। এর পশ্চাতে অনেকগুলো অস্থায়ী কারণও কাজ করতে পারে। তিনি কোন সময় কাব্য চর্চা দ্বারা অর্থ উপার্জন করতেন না, গর্ব-অহংকার করতেন না। ইসলামী জীবনে তিনি কবি হাসসান ইবন ছাবিত, 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও কা'ব ইবন মালিক (রা)-এর মত তাঁর কাব্য শক্তিকে ইসলামী দা'ওয়াতের কাজে পুরোপুরি ব্যবহার করেননি। আর সেই কারণে অনেক সমালোচক তাঁকে জাহিলী কবিদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৩৯]

তবে এটাই সত্য যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের সকল আরব কবির কাব্য চর্চায় সাময়িক ভাবে কিছুটা হলেও ভাটা পড়েছিল। তার কারণ ছিল নতুন দীন,তার দাওয়াত, ওয়াহী, আল-কুরআনের অননুকরণীয় বাণী-এ সব কিছু তাঁদেরকে মোহিত ও মুগ্ধ করে ফেলেছিল। এ রকম কথাই বলেছেন ইবন খালদূন।[৪০] তা নাহলে কুরআন কিন্তু কাব্য চর্চা নিষিদ্ধ করেনি। তাই ইসলামের প্রথম পর্বে কাব্য চর্চা কিছু কমে গেলেও একেবারে কিন্তু থেমে যায়নি। যদি থেমেই যেত তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়কালের কোন

---

৩৯. *'উমার ফাররুখ, ১/২৩৩*
৪০. *ইবন খালদূন, আল-মুকাদ্দিমা, ৪৩৭*

কবির কবিতা পাওয়া যেতনা। কিন্তু তাঁদের অনেকের অনেক কবিতা পাওয়া যায়। ইসলাম গ্রহণের পর যাঁরা খুব কম কবিতা রচনা করেছেন কবি লাবীদ (রা) তাঁদের একজন।৪১

কবি লাবীদ (রা) তাঁর জাহিলী ও ইসলামী জীবনে অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু তার সামান্য অংশই বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা)-এর কবি লাবীদের এক হাজার চরণ মুখস্ত ছিল এবং তিনি তা বর্ণনা করেছেন বলে দাবী করেছেন।৪২

তাঁর জাহিলী যুগের কবিতা পাঠ করলে দেখা যায়, সব সময় তিনি তাঁর গোত্রকে নিয়ে গর্ব করেছেন, তাদের বীরত্বের কথা বলেছেন, বিভিন্ন যুদ্ধে তাদের কঠিন পরীক্ষার কথা তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া তাদের আরো বহু গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা উচ্চ কণ্ঠে বলেছেন। এরপর তিনি যখন নিজের কথা বলেছেন, তখন একান্তই নিজের বৈশিষ্ট্যের কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। রাতে বন্ধুদের সাথে কেমন ভ্রমণ করেছেন, কেমন করে আক্রমণ পরিচালনা করেছেন, কেমন করে বন্ধুদের শরাব পান করিয়েছেন এবং কিভাবে বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত মানুষদেরকে আহার করানোর জন্য উট জবাই করেছেন, সেসব কথা খুব বলিষ্ঠ ভাবে গর্বের সাথে বলেছেন। তার বহু কাসীদায় বার বার এ সব কথা এসেছে।৪৩ এসব কথা বলার পূর্বে তিনি একটি ভূমিকার অবতারণা করেছেন।

যেমনটি তাঁর মু'আল্লাকা' কাসীদায় দেখা যায়। তিনি এ বিখ্যাত কাসীদাটি শুরু করেছেন প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার ধ্বংসাবশেষ ও প্রস্থানকারী প্রিয়জনদের প্রস্থানের দৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে। তারপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করে দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি অতিক্রম করার বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে তিনি মাদি গাধা ও বন্য গাভীর সাথে তাঁর উষ্ট্রীর উপমা দিয়েছেন। এ ভাবে উষ্ট্রী ও গাধীর একটু দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তার উষ্ট্রীর বর্ণনা শেষ করেছেন, সন্তান হারানোর ভয়ে ভীত-চকিত বন্য গাভীর সাথে তার একটি সুন্দর ও সার্থক উপমা দিয়ে। তীর হাতে শিকারীদের এই বন্য গাভীর দলের পিছু ধাওয়া করা এবং তাদের প্রতি শিকারী কুকুর লেলিয়ে দেয়ার কথাও বলেছেন। সবশেষে তিনি নিজের দানশীলতা, সাহস, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া এবং স্বীয় গোত্রের গৌরব এবং তাদের মধ্যে নেতার সংখ্যাধিক্যের কথা বলে গর্ব প্রকাশ করেছেন।

যেমন তিনি বলেছেন,

---

৪১. আদাবুদ দা'ওয়াতি আল-ইসলামিয়্যা, ২১
৪২. আনসাবুল আশরাফ, ১/৪১৬
৪৩. তাবাকাত আশ-শু'আরা, ৪৯

إنا إذا التقت المجامع لم يزل # منا لزاز عظيمة جسامها

ومقسم يعطى العشيرة حقها # ومغذمر لحوقها هضامها

فضلا، وذوكرم يعين على الندى # سمح كسوب رغائب غنامها

من معشر سنت لهم آباؤهم # ولكل قوم سنة وإمامها

فبنوا لنا بيتا رفيعا سمكه # فسما إليه كهلها وغلامها

গোত্রেরা সব সম্মিলিত
হত যদিই কোন কাজে,
মোদের কেহ থাকতো সেথায়
সবার আগে তাদের মাঝে।
ভাগ বাঁটারা তাঁরই হাতে
গোত্রগণের অংশ সবার,
নিজের থেকে ছাটিয়ে নিয়ে
পরকে দিবার তার অধিকার।
এমনি মহৎ মোদের কুলে
উদার হৃদয় পরের হিতে,
বিত্তশালী উচ্চ হৃদয়
উৎসাহী ধন লুটিয়ে দিতে।
পিতৃ পিতামহ থেকে
আসছে চলে এ সুনীতি,
'কওম'-গুলির রইছে ইমাম
রইছে সবার আপন রীতি।
মান মহিমার সৌধ মোদের
খোদার আপন হাতেই গড়া,
তাইতো মোদের বৃদ্ধ যুবক
মান-মহিমার শীর্ষে চড়া।[৪৪]

তিনি তাঁর কবিতায় মরু প্রকৃতির দৃশ্যাবলী চিত্রিত করতে গিয়ে মেঘ, বজ্র ও বর্ষণের বর্ণনা দিয়েছেন। এসব বর্ণনায় তিনি অপরিচিত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহারের জন্য বিশিষ্ট

---

৪৪. নূর উদ্দীন আহমাদ, ১৬৪-১৬৫

হয়ে উঠেছেন। অনেক সময় পাঠকের নিকট এ সব বর্ণনা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। এ কারণে আবূ 'আমর ইবন আল-'আলা' (হি.১৫৪/খ্রী. ৭৭১) তাঁর কবিতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'এ যেন শস্যদানা ভাঙ্গার যাতা'।[৪৫] এ কথা দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর কবিতা অতি কাঠখোট্টা ও নীরস ধরনের যা মোটেও শ্রুতিমধুর নয়। আল-আসমা'ঈ (হি. ২১৬/খ্রী. ৮৩১) বলেছেন, 'লাবীদের কবিতা, তা যেন তাবারিস্তানের চাদর'।[৪৬] অর্থাৎ তার গাঁথুনি তো শক্ত, কিন্তু তাতে চাকচিক্য নেই।

তাঁর ইসলামী জীবনে 'মু'আলাকা' জাতীয় প্রেম-গীতিকা অথবা অন্য কোন ভাবালুতা প্রধান কাব্য লেখার বয়স, মন ও স্বাস্থ্য ছিলনা। চিন্তাধারা পরিবর্তনের সাথে তাঁর কবিতার ভাব ও বিষয়ও পরিবর্তিত হয়েছিল। তাই এ সময়ে তিনি যে কবিতা রচনা করেছেন তাতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও নৈতিক প্রেরণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা যখন তাঁর জাহিলী কবিতা ছেড়ে ইসলামী কবিতায় যাই তখন দেখতে পাই, কুরআন অধ্যয়ন তাঁর শব্দ চয়নকে পরিশীলিত করেছে এবং তা যতখানি মাধুর্য্যমণ্ডিত করে তুলেছে তা একেবারে নগন্য নয়। আর তাই ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী বলেছেন, 'তিনি মিষ্টভাষী, তাঁর কথার আঁচল বেশ সুক্ষ্ম। তিনি একজন মুসলমান, সত্য ভাষী মানুষ।'[৪৭] এ কথা স্পষ্ট সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর ভাই 'আরবাদ'-এর স্মরণে রচিত মরছিয়াগুলোতে। এর শব্দ সমূহে একটা দীপ্তি ও ঝলক দেখা যায় এবং ইসলামী ভাবের একটা প্রলেপ ও প্রচ্ছায়া লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে উদ্ধৃত তাঁর এ জাতীয় শ্লোকে ইসলামী ভাবধারা বিধৃত হয়েছে।[৪৮]

بلينا وما تبلى النجوم الطوالع # وتبقى الجبال بعدنا والمصانع

فلا جزع إن فرق الدهر بيننا # وكل فتى يوما به الدهر فاجع

وما الناس إلا كالديار وأهلها # بهايوم حلوها وغدا بلاقع

ومالمرأ الاكالشهاب وضوئه # يحور رمادا بعد إذ هوساطع

وما البر إلا مضمرات من التقى # وما المال إلا عاريات ودائع

'আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু উদীয়মান নক্ষত্ররাজি ধ্বংস হবে না। আমাদের পরে পর্বতমালা ও বিশালাকৃতির অট্টালিকা সমূহ বিদ্যমান থাকবে। কালচক্র যদি আমাদেরকে পৃথক করে দেয় তাহলে আমরা উৎকণ্ঠিত ও অস্থির হব না। কারণ, প্রত্যেকটি যুবকের দ্বারা কালচক্র একদিন দুর্বিপাকে পড়বে। মানুষ তো সেই আবাসস্থল

---

৪৫. আলা-মারযুবানী, আল-মুওয়াশ্শাহ ১/৭১

৪৬. ড. শাওকী দায়ফ ২/৯২

৪৭. তাবাকাত আশ-শু'আরা, ৪৮

৪৮. শাওকী দায়ফ, ২/ ৯২, ড. 'উমার ফাররুখ, ১/২৩৬

ও তার অধিবাসীদের মত ছাড়া আর কিছু নয়, যেখানে আজ তারা অবতরণ করছে এবং আগামী কাল তা আবার বিরান ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। মানুষ সেই অগ্নিশিখা ও তার আলোর মত ছাড়া আর কিছু নয় যা জ্বলে উঠার পর ছাইয়ে পরিণত হয়। সততা ও ন্যায় পরায়ণতা তাকওয়া-খোদাভীতির গোপন রহস্য ছাড়া আর কিছু নয়। আর ধন-সম্পদ গচ্ছিত বন্ধকী বস্তু ছাড়া অন্য কিছু নয়।'

তাঁর ইসলামী কবিতায় যে পরিবর্তন ঘটে তার সবটুকু এই নয় যে, তিনি দুর্বোধ্য, জটিল ও অপরিচিত শব্দ ব্যবহার পরিহার করে কেবল সহজ-সরল, সাবলীল ও সর্বজন পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে চিত্রকল্প তৈরী করেছেন, বরং ইসলাম তাঁর কবিতার প্রাণ সত্ত্বার গভীরে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং তিনি তাঁর কবিতায় স্বীয় প্রভূর প্রতি একাগ্রতা প্রকাশ করতে থাকেন। শেষ বিচার দিবস, যার প্রতীক্ষা তিনি সব সময় করতেন, তার যে ভীতি অন্তরে পোষণ করতেন, তা কবিতায় ব্যক্ত করতেন। একটি কাসীদায় তিনি বলেন,[৪৯]

إنما يحفظ التقى الأبرار # وإلى الله يستقر القرار
وإلى الله ترجعون وعند اللـ # ـه ورد الأمور والإصدار
كل شئ أحصى كتاباوعلما # ولديه تجلت الأسرار
إن يكن فى الحياة خير فقد أنـ # ـظرت لو كان ينفع الإنظار
عشت دهرا ولايدوم على الآيـ # ـام إلا يرمرم وتعار

'ভালো মানুষেরাই খোদাভীতি সংরক্ষণ করে। আর সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহর কাছেই স্থির থাকে। আল্লাহর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে এবং আল্লাহর কাছেই সকল বিষয়ের উৎস ও প্রত্যাবর্তন স্থল। প্রতিটি বিষয় ও বস্তু জ্ঞান ও গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ করা হয় এবং তাঁর কাছেই সকল রহস্য স্পষ্ট হয়ে যায়। জীবনে যদি কোন মঙ্গল থেকে থাকে, তাহলে আমাকে দীর্ঘ জীবন দিয়ে সে সুযোগ দেয়া হয়েছে। যদি সে সুযোগে আমার কোন উপকার হয়। আমি একটি দীর্ঘ সময় জীবন ধারণ করেছি। কালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে য়ারামরাম ও তি'আর[৫০] ছাড়া আর কেউ চিরকাল থাকেনা।'

উল্লেখিত কাসীদায় তিনি তাকওয়া, সত্যনিষ্ঠ মানুষ, শেষ বিচার দিনে মানুষের আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া, প্রতিটি বিষয় আল্লাহর জ্ঞান ও গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হওয়া, মৃত্যু অবধারিত, মানুষের তার পরিণাম সম্পর্কে ভাবা উচিত ইত্যাদি বিষয় অতি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। অনেকগুলো শ্লোকে-যার সংখ্যা একেবারে কম নয়, পৃথিবীর অতীত

---

৪৯. আল-জাহিজ, কিতাবুল হায়ওয়ান, ৭/১৬৩
৫০. য়ারামরাম ও তি'আর নাজদের দুইটি পাহাড়ের নাম।

জাতিসমূহ, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন, তাদের কথা স্মরণ করে দিয়ে তিনি তাঁর আশে-পাশের মানুষকে মৃত্যু, বিচার দিবস ইত্যাদি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সাথে সাথে তাকওয়া ও সৎকাজের প্রতি যেমন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তেমনি এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন ও তার স্বল্পকালীন ভোগ-বিলাসকে অতি তুচ্ছ ও হেয় করে দেখিয়েছেন। যেমন আমরা দেখতে পাই তাঁর লাম অন্ত্যমিলের কাসীদায়। ভাব ও বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, কাসীদাটি তিনি ইসলামী জীবনে রচনা করেছিলেন।৫১ উক্ত কাসীদার তিনটি চরণ নিম্নরূপ:

ألا كل شئ ما خلا الله باطل # وكل نعيم لامحالة زائل

وكل أناس سوف تدخل بينهم # دويهية يصفر منها الأنال

وكل امرئ يوما سيعلم سعيه # إذا كشفت عند الإله المحاصل

'ওহে জেনে রাখ, এক আল্লাহ ছাড়া সবই অসার, মিথ্যা। আর নিশ্চয় সকল সুখ-সম্পদ অস্থায়ী ও বিলীয়মান।

সকল মানুষ, অতি শীঘ্র তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রবেশ ঘটবে। আর তাতে আঙ্গুলের আগাসমূহ হলুদ বর্ণ ধারণ করবে।

প্রতিটি মানুষ অতি শীঘ্র একদিন তার চেষ্টা-সাধনাকে জানতে পারবে। যখন আল্লাহর নিকট তার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।'

তিনি প্রথম চরণে আল-কুরআনের-৫২

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

'ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব প্রভূর সত্তা ছাড়া'-আয়াতদ্বয়ের ভাব গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় চরণে৫৩

كل نفس ذائقة الموت

'প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু'-আয়াতটির ভাব ব্যক্ত করেছেন। আর তৃতীয় চরণটির ভাব গ্রহণ করেছেন মানুষ, মৃত্যুর পর তার পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ

---

৫১. আত-তাবারী, তারীখ আল-উমাম, ৫/২৮; আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা', ১২৪। অবশ্য আল-বালাযুরীর বর্ণনায় জানা যায়, লাবীদ তাঁর ইসলাম-পূর্ব জীবনে মক্কায় কুরায়শদের এক আড্ডায় এ কাসীদাটি আবৃত্তি করেন এবং সেখানে হাবশা ফেরত মুসলিম 'উছমান ইবন মায'উন (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি লাবীদের উদ্ধৃত প্রথম চরণটির শেষাংশের প্রতিবাদ করে বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। জান্নাতের সুখ-সম্পদ কখনও বিলীন হবে না। এতে 'উছমান (রা) লাঞ্ছিত হন। (আনসাবুল আশরাফ, ১/২২৯)

৫২. সূরা আর-রাহমান ২৫-২৬

৫৩. সূরা আলে 'ইমরান-১৮৫

সম্পর্কে আল্লাহর এ জাতীয় বাণী থেকে[৫৪]

آفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور

'সে কি জানেনা, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে? সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।'

অত:পর তিনি এ কাসীদায় হীরার রাজা আন-নু'মান ইবন আল মুনযির, তার রাজত্ব, লোক-লস্কর এবং কিভাবে তারা বিলীন হয়ে গেছে, সে কথা বলেছেন। আর এ কারণে আরবী সাহিত্যের প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণ মনে করেছেন, এ কাসীদাটি তিনি ইসলাম পূর্ব জীবনে হীরার রাজার মৃত্যুতে মরছিয়া হিসেবে রচনা করেন। প্রকৃত পক্ষে তা নয়। আসলে তিনি মৃত্যুর শিক্ষার কথা, রাজা-বাদশা ও বিভিন্ন জাতি -গোষ্ঠীর নিকট কিভাবে তার আগমন ঘটেছে, সে কথা বলেছেন। আর এ কারণে তিনি এ কাসীদায় প্রাচীন গাসসানীয় রাজন্যবর্গ, রাস জাতি এবং তাদের কোলাহল মুখর স্বপ্নীল জীবনের চিত্রও এঁকেছেন।

তিনি তাঁর অন্য একটি লামিয়া কাসীদার সূচনা করেছেন এভাবেঃ[৫৫]

لله نافلة الأجل الأفضل # وله العلا وأثيث كل مؤثل
لا يستطيع الناس محو كتابه # أنى وليس قضاؤه بمبدل

'অতিরিক্ত দান, অনুগ্রহ সবই মহান ও সর্বোত্তম আল্লাহর। উঁচু মর্যাদা ও সকল সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান ব্যক্তির যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম কেবল তাঁরই। মানুষ তাঁর (আল্লাহর) গ্রন্থকে মুছে ফেলতে পারে না। আর কি ভাবে তা সম্ভব? তাঁর সিদ্ধান্ত তো পরিবর্তনীয় নয়।'

কাসীদারটির এ সূচনাতে তিনি আল্লাহর মহান কিতাব এবং তাতে মহান আল্লাহর যে সব গুণাবলীর উল্লেখ আছে তার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। এ সৃষ্টি জগতে একমাত্র তাঁরই ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়, মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যা কিছু সংরক্ষিত হয় তার সব কিছুরই প্রতিদান দেয়া হবে। এ সব কথা তিনি বলেছেন। মূলত তাতে কুরআনের এ বাণীর ভাবই তুলে ধরেছেনঃ[৫৬]

(وكل شئ أحصينه كتابا)، (وكان أمر الله قدرا مقدورا)،(وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون)

এভাবে কবি লাবীদ তার কাসীদায় আসমান ও যমীনের সৃষ্টির কথা বলেছেন। এ পৃথিবীর অতীতের বলদর্পী রাজন্যবর্গ লুকমান, তাঁর শকুন, আবরাহা, হীরা ও গাসসানীয় রাজন্যবর্গ প্রমুখের পরিণাম ও পরিণতির কথা বলে মানুষকে উপদেশ দান

---

৫৪. সূরা আল-'আদিয়াত-৯-১১
৫৫. দিওয়ানু লাবীদ, সম্পাদনা: ড. ইহসান 'আব্বাস, ২৭১
৫৬. সূরা আন-নাবা-২৯; আর-আহযাব-৩৮; আল বাকারা-১১৭

করেছেন। সত্য কথাটি হল এই যে,তাঁর কুরআন অধ্যয়ন-যার জন্য তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন, তাঁর হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কুরআনের মর্মবাণী তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন। ইসলামী জীবনে রচিত কাসীদা সমূহে তিনি তা প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কাসীদাটি হল সেই লামিয়াটি যাতে নিম্নের শ্লোকগুলি আছে৫৭

إن تقوى ربنا خير نفل # وبإذن الله ريثى وعجل

أحمد الله فلا ندله # بيديه الخير ما شاء فعل

من هداه سبل الخير اهتدى # ناعم البال ومن شاء أضل

فاكذب النفس إذا حدثتها # إن أصدق النفس يزرى بالأمل

غير أن لا تكذبنها فى التقى # وأخزها بالبر، لله الأجل

'নিশ্চয় আমাদের প্রভু ও পরোয়ারদিগারের ভীতি সর্বোত্তম দান। আমার ধীর গতি ও দ্রুততা আল্লাহরই ইচ্ছায়।

আমি প্রশংসা করি আল্লাহর-যাঁর কোন শরীক নেই, মঙ্গল ও কল্যাণ যাঁর ক্ষমতায় এবং তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

তিনি যাকে কল্যাণের পথ দেখান, সে পরিতৃপ্ত চিত্তে সঠিক পথ পায়, আর তিনি যাকে চান পথ ভ্রষ্ট করেন।

সুতরাং তুমি তোমার প্রবৃত্তিকে মিথ্যুক বল, যখন তুমি তার সাথে সংলাপ কর। প্রবৃত্তির সত্য হল আশার মরিচীকার পেছনে দাবড়ানো।

তবে খোদা ভীতির ব্যাপারে তাকে মিথ্যাবাদী বলবে না, তাকে সৎকর্মে বাধ্য করবে মহান আল্লাহর জন্য।'

এভাবে এ কাসীদায় তিনি তাঁর একটি ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত ঃ সেটা কূফা ভ্রমণই হবে।৫৮ এতে তিনি তাঁর নিহত ভাই আরবাদের স্মৃতিচারণ করে তাঁর জন্য গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন।

মোটকথা, আমরা কবি লাবীদের ইসলামী যুগের কবিতা পাঠ করলে দেখতে পাই তিনি মানুষকে ইসলামের শক্ত রশি আঁকড়ে ধরতে আহবান জানিয়েছেন। সাথে সাথে এই দুনিয়া, ও তার ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকার কথাও বলেছেন। তিনি চেয়েছেন, মানুষ যেন দুনিয়ার যাবতীয় অকল্যাণ থেকে দূরে থাকে এবং আখিরাতের অনন্ত কল্যাণ ও জীবনের প্রত্যাশী হয়।

---

৫৭. দিওয়ানু লাবীদ-১৭৪; আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা' ১২৬
৫৮. শাওকী দায়ফ, ২/৯৫

কবি হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি

হযরত লাবীদ (রা) কবি হিসেবে জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগে আরববাসীর নিকট থেকে পূর্ণ স্বীকৃতি ও সুউচ্চ মর্যাদার আসন লাভ করেছেন। যুগে যুগে বিভিন্ন মনীষী নানাভাবে তাঁকে মূল্যায়ন করেছেন। ইতিহাসের পাতায় এমন সব ঘটনা দেখা যায় যা দ্বারা তাঁর প্রাপ্ত সম্মান ও মর্যাদার পরিমাপ করা যায়। এখানে কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হলো।

জাহিলী যুগে তিনি কোন এক অনুষ্ঠানে তাঁর রচিত একটি কাসীদা আবৃত্তি করছিলেন। যখন নীচের চরণটির আবৃতি শেষ করেন তখন উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল কবি তাঁর সম্মানে তাঁকে সিজদা করেন। চরণটি নিম্নরূপ ঃ[৫৯]

يعلو طريقة متنها متواتر # فى ليلة كفر النجوم غمامها

'তার (উষ্ট্রীর) পৃষ্ঠদেশের উপর ক্রমাগতভাবে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল। এমন এক রাতে যার মেঘমালা আকাশের নক্ষত্ররাজিকে ঢেকে দিয়েছিল।'

সাহীহায়নে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল-মারযুবানী তাঁর 'মু'জাম আশ-শু'আরা' গ্রন্থেও বলেছেন। একদিন নবী (সা) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, কবিরা যে সকল কথা বলেছেন তার মধ্যে লাবীদের এই কথাটি সর্বাধিক সত্য কথা ঃ [৬০]

ألا كل شئ ما خلا الله باطل # وكل نعيم لا محالة زائل
سوى جنة الفردوس إن نعيمها # يدوم وإن الموت لا بد نازل

(প্রথম চরণটির অনুবাদ পূর্বেই এসে গেছে।) দ্বিতীয় চরণটির অর্থ ঃ 'জান্নাতুল ফিরদাউস ব্যতীত। কারণ তার সুখ-সম্পদ চিরস্থায়ী। আর মৃত্যু অবধারিত।'

উমায়্যা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী কবি আল-ফারাযদাক (হি.১১৪/খ্রী. ৭৩২)। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে কবি লাবীদের নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করে শোনালে তিনি সংগে সংগে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। চরণটি এইঃ [৬১]

وجلا السيول عن الطلول كأنها # زبر تجد متونها أقلامها

বাদল-ধারায় অঙ্গনে সেই
পষ্ট হলো লুপ্ত রেখা,
আঁকলো তুলি যেমন আবার
নতুন করে জীর্ণ লেখা।[৬২]

---

৫৯. বুলূগ আল-আরিব, ৩/১৩১
৬০. প্রথম চরণটির অর্থ পূর্বে এসে গেছে। (আল-ইসাবা, ৩/৩২৭)
৬১. প্রাগুক্ত
৬২. নূরুদ্দীন আহমাদ, ১৭২

তাঁকে প্রশ্ন করা হলো ঃ আবু ফিরাস ঃ আপনি এমনটি করলেন কেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ তোমরা কুরআনের সিজদার আয়াতগুলো চেন, আর আমি চিনি কবিতার সিজদার স্থানগুলো।

'আব্বাসী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী কবি বাশ্‌শার ইবন বুরদ (হি.১৬৮/খ্রী. ৭৮৪)। একবার তাঁকে বলা হলো: আরব কবিদের রচিত সর্বোত্তম চরণটি আমাদের শোনান। বলেনঃ একটি মাত্র চরণকে সকল কবিতার উপর প্রাধান্য দেয়া খুবই কঠিন। তারপর তিনি কবি লাবীদের দুইটি চরণ আবৃত্তি করেন।[৬৩]

কবি লাবীদ (রা) কাব্য ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন ছিলেন। মিথ্যা অহমিকা তাঁর মধ্যে ছিল না। তাই একবার যখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ঃ শ্রেষ্ঠ কবি কে ? বললেন পথভ্রষ্ট রাজা। অর্থাৎ ইমরাউল কায়স। প্রশ্ন করা হলো ঃ তারপর কে ? বললেন ঃ নিহত যুবক। অর্থাৎ তারাফা। আবার প্রশ্ন করা হলো ঃ তারপর কে ? বললেন ঃ এই লাঠিধারী ব্যক্তি-বৃদ্ধ আবূ 'আকীল'। অর্থাৎ তিনি নিজে।[৬৪]

তাঁর কন্যা ও দানশীলতা

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কবি লাবীদের (রা) দুই কন্যা ছিল। অন্তত: তাঁদের একজন যে কবি ছিলেন সে কথা জানা যায়। তিনি জীবনের অন্তিম পর্যায়ে কন্যার কবিতা শুনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা প্রাচীন সূত্র সমূহে দেখা যায়। লাবীদ (রা) একটি দানশীল পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি নিজেও একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। জীবনের প্রথম পর্বে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, যখনই পূবালী বায়ু বইবে এবং যতদিন বইতে থাকবে, বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মানুষকে আহার করাবেন। শেষ জীবনে কূফা অবস্থান কালে যখন তাঁর ধন-সম্পদ নি:শেষ হতে চলেছিল তখন একদিন পূবালী বায়ূ বইতে আরম্ভ করে। তখন কূফার ওয়ালী আল-ওয়ালীদ ইবন 'উকবা কুফার জনগণকে সম্বোধন করে বলেন, আপনার ভাই লাবীদ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যখন পূবালী বায়ূ প্রবাহিত হবে, তা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মানুষকে আহার করাবেন। আজকের এ দিনটি তাঁর সেই দিন। আপনারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসুন। আমিই প্রথম তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছি। অত:পর তিনি লাবীদের নিকট এক শো-জোয়ান উঠ

---

৬৩. বুলুগ আল-আরিব, ৩/১৩১
৬৪. প্রাগুক্ত

পাঠান এবং লাবীদের প্রশংসায় একটি কবিতাও রচনা করেন। লাবীদ তাঁর কন্যাকে লক্ষ্য করে বলেন, আমি আমার এ জীবনে কোন কবির কবিতার জবাব দানে অক্ষম হইনি। তুমি আল-ওয়ালীদের বদান্যতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তাঁর কবিতার জবাব দাও। তখন কন্যা একটি চমৎকার কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি শুনে লাবীদ (রা) দারুণ খুশী হন।[৬৫]

মোট কথা, কবি লাবীদ জাহিলী ও ইসলামী আরবের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন এবং স্বীয় কাব্য শক্তিকে যুগের মুখপাত্র হিসেবে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেছেন।

---

৬৫. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা', ১২৪; তাবাকত আশ-শু'আরা,' ৪৯; বুলূগ আল-আরিব, ৩/৯২

কা'ব ইবন যুহায়র (রা)

কা'ব মু'আল্লাকার খ্যাতনামা কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমা (খ্রী. ৫২০-৬১০)-এর পুত্র। আরবের ঐতিহ্যবাহী গোত্র মুযায়না, মতান্তরে গাতফান গোত্রে তাঁর জন্ম।[১] বর্তমান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের দক্ষিণে অবস্থিত 'আল-হাজির' নামক স্থানে ছিল তাঁর গোত্রের আদি বাসস্থান।[২] কা'বের মায়ের নাম কাবশা বিন্‌ত 'আম্মার ইবন সুহায়ম। তাঁর পিতা যুহায়র প্রথমে উম্মু আওফা লায়লা নাম্নী এক মহিলাকে বিয়ে করেন। তার গর্ভে অনেকগুলো সন্তান জন্মলাভ করে এবং তারা সকলে শিশুকালেই মারা যায়। সম্ভবত: সন্তানদের প্রতি তীব্র ভালবাসার কারণে যুহায়র তার স্ত্রী উম্মু আওফার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন এবং তাকে তালাক দেন। তারপর তিনি কাবশা বিন্‌ত 'আম্মারকে বিয়ে করেন। এই কাবশার গর্ভে যুহায়রের দুই পুত্র- কা'ব ও বুজায়র (রা) জন্ম গ্রহণ করেন। কাবশা একজন কম বুদ্ধির অমিতব্যয়ী দাম্ভিক মহিলা ছিলেন। যুহায়র তাঁকে নিয়ে বহু কষ্ট ভোগ করেন। বিশ বছর তাঁকে নিয়ে ঘর করার পর আবার আগের স্ত্রী উম্মু আওফার কাছে ফিরে যেতে চান। কিন্তু উম্মু আওফার নিকট থেকে প্রত্যাখ্যাত হন। যুহায়র প্রায় নব্বুই (৯০) বছর বয়সে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে মারা যান।[৩]

ঐতিহ্যবাহী কবি পরিবারে কা'বের জন্ম। পিতা, ভাই, বোন সকলেই ছিলেন কবি। তাছাড়া তাঁর বংশের কয়েক পুরুষ ধারাবাহিক ভাবে আরবের খ্যাতনামা কবি ছিলেন। যেমন, পিতামহ আবু সুলমা, পিতা যুহায়র, তিনি নিজে, পুত্র উকবা এবং পৌত্র আল-'আওয়াম ইবন উকবা।[৪] 'উকবা বানূ আসাদের এক সুন্দরীকে নিয়ে একটি প্রেম সংগীত রচনা করলে মেয়েটির ভাই 'উকবাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার উপর আক্রমণ চালায় এবং তরবারির একশো'টি আঘাত হানে। কিন্তু তাতেও 'উকবা মরেননি। বেঁচে যান। অবশেষে অর্থকড়ি লেনদেনের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়। আর সেখান থেকেই 'উকবার উপাধি হয় 'আল-মাদরাব'-অর্থাৎ 'উকবা আল-মাদরাব। বাংলায় বললে বলা যায়, তরবারির কোপ খাওয়া 'উকবা।[৫]

কা'ব পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভাবেই ছোট বেলা থেকে কবিতা রচনা শুরু করেন। মান সম্পন্ন না হলে দুর্নাম হবে, এই চিন্তায় পিতা তাঁকে কাব্য চর্চা করতে শক্ত ভাবে বারণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। পিতা তাঁর আগ্রহ দেখে তাঁকে

---

১. *আশ-শি'রু ওয়াশ –শু'আরা'-৫১*

২. *ড: 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/১৯৫, ২৮২*

৩. *প্রাগুক্ত*

৪. *আশ-শি'রু ওয়াশ–শু'আরা'-৫৩*

৫. *প্রাগুক্ত*

কবিতা রচনার রীতি-নীতি শিক্ষাদানের প্রতি যত্নবান হন। কা'ব তাঁর পিতার নিকট থেকেই কবিতা রচনার রীতি-নীতির প্রশিক্ষণ নেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ভাই কবি বুজায়র ও কবি আল-হুতায়আর আদর্শ অনুসরণ করেন। কবি যুহায়র তাঁর পরিবারের সদস্য ও অন্যদেরকে যে পন্থা ও পদ্ধতিতে কবিতা রচনা-রীতি শিক্ষা দিতেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রথমে তিনি কাব্য প্রতিভার বিকাশের জন্য তাদেরকে নিজের এবং অন্য জাহিলী কবিদের প্রচুর কবিতা মুখস্ত করাতেন। আর কা'ব সম্পর্কে বর্ণিত হচ্ছে যে, তাঁর মহান পিতা তাঁকে সংগে করে নির্জন মরুভূমিতে চলে যেতেন। সেখানে তিনি প্রতমে একটি চরণ বা একটি চরণের একাংশ আবৃত্তি করতেন, তারপর পুত্র কা'বকে বলতেন ঐ চরণের অনুরূপ একটি চরণ বা চরণের বাকী অংশ রচনার জন্য।[৬] এভাবে কা'ব তাঁর পিতার নিকট থেকে হাতে-কলমে কবিতা রচনার অনুশীলন করেন এবং অতি অল্প বয়সেই কবি হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন। জাহিলী যুগের আরেকজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন আল-হুতায়আ। জাহিলী যুগেই কা'ব তাঁর চেয়েও বেশী কাব্য খ্যাতি অর্জন করেন বলে মনে হয়। ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী বর্ণনা করেছেন, একদিন আল-হুতায়আ কা'বকে বলেনঃ 'আপনি জানেন আমি আপনাদের কবি পরিবারের কবিতার একজন রাবী (বর্ণনাকারী) এবং আপনাদের সাথে রয়েছে আমার অটুট সম্পর্ক। অনেক উঁচুমানের কবি আপনাকে ও আমাকে অতিক্রম করে গেছেন। আপনি যদি এমন একটি কবিতা রচনা করেন যাতে আপনার নামের সাথে আমার নামটিও উল্লেখ থাকে তাহলে খুবই খুশী হতাম। কারণ, মানুষ আপনাদের কবিতা বেশী বেশী বর্ণনা করে এবং সে দিকেই বেশী মনোযোগী হয়।'[৭] এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে কা'ব একটি কবিতা রচনা করেন যার মধ্যে আল-হুতায়আর আসল নাম 'জারওয়াল' বিদ্যমান ছিল। চরণটি এইঃ[৮]

فَمَن للقوافى شانها من يحوكها
إذا ما ثوى كعب وفوزٌ جرو ل

'কা'ব ও জারওয়ালের তিরোধানের পরে কবিতার পৃষ্ঠপোষক কে হবে? তাঁদের পরে যে কেউ কবিতা রচনা করবে, কবিতাকে বিকৃত করে ছাড়বে।'

কা'বের কবিতায় যদি দুর্বোধ্য শব্দ, জটিল ও দীর্ঘ বাক্য না হতো, যা থেকে তাঁর পিতার

৬. *কিতাবুল আগানী (আস-সাসী সংস্কারণ)-১৫/১৪১; ড: শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল 'আরাবী-২/৮৩*

৭. *ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাত আশ-শু'আরা'-৮৭; আল -ইসাবা ফী তাময়ীয আস সাহাবা- ৩/২৯৬; আল-আগানী (দারুল কুতুব সংস্করণ)-২/১৬৫*

৮. *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা'-৬০*

কবিতা মুক্ত ছিল, তাহলে তিনি পিতার সম-পর্যায়ের কবি হয়ে যেতেন।৯ বিখ্যাত রাবী খালাফ আল-আহমার (মৃ.১০০/৭৯৬) -কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়, যুহায়র ও তাঁর পুত্র কা'ব-এ দুইজনের মধ্যে বড় কবি কে ? তিনি বলেনঃ 'যুহায়রের কিছু কবিতা, সেগুলোকে মানুষ খুব বড় করে দেখেছে, তা যদি না থাকতো তাহলে আমি বলতাম কা'ব তাঁর পিতার চেয়ে বড় কবি।'১০

শৈশবেই তাঁর কাব্য-প্রতিভা যথেষ্ট পরিপক্কতা লাভ করেছিল। একথার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনার মাধ্যমে। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নাবিগা আয-যুবইয়ানী (মৃ.৬০৪খ্রী:) একবার হীরার রাজা নু'মান ইবন আল-মুনযিরের দরবারে যান এবং তার প্রশংসায় নিম্নের চরণটি রচনা করেনঃ

تراك الأرض إمّا متّ حقا

وتحى ما حييت بها ثقيلا

'পৃথিবী তোমাকে দেখবে, হয় তুমি সত্যের উপর মৃত্যুবরণ করবে অথবা যতদিন এখানে জীবিত থাকবে, ভারী বোঝা হয়ে থাকবে।'

চরণটি শুনে নু'মান বললেন, এর ব্যাখ্যা স্বরূপ আরেকটি চরণ রচনা না করলে এটাতো আমার ব্যঙ্গ– বিদ্রুপের কাছাকাছিই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বহু কষ্ট করেও এর ব্যাখ্যা স্বরূপ পরবর্তী একটি চরণ রচনায় সক্ষম হলেন না। তখন নু'মান তাঁকে তিন দিন সময় দিয়ে বলেন, যদি এর মধ্যে রচনা করতে পার তাহলে তুমি একশো' উট পাবে, আর না পারলে তরবারি দিয়ে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিব। নাবিগা ভীত-শংকিত অবস্থায় নু'মানের দরবার থেকে বেরিয়ে কা'বের পিতা কবি যুহায়রের সাথে দেখা করে সব কথা খুলে বললেন। যুহায়র বললেন, চলুন, আমরা নির্জন মরুভূমিতে গিয়ে দু'জন চেষ্টা করে দেখি। শিশু কা'ব তাঁদের সঙ্গ নিতে চাইলেন। পিতা যুহায়র তাঁকে সঙ্গে নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। অবশেষে নাবিগার অনুরোধে যুহায়র তাঁকে সঙ্গে নিলেন। অত:পর তাঁদের দু'জনের মগযে কিছু আসার পূর্বেই কা'ব নাবিগাকে বললেন, চাচা, এই চরণটি বলে দিতে আপনাকে বারণ করছে কে ?

وذلك إن فللت الغى عنها

فتمنع جانبيها أن تميلا

'আর তা হলো যদি তুমি পৃথিবী থেকে অজ্ঞতা দূর করে দিতে পার তাহলে তার উভয় প্রান্তের হেলে যাওয়া ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।'

---

৯. হাসান যায়্যাত, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, (উর্দূ)-২৫৬
১০. আশ শি'রু ওয়াশ শু'আরা'-৫১; আল-ইসাবা-৩/২৯৬

ঘটনাটি অবশ্য ইবনুল কালবী অন্য ভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন, নাবিগা একদিন যুহায়রের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। যুহায়র তাঁর সম্মানে উট জবাই করে খাবার প্রস্তুত করলেন এবং পানীয় উপস্থিত করলেন। দু'জন খেতে বসে কাব্য চর্চার দিকে ফিরে গেলেন। নাবিগা প্রথমে পূর্বে উল্লেখিত চরণটি আবৃত্তি করে এই পংক্তিটি আওড়ালেন:

نزلت بمستقر العز منها

তারপর যুহায়রকে পরবর্তী পংক্তিটি মিলাতে বললেন। যুহায়র কিছুক্ষণ বিড়বিড় করলেন, কিন্তু কিছুই মুখ থেকে বের হলো না। তাঁদের দু'জনের পাশেই তখন কা'ব তাঁর সম বয়সী বালকদের সাথে মাটিতে খেলছিলেন। তিনি তাঁদের দু'জনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন তাঁরা ঘাড় নীচু করে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি পিতাকে লক্ষ্য করে বললেন, মনে হচ্ছে আপনারা কোন বড় রকমের সমস্যায় পড়েছেন? পিতা তাঁকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু নাবিগা তাঁকে আদর করে কোলের উপর বসালেন এবং ব্যাপরটি তাঁকে খুলে বললেন। বালক কা'ব তখন সাথে সাথে বলে উঠলেন, এ পংক্তিটি বলুন না কেনঃ

فتمنع جانبيها أن تميلا

পিতা তখন তাঁকে অতি আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরেন।[১১]

কা'বের পিতা ছিলেন একজন শান্তি প্রিয় ও একেশ্বরবাদী কবি। তিনি আল্লাহর অস্তিত্বে, হাশর-নশর, পুনরুত্থান ও শেষ বিচার দিনে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষের এ পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম যে সংরক্ষিত হচ্ছে এবং তার যে চুলচেরা হিসাব-নিকাশ করে বদলা দেয়া হবে, সে কথা তিনি তাঁর কবিতায় সেই জাহিলী যুগেই বলে গেছেন। তাঁর একটি চরণ নিম্নরূপঃ[১২]

ويؤخر فيودع في كتاب فيدخر
ليوم الحساب أو يُعجّل فينقم

'এবং তা বিলম্বিত করা হবে এবং একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে বিচার দিনের জন্য সংরক্ষণ করা হবে অথবা সংগে সংগে বদলা দেওয়া হবে।'

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি পুত্র কা'ব ও বুজায়রকে ওসিয়াত করে যান, যেন তারা রাসূলের আবির্ভাবের পর তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। পিতার ওসিয়াত মত দু'ভাই রাসূলের (সা) নিকট

---

১১. আল ইসাবা-৩/২৯৬
১২. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা'-৫২

যাবার জন্য ঘর থেকে বের হন। 'আবরাক আল-ইরাক' নামক স্থানে পৌঁছে বুজায়র কা'বকে বলেন, তুমি আমাদের এই বকরীগুলো নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর। আমি আগে এই লোকটির (রাসূল (সা)) সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁর কিছু কথা শুনি। একথা বলে বুজায়র মদীনায় গিয়ে রাসূলের (সা) সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কথা ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। কা'ব এ খবর পেয়ে ভীষণ রেগে যান এবং তাঁকে ইসলাম থেকে বিরত থাকার আহবান জানান। এ সময় কা'ব রাসূল (সা) ও বুজায়রের নিন্দায় নিম্নের শ্লোকগুলো রচনা করেনঃ[১৩]

ألا ابلغاعنى بجيرا رسالة

فهل لك فيماقلتُ-ويحك-هل لكا

شربت مع المأمون كأ ساروّية

فانهلك المأمون منها وعلّكا

ففارقت أسباب الهدى واتبعته

على أى شئ ويب غيرك دلكا

على مذهب لم تلف أماولا أبا

عليه، ولم تعرف عليه أخا لكا

فإن أنت لم تفعل فلست بأسف

ولا قائل، إما عثرت لعًالكا

'আমার পক্ষ থেকে তোমরা দু'জন বুজায়রকে একটি বাণী পৌঁছে দাও। তোমার ধ্বংস হোক! আমি তোমাকে যে কথা বলেছি তা কি তুমি রেখেছো ? তুমি বিশ্বস্ত ব্যক্তির [রাসূল (সা) অথবা আবু বকরের (রা)] সাথে পূর্ণ পাত্র শরাব পান করেছ এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি ও তুমি একের পর এক পেয়ালা পান করেছ। তাই তুমি হিদায়াতের পথ ছেড়ে তাঁকে অনুসরণ করেছ। অন্যদের মত তোমারও ধ্বংস হোক! সে তোমাকে কোন পথের সন্ধান দিয়েছে ? সে তোমাকে কোন ধর্মের পথ দেখিয়েছে যার উপর তুমি তোমার পিতা-মাতা কাউকে পাওনি, আর না তোমার কোন ভাইকে তা মানতে দেখেছ। তুমি যদি আমার কথা না মানো তাহলে আমি কোন আফসোস করবো না এবং তোমার পদস্খলন হলে এ দু'আও করবো না যে, আল্লাহ তোমাকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করুন।'

---

১৩. শ্লোকগুলির বিভিন্ন বর্ণনায় কিছু শব্দের ভিন্নতা আছে। আল-আগানী (সাসী)-১৫/১৪২; আশ-শি'রু ওয়াশ-শু'আরা'-৫৩, আল ইসাবা-৩/২৯৫

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এ কবিতা শুনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং ঘোষণা করলেন, যে কেউ কা'বকে দেখবে তাকে হত্যা করবে। এ ভাবে তিনি কা'বের হত্যার ফরমান জারি করলেন। এ খবর শুনে কা'ব প্রাণ ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং বনে-জঙ্গলে ও নির্জন প্রান্তরে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন।

এ দিকে বুজায়র (রা) নিম্নের শ্লোক গুলির মাধমে কা'বের নিন্দামূলক কবিতাটির জবাব দেনঃ

من مبلغ كعبا فهل لك فى التى
تلوم عليها باطلا وهى أحزم
إلى الله لا العزى ولا اللات وحده
فتنجو إذا كان النجاء وتسلم
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت
من النار الا طاهر القلب مسلم

'কা'বকে একথা কে পৌঁছে দেবে যে, তুমি যে অবস্থার মধ্যে তিরস্কার করছো তা বাতিল ও অসার। আর আমার কাজটিই বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার কাজ। লাত ও 'উয্‌যা নয়, বরং এক আল্লাহর দিকে ফিরে এসো। তাহলে মুক্তি পাবে ও নিরাপদ থাকবে। যদি তুমি মুক্তি চাও। সেই দিন যে দিন পবিত্র অন্তর বিশিষ্ট মুসলিম ছাড়া আর কেউ মুক্তি পাবে না।'[১৪]

উল্লেখ্য যে, বুজায়রের (রা) ইসলাম গ্রহণ ও কা'বের এ সব ঘটনা হিজরী ৭ম সনের অল্প কিছু দিন পূর্বে ঘটে। কা'ব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যু পরোয়ানা কাঁধে নিয়ে আরবের নানা গোত্র ও নানা স্থানে ভবঘুরে অবস্থায় কাটাতে লাগলেন। এ অবস্থায় তাঁর প্রায় দু'বছর কেটে গেল। এ দিকে মক্কা বিজিত হলো। কা'বের নিকট এই প্রশস্ত দুনিয়া খুবই সংকীর্ণ হয়ে গেল। বুঝতে পারলেন, এখন আর কোথাও পালিয়ে জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয়। এদিকে তাঁর ভাই বুজায়র (রা) তাঁকে একটি চিঠিতে লিখলেন, অংশীবাদী কবিদের যারা রাসূলকে (সা) কষ্ট দিয়েছে তাদের একজনকে তিনি হত্যা করেছেন। তবে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে তাওবা করেছেন তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি পরামর্শ দিলেন রাসূল (সা)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে। অত:পর কা'ব হি. ৯/খ্রী. ৬৩০ সনে মদীনায় হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি নিজের পরিচয় গোপন

১৪. *শাওকী দায়ফ-২/৮৪*

করে একদিন মদীনায় প্রবেশ করলেন এবং কোমল হৃদয়ের মানুষ আবূ বকরের (রা) আশ্রয়ে উঠে তাঁকে মধ্যস্থতা করার অনুরোধ জানালেন। অত:পর কা'ব নিজের পাগড়ী দিয়ে মাথা-মুখ ঢেকে আবূ বকরের (রা) সাথে মসজিদে গেলেন। রাসূল (সা) তখন সুফ্ফায় অবস্থান করছিলেন। কা'ব ধীরে ধীরে এগিয়ে তাঁর নিকটে গেলেন এবং সামনে বসে পড়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। তারপর বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিন। আমি সেই কা'ব ইবন যুহায়র। রাসূল (সা) বললেনঃ তুমি সেই কা'ব যে এই কবিতা বলেছে? তারপর তিনি আবূ বকরের (রা) দিকে তাকিয়ে সেই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করে শোনাতে বলেন। আবূ বকর (রা) শ্লোকগুলি আবৃত্তি করে শোনালেন।[১৫]

অপর একটি বর্ণনা মতে রাসূল (সা) যখন ফজরের নামায শেষ করলেন তখন আবূ বকর (রা) কা'বকে রাসূল (সা)-এর নিকট নিয়ে যান। পাগড়ী দিয়ে তখন কা'বের মাথা-মুখ ঢাকা ছিল। আবূ বকর (রা) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি এসেছে আপনার হাতে হাত রেখে ইসলামের বায়'আত গ্রহণের জন্য। রাসূল (সা) হাত বাড়িয়ে দিলেন। কা'ব তখন মাথা-মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে বলে ওঠেন ঃ 'এই হলো আশ্রয় প্রার্থীর স্থল। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কা'ব ইবন যুহায়র।' যেহেতু তিনি পূর্বে আনসারদের বহু নিন্দা-মন্দ করেছেন। এ কারণে সাথে সাথে আনসারগণ মারমুখী অবস্থায় চারদিকে থেকে তাঁকে ঘিরে ধরে নানা রকম বাক্যবানে বিদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু রাসূল (সা) তখন তাঁকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করায় সব হৈচৈ ও অসন্তোষ থেমে যায়। কা'ব তখন রাসূল (সা)-কে উদ্দেশ্য করে রচিত তাঁর সেই বিখ্যাত কাসীদা 'বানাত সু'আদ' আবৃত্তি করে শোনান।[১৬]

এই কবিতাটিই তাঁর ইতিহাসখ্যাত অবিস্মরণীয় 'বানাত সু'আদ' নামক শ্রেষ্ঠ নবী স্তুতি কাব্য। এ তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। এক বিরাট ঐতিহাসিক মূল্যের অধিকারী তাঁর এই কাসীদাটি। 'বানাত সু'আদ' নামক আদ্য শব্দদ্বয় দিয়ে এই কাসীদার সূচনা। 'সু'আদ' তাঁর প্রিয়তমার নাম যার বিরহ-বেদনায় তিনি অস্থির, ব্যাকুল ও চঞ্চল। এই দীর্ঘ কবিতাটির সূচনা হয়েছে এভাবে ঃ

بانت سعاد فقلبی الیوم متبول + متیمٌ إثرها لم یُجزَ مکبول

وما سعاد غداة البین إذ عرضت + إلا أغن غضیض الطرف مکحول

وما دوم علی العهد الذی زعمت + کما تلوّن فی أثوابها الغول

---

১৫. আল-ইসাবা- ৩/২৯৫

১৬. আশ-শি'রু ওয়াশ-শু'আরা'-৫৯; দ: 'উমার ফাররুখ- ১/২৮৩

ولا تمسكُ بالود الذى زعمت + إلا كما تُمسكُ الماء الغرابيل

كانت مواعيد عرقوب لها مثلا + وما موا عيده الا الأ باطيل

'সু'আদ বিদায় নিয়েছে। সুতরাং আমার হৃদয় আজ শুধু অস্থির ও পীড়িতই নয়, বরং তাঁর স্মৃতির নিকট এমন বন্দী হয়েছে যার কোন মুক্তিমূল্য নেই। বিদায়ের দিন সকাল বেলায় সু'আদ যখন আমার সামনে আসে তখন তাকে সুরমাযুক্ত, অবনত দৃষ্টি সম্পন্না ও রুদ্ধশ্বাসে রোদনকারিণী ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। সে তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর স্থায়ী থাকে না। বরং এমন ভাবে পরিবর্তিত হয় যেমন ভূত-প্রেত ক্ষণে ক্ষণে সময়ে অসময়ে বেশভূষা পরিবর্তন করে থাকে।

সে তার প্রেম-প্রীতি ধরে রাখতে পারে না, যেমন চালুনী পানি রোধ করতে পারেনা।

তার দৃষ্টান্ত 'উরকূব নামক এক আরব নারীর অঙ্গীকারের ন্যায়। যার সব অঙ্গীকারই অসার ও মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

জাহিলী আরব কবিদের কাসীদা রচনার চিরাচরিত রীতি-নীতি অনুসারে কা'ব তাঁর প্রিয়ার প্রস্থান কালীন দৃশ্য, তাঁর মানসিক অবস্থা, প্রিয়ার ছলাকলা, তার দৈহিক সৌন্দর্য, উষ্ট্রী ইত্যাদির বর্ণনার মাধ্যমে এই কাসীদার সূচনা করেছেন। তিনি কবিতাটির প্রথম থেকে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। আর এ দিকে রাসূল (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম কান লাগিয়ে একাগ্র চিত্তে শুনছেন। এক পর্যায়ে কবি নিম্নের শ্লোকগুলিতে পৌঁছলেন।

نبِّئتُ أن رسول الله أوعدنى + والعفو عند رسول الله مبذول

مهلا هداك الذى أعطاك نافلة الـ + ـقرآن فيها مواعيظ وتفصيل

لا تأخذنى بأقوال الوشاة ولم + أذنب ولو كثرت فى الأقاويل

'আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সা) আমাকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কাছেই তো ক্ষমা লাভ করা যায়।

আমাকে একটু সময় দিন। সেই মহান আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দান করুন, যিনি অতিরিক্ত অনুগ্রহ স্বরূপ আপনাকে কুরআন দান করেছেন। যাতে রয়েছে উপদেশমালা ও বিশদ ব্যাখ্যা।

নিন্দুকদের কথায় আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। কারণ, আমি কোন অপরাধ করিনি, যদিও আমার সম্পর্কে অনেক বেশী কথাবার্তা হয়ে গেছে।'

যখন কবি উপরের শ্লোকগুলি আবৃত্তি করেন, তখন রাসূল (সা) বলেন, 'ক্ষমা চাওয়া

সেতো আমার কাছে নয়, আল্লাহর কাছে।'[১৭]

এভাবে কবি কা'ব (রা) তার কাসীদা আবৃত্তি করতে করতে এক পর্যায়ে নিম্নের শ্লোকগুলিতে পৌছলেনঃ

إن الرسول لنور يستضاء به + وصارم من سيوف الله مسلول
فى عصبة من قريش قال قَائلهم + ببطن مكة لمَّا أسلموا زولوا
زالوا فمازال أنكاس ولا كشف+ يوم اللقاء ولا سُود معازيل

'নিশ্চয় রাসূল (সা) এমনই এক জ্যোতি, যা দ্বারা আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি আল্লাহর ধারালো তরবারি সমূহের অন্যতম তরবারি যা সতত কোষমুক্ত।

কুরায়শদের একটি দল যখন মক্কার উপত্যাকায় ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাদের একজন বলেছিল, তোমরা মক্কা থেকে মদীনায় সরে যাও।

তাই তারা মদীনার দিকে সরে পড়ে। তবে যারা দুর্বল এবং সম্মুখ সমরে বর্মহীন, অস্ত্রহীন এবং অশ্বোপরি ঢলে পড়ে, তারা সরেনি।'

উপরের এই শ্লোকগুলো শোনার পর রাসূল (সা) পাশে উপবিষ্ট কুরায়শ বংশের যাঁরা বসে ছিলেন তাঁদের দিকে তাকালেন। মূলত: তিনি তাঁদেরকে মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অত:পর কবি কুরায়শ গোত্রের প্রশংসায় নিম্নের শ্লোকটি সহ আরো কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তির পর রাসূল (সা)-এর পাশে উপবিষ্ট কুরায়শগণ প্রতিবাদ করেন এই বলে যে, আনসারদের উপেক্ষা করে আমাদের প্রশংসা করলে সেটা প্রশংসা না হয়ে বরং নিন্দা হয়। শ্লোকটি এইঃ

يمشون مشى الجمال البهم يعصمهم + ضرب إذا عرّد السود التنابيل

'তারা বিরাট বপুধারী শক্তিমান উষ্ট্রীর ন্যায় হেলে দুলে পথ চলে, অস্ত্রের আঘাত তাদেরকে রক্ষা করে, যখন খর্বকায় নেতারা পালিয়ে যায়।'

কুরায়শদের প্রতিবাদের মুখে কবি তখন ভিন্ন অন্ত্যমিলে কিছু শ্লোক রচনা করেন যাতে আনসারদের গুণাবলী স্থান পায়। শ্লোকগুলি এইঃ[১৮]

من سره شرف الحياة فلايزل + في مقنب من صالحى الأنصار
الباذلين نفوسهم لنبيهم + يوم الهياج وسطوة الجبار
يتطهرون كأنه نسك لهم + بدماء من علقوا من الكفار

---

১৭. ড: মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য - ১৮
১৮. আশ-শি'রু ওয়াশ-শু'আরা'-৬০; ড: শাওকী দায়ফ-২/৮৬

صدموا عليا يوم بدر صدمة + دانت لوقعتها جميع نزار

ورثوا السيادة كابرا عن كابر + إن الكرام هم بنو الأخيار

'জীবনের সম্মান ও মর্যাদা যাকে সন্তুষ্ট করে সে যেন আনসারদের সৎ অশ্বারোহীদের সাথেই থাকে।

প্রচণ্ড যুদ্ধের দিনেও ক্ষমতাদর্পীদের দাপটের সময় তাঁরা তাদের নবীর জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেন।

যে সকল কাফিরদের তাঁরা হত্যা করেন তাদের রক্ত দিয়ে তাঁরা যেন পবিত্রতা অর্জন করেন। আর এটাকে তাঁরা তাঁদের 'ইবাদাত মনে করেন।

বদর যুদ্ধের দিনে তাঁরা কিনানা গোত্রের 'আলী ইবন মাসউদ শাখার সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হন। আর এই ঘটনায় গোটা নিযার গোত্র পর্যুদস্ত হয়।

পুরুষানুক্রমে তাঁরা নেতৃত্বের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। সৎ ও অভিজাত বংশের সন্তানরাই অভিজাত হয়ে থাকে।'

এভাবে কা'ব (রা) তাঁর দীর্ঘ কবিতা পাঠ শেষ করেন। এ কবিতা শুনে রাসূল (সা) এতই খুশী হলেন যে, তাঁকে ক্ষমা করে তো দিলেনই, উপরন্তু নিজের গায়ের পবিত্র চাদরখানিও তাঁকে পরিয়ে দিলেন।[১৯] এ জন্যই তাঁর এ কবিতার আর এক নাম قصيدة البردة" অর্থাৎ "চাদরের কবিতা"। "বুরদা" অর্থ ডোরা-কাটা চাদর। ঠিক ডোরা-কাটা চাদরের মতই এতে নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। রাসূল (সা) কবি কা'বের (রা) এই কবিতা শোনার পর তাঁর প্রতি যে কী পরিমাণ খুশী হয়েছিলেন, তা তাঁর এই চাদর প্রদান থেকে অনুধাবন করা যায়। এটা কবি কা'বের (রা) জন্য কম কৃতিত্ব ও গৌরবের কথা ছিল না। এই মহাসম্মানে ভূষিত হয়ে তিনি ও তাঁর উত্তর পুরুষরা যুগের পর যুগ দারুণ গর্ব অনুভব করেছেন।

কবি কা'ব (রা) ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আরও তিনজন সভা কবি হাস্‌সান ইবন ছাবিত, কা'ব ইবন মালিক ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) ছিলেন। কিন্তু তিনি কা'বের (রা) মত অন্য কোন কবিকে পুরস্কৃত করেননি। এখানেই নিহিত রয়েছে কবি কা'বের শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্ব। অবশ্য কবি 'আব্বাস ইবন মিরদাস রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রসংসায় একটি কবিতা রচনা করলে তিনি কবিকে "হুল্লা" বা একজোড়া কাপড় দান করেন।[২০]

কবি কা'ব (রা) নবী মুস্তফা (সা) -এর অঙ্গে ধারণকৃত এই উপহার কখনো হস্তচ্যুত করেন নি। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সেটি সযত্নে আগলে রাখেন। হযরত মু'আবিয়া

---

১৯. *তাবাকাত আশ-শু'আরা'- ৮৭; আশ শি'রু ওয়াশ-শু'আরা-৬০*

২০. *আল 'ইকদ আল-ফারীদ-৫/২৯১*

(রা) এই পবিত্র চারদখানি খরিদ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বিনিময়ে তিনি কবিকে দশহাজার দিরহাম পর্যন্ত দিতে চান। কিন্তু কবি এই প্রচুর অর্থ হেলায় প্রত্যাখ্যান করে বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) -এর এই পরিচ্ছদ অন্য কাউকে দেয়ার মত বদান্যতা দেখাতে পারিনে।[২১] হিজরী ২৬/খ্রী. ৬৪৫ সনে কবি কা'ব (রা) ইনতিকাল করেন।[২২] তাঁর ইনতিকালের পর খলীফা হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁর খিলাফতকালে আবার সেই মহামূল্যবান চাদরটি খরিদ করার উদ্যোগ নেন। এবার তিনি সফল হন। কবি কা'বের (রা) পরিবারের সদস্যদের নিকট থেকে বিশ হাজার,[২৩] মতান্তরে চল্লিশ হাজার[২৪] দিরহামের মোটা অংকের বিনিময়ে খরিদ করেন।

হযরত মু'আবিয়া (রা) এ চাদরখানি ক্রয় করতে পেরে ভীষণ খুশী হন। 'ঈদ উপলক্ষে ও অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানে খিলাফতের বিশেষ পোশাকের উপর চাদরখানি গায়ে দেয়া কল্যাণকর ও মঙ্গলময় বলে মনে করতেন। হযরত মু'আবিয়ার (রা) ইনতিকালের পর উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় খলীফাগণ একের পর এক উত্তরাধিকার হিসেবে চাদরটি লাভ করেন এবং মহামূল্যবান ও মঙ্গলময় বস্তু হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে হিফাজত করেন। জুরজী যায়দান ঐতিহাসিক আবুল ফিদার সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে তাতারীয়দের বাগদাদ দখলের পর সেটি তাদের হাতে যায়। কিন্তু বর্তমানে সেটি নবী (সা)-এর পরিত্যক্ত সামগ্রী সমূহের সাথে তুরস্কের আসতানা জাদুঘরের প্রাচীন বস্তু সংরক্ষণাগারে সংরক্ষিত আছে। আবুল ফিদার একথা উল্লেখের পর জুরজী যায়দান বলেছেন, যেহেতু তাতারীয়রা বাগদাদ দখলের পর 'আব্বাসীয়রা মিসরে পালিয়ে গিয়েছিল। তাই আবুল ফিদা ধারণা করেছেন, খলীফার প্রাসাদের সবকিছু তাতারীয়দের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, আব্বাসীয়রা মিসর পালিয়ে যাওয়ার সময় পবিত্র চাদরখানি সংগে নিয়ে গিয়েছিল। ৯২৩ হিজরীতে 'উছমানী খলীফা সুলতান সালীম মিসরকে উছমানী খিলাফতের অন্তর্ভূক্ত করার পর সেটি তাঁর হাতে পৌঁছে।[২৫]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কবিতাটির দু'টো আদ্য শব্দ থেকে এর নাম হয়েছে "বানাত সু'আদ"। এর শেষ অক্ষর "লাম" হওয়ার কারণে এটিকে আবার "কাসীদা লামিয়া" নামেও অভিহিত করা হয়। আবু বকর আল-আম্বারীর এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায়, অনেকের মতে এটি "কাসীদা বুরদা" নামেই সুপরিচিত। কারণ, এই কাসীদা শুনেই রাসূল (সা) মুগ্ধচিত্তে তাঁকে দেহের চাদর খুলে দান করেন। অবশ্য এছাড়াও আরবী সাহিত্যে আরেকটি "কাসীদা বুরদা" আছে। এটির রচয়িতা শারফুদ্দীন মুহাম্মাদ

---

২১. প্রাগুক্ত- ২/৯১; টীকা নং ২

২২. ডঃ 'উমার ফাররূখ- ১/২৮৩

২৩. আল 'ইকদ আল ফারীদ- ৫/২৯১; আশ্‌শি'রু ওয়াশ-শু'আরা'-৬০

২৪. জুরজী যায়দান, তারীখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী- ১/১২৯

২৫. প্রাগুক্ত

ইবন সা'ঈদ আল–বূসীরী (খ্রী. ১২১২-১২৯৫/হি.৬০৮-৬৯৪)।[২৬] অনেকে আল-বুসীরীর কবিতাটিকে "কাসীদাতুল বুরআ" বা রোগ মুক্তির কবিতা নামে অভিহিত করেছেন। কারণ তিনি এ গীতি কবিতাটি রচনা করেই দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করেন। কাসীদাটি রচনার পেক্ষাপট এ রকম।

কবি আল-বূসীরী জীবনের এক পর্যায়ে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। অর্ধেক দেহ অবশ হয়ে যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসায় একটি কাসীদা রচনার সিদ্ধান্ত নেন এবং রচনাও করেন। একদিন রাতে কবিতাটি বার বার আবৃত্তি করেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূল (সা) উপস্থিত হয়ে তাঁর দেহের ব্যাথার স্থানে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন এবং তাঁর গায়ে একটি চাদর পরিয়ে দিলেন। তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলেন, সম্পূর্ণ সুস্থ। তারপর লাফিয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।[২৭]

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত কা'ব (রা) সত্যিকার অর্থেই একজন ঈমানদার ব্যক্তিতে পরিণত হন। পবিত্র কুরআন দ্বারা দারুণ ভাবে প্রভাবিত হন এবং তার প্রভাব পড়ে তাঁর কবিতায়। এমন বহু উপদেশ ও জ্ঞান-গর্ভ বক্তব্য তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায় যা মূলত আল-কুরআন থেকে উৎসারিত। যেমন,[২৮]

لوكنت أعجب من شئ لأعجنى + سعى الفتى وهو مخبوء له القدر

يسعى الفتى لأمورليس يدركها + والنفس واحدة والهم منتشر

والمرء ماعاش ممدودله أمل + لا تنتهى العين حتى ينتهى الأثر

'আমি যদি কোন জিনিসে বিস্ময় বোধ করতাম তাহলে যুবকের প্রচেষ্টা আমাকে অবশ্যই বিস্মিত করতো, অথচ তার ভাগ্য তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

যুবক এমন অনেক কিছু অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা সে পায় না। প্রাণ একটি, কিন্তু তার দু:খ-কষ্ট ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অনেক।

মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে তার আশা-আকাংখা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। চোখ দর্শন থেকে বিরত হয় না, যতক্ষণ না দর্শনীয় বস্তুটির পরিসমাপ্তি ঘটে।'

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার রিজিকদাতা। তিনি তাদের কাউকে রিযিক বিহীন অবস্থায় রাখেন না। তিনি তাদের প্রতিপালক। তিনি অভাবহীন প্রশংসিত সত্তা। ইসলামের এ সব মর্মবাণী তাঁর কবিতায় বারবার উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর নিম্নের শ্লোক গুলিতে

---

২৬. ড: 'উমার ফাররূখ- ৩/৬৭৩-৬৭৪

২৭. ফুওয়াত আল ওয়াফায়াত-২/২৬০; ড: 'উমার ফাররূখ-৩/৬৭৪

২৮. আশ শি'রু ওয়াশ-শু'আরা-৫৮

একথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।[২৯]

أعلم أني متى ما يأتنى قدرى + فليس يحبسه شح ولا شقف

والمرء والمال ينمى ثم يذهبه + مر الدهور ويفنيه فينسحق

فلا تخافى علينا الفقر وانتظرى + فضل الذى بالغنى من عنده نثق

إن يفن ما عندنا فالله يرزقنا + ومن سوانا ولسنا نحن نرتزق

'আমি নিশ্চিত ভাবে জানি, যখন আমার নির্ধারিত সময় তথা মৃত্যু এসে যাবে তখন তাকে না কৃপণতা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, আর না ভয়।

মানুষ এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অত:পর কালের আবর্তন তা ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং তা বিলুপ্ত করে দেয়। অবশেষে তা বিলীন হয়ে যায়।

তাই তুমি আমাদের উপর দারিদ্র আপতিত হওয়ার ভয় করোনা এবং অপেক্ষা কর সেই অনুগ্রহের যা তাঁর নিকট থেকে আমার কাছে পৌঁছবে বলে আমি দৃঢ় আস্থা রাখি।

আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আল্লাহই আমাদের ও অন্যদেরকে রিযিক দেবেন। আমরা নিজেরা রিযিক চাইবো না।'

অনেক নীতিকথা ও উপদেশমূলক বাণী কা'বের (রা) কবিতায় পাওয়া যায়। যেমন নিম্নের শ্লোকগুলিতে তিনি বলেছেন, খারাপ কথা যে বলে ও শোনে উভয়ে সমান অংশীদার। খারাপ কথা যে বলে সে খারাপ কথা শোনে, আর কেউ মানুষকে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনার সুযোগ করে দিলে লোকে সত্য-মিথ্যা সবই বলে। যেমন তিনি বলেনঃ[৩০]

السامع الذامّ شريك له + ومطعم المأكول كالأكل

مقالة السوء إلى أهلها + أسرع من منحدر سائل

ومن دعا الناس إلى ذمه + ذموه بالحق و بالباطل

'খারাপ কথা যে শোনে সে খারাপ কথা যে বলে তার সমান। যে কিছু খাওয়ায় এবং যে তা খায় উভয়ে সমান।

খারাপ কথা যে বলে তা তার দিকে প্রবাহমান পানির চেয়েও দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়।

যে ব্যক্তি নিজের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার জন্য মানুষকে আহবান জানায়, মানুষ তার সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা সবকিছু বলে।'

---

২৯. ড: শাওকী দায়ফ-২/৮৭

৩০. খাযানাতুল আদাব-৪/১২; কিতাবুল হায়ওয়ান-১/১৫; হাসান যায়্যাত-২৫৭.

আন–নাবিগা আল-জা'দী (রা)

আন-নাবিগা আল-জা'দীর আসল নামের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের একটু মতভেদ আছে। ইবন কুতায়বা তাঁর নাম 'আবদুল্লাহ ইবন কায়স বলে উল্লেখ করেছেন।[১] আবার কেউ বলেছেন কায়স ইবন 'আবদিল্লাহ অথবা হাস্সান ইবন কায়স।[২]

তবে তাঁর ডাক নাম আবূ লায়লা। বানূ 'আমির ইবন সা'সার জা'দা ইবন কা'ব ইবন রাবী'আ শাখার সন্তান। জাহিলী যুগে বর্তমান সৌদি আরবের দক্ষিণ নাজদের আল-ফালাজ নামক স্থানে তাঁর জন্ম। আল- ফালাজ একটি জলাশয়ের নাম। এ জলাশয়কে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে গোত্রের আবাস স্থল। একথা বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর মা ছিলেন হাজার অঞ্চলের খাসফা নাম্নী এক মহিলা। অনেকে বলেছেন, খাসফা তাঁর মা নন, বরং ধাত্রী। জা'দা, 'উকায়ল, কুশায়র ও আল-হারীশ নামে তাঁর আরো চার ভাই ছিল।[৩]

প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর তিনি নিজ গোত্রের লোকদের সাথে যুদ্ধ মূলক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জাহিলী জীবনের ত্রিশ বছর পর্যন্ত কোন কবিতা রচনা করেন নি। পরে তাঁর জিহ্বায় কবিতার প্লাবন বয়ে যায়। এ কারণে তাঁর উপাধি হয় আন-নাবিগা।[৪]

অনেকে তাঁর এ উপাধি লাভের কারণ সম্পর্কে বলেছেন যে, জাহিলী জীবনে তিনি কবিতা রচনা করতেন, তারপর দীর্ঘদিন যাবত কাব্য চর্চা থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর ইসলামী জীবনে আবার কাব্য চর্চায় মনোযোগী হন এবং দারুণ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। আর তাই এ অভিধায় ভূষিত হন।[৫]

জাহিলী আরবের আরেকজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আন-নাবিগা আয-যুবয়ানী। বর্ণিত হয়েছে যে, আন-নাবিগা আল-জা'দী তাঁর থেকেও বয়সে প্রবীণ। কারণ, একথা জানা যায় যে, আয-যুবয়ানী হীরার রাজা আন-নু'মানকে সঙ্গ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে আল-জা'দী সঙ্গ দিয়েছেন তাঁর পিতা আল-মুনযিরকে।[৬]

জাহিলী যুগে আন-নাবিগা আল-মু'আল্লাকার খ্যাতিমান কবি লাবীদের মত নিজ গোত্রের গৌরব ও গর্ব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বীরত্ব ও বিজয়ের কথা যেমন কাব্যে বর্ণনা

---

১. *আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা'-১৩০*
২. *ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল- আদাব আল-'আরাবী-১/৩৪২; ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল- 'আরাবী-২/১০০*
৩. *আশ-শি'র ওয়াশ –শু'আরা'-১৩০*
৪. *শাওকী দায়ফ-২/১০০*
৫. *'উমার ফাররূখ-১/৩৪২*
৬. *আশ-শি'র ওয়াশ –শু'আরা'-১৩০*

করতেন তেমনিভাবে শত্রুকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেও কবিতা রচনা করতেন। বিশেষতঃ বানূ আসাদ-গোত্র ছিল তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রধান বিষয়। কারণ, তাঁর নিজ গোত্র ও বানূ আসাদের মধ্যে সংঘটিত এক যুদ্ধে তাঁর এক ভাই নিহত হয়। এই ভাইয়ের স্মরণে তিনি অনেক শোকগাথা রচনা করেন; তার একটিতে তিনি নিহত ভাইয়ের প্রশংসা করেছেন এভাবে ঃ[৭]

فَتى كَمُلَت أخلاقُهُ غيرَ أنه + جوادٌ فمَا يُبقى من المَال باقيا
فتًى تَمَّ فيه مَا يَسُرُّ صَديقَهُ + عَلَى أن فيه مَا يسوءُ الأعاديا

'সে নৈতিকতা ও চারিত্রিক মাধুর্যে পরিপূর্ণ এক যুবক। তাছাড়া সে এমন দানশীল যে, কোন অর্থ-সম্পদ ধরে রাখতে পারে না।

সে এমন যুবক যে, তার মধ্যে তার আত্মীয়-বন্ধুদেরকে খুশী করার এবং শত্রুদের অখুশী করার যাবতীয় উপাদান পূর্ণতা লাভ করেছে।'

জাহিলী যুগে হীরার লাখমী রাজসভায় তাঁর যাতায়াত ছিল এবং রাজ দরবারের কবিতার আসরে তিনি আরব কবিদের প্রতিনিধিত্বও করতেন। জাহিলী আরবের সমাজ জীবনের অনুসঙ্গ মদ পান, তীর নিক্ষেপ করে শুভ-অশুভ নির্ণয়, মূর্তি পূজা ইত্যাদি অনাচার থেকে তিনি সযত্নে নিজেকে দূরে রাখেন। অতঃপর আরবে ইসলামের অভ্যুদয় হলো, এক সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের নেতা। হিজরী ৯ম সনে তিনি গোত্রের একটা প্রতিনিধিদলকে সংগে করে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। এই সাক্ষাৎকারে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। সেই কবিতার মধ্যে নিম্নের চরণ দু'টিও ছিল ঃ

آتيتُ رَسُولَ الله إذ جَاءَ بِالهدى + وَيتلو كتابًا كَالمجرَّة نَيِّراً

بلغنا السماء مجل نا وجدودُنا + وإنا لنرجوفوق ذلك مظهرا

'আমি আল্লাহর রাসূলের নিকট এসেছি যখন তিনি সত্য -সঠিক পথ সহকারে আবির্ভূত হয়েছেন এবং আকাশের আলোকময় জ্যোতিষ্ক সদৃশ একখানা গ্রন্থ পাঠ করছেন।

আমাদের গৌরব ও কীর্তি এবং আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদেরকে আকাশের উচ্চতায় পৌছে দিয়েছে। কিন্তু তাঁরও উপরে আমরা কোন এক জায়গা প্রত্যাশা করি।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ চরণ দু'টি শোনার পর প্রশ্ন করেন ঃ আবু লায়লা, কোথায় যেতে চাও? তিনি জবাব দিলেন ঃ জান্নাতে। রাসূল (সা) তাঁর এ কবিতা ও জবাব শুনে ভীষণ খুশী হন এবং মন্তব্য করেন ঃ ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ তোমার মুখ বিনষ্ট না করুন।[৮]

---

৭. প্রাগুক্ত-১৩১

৮. ইবন রাশীক, আল-'উমদা-১/২৮; কিতাবুল আগানী ৫/৮; আস-সিবা'ঈ আল- বুয়ুমী, তারীখ আল- আদাব আল- 'আরাবী-১৭০

তিনি একশো তিরিশ বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু তার মুখের দাঁত অটুট ছিল।[৯]
এই কবিতার শেষভাগে তিনি আরো বলেন ঃ

لا خير فى حلمٍ إذا لم تكن له + بوادرُ تحمى صفوهُ أن يكدرا

ولاخير فى جهل إذا لم يكن له + حليم إذا ما اورد الأمر أصدرًا

'এমন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই-যদি না তাতে এমন ধার ও শক্তি থাকে যা তার পরিচ্ছন্নতাকে পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করতে পারে।
আর এমন অসহিষ্ণুতার মধ্যেও কোন কল্যাণ নেই- যদি না তার জন্য এমন কোন সহিষ্ণু ও বিচক্ষণ ব্যক্তি থাকে যে কাজ শুরু করলে সফলভাবে সমাপ্ত করে।'

এমনটি ধারণা করা হয় যে, তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের সাথে নিজের আবাস ভূমিতে ফিরে না গিয়ে একজন মুহাজির হিসেবে মদীনাতেই থেকে যান। অতঃপর ইসলামী বাহিনী যখন পূর্ব দিকে এবং পারস্য অভিযান শুরু করে তিনিও তাদের সাথে জিহাদ ও ইসলামের তাবলীগ ও দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। এ সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)- কে শোনানো কবিতায় আরো বহু কবিতা সংযোজন করেন। সে সব কবিতায় তাঁর ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রিজামন্দী অর্জনের জন্য জিহাদে গমন, খোদাভীতি ইত্যাদির কথা বিধৃত হয়েছে। তার দু'টি চরণ নিম্নরূপঃ

جَاهدتُ حتى ما أحس ومَن مَعى + سُهيلاً إذا ما لاح ثُمَّث غوراً

أقيم على التقوى وأرضى بفعلها + وكنتُ من النار المخوفة أوجرا

'আমি এমনভাবে জিহাদ করেছি যে, আমি এবং আমার সঙ্গী সাথীরা সুহায়ল ও ছুম্মাছ নক্ষত্রের উদয়-অস্তের খবর রাখিনি। আমি তাকওয়া বা খোদাভীতির উপর অবস্থান করে তাকওয়া সম্মত কাজ করি এবং জাহান্নামকে ভয় করি।'

জিহাদে গমনের সময় স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে যে একটি আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় তার একটি বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। তার কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ[১০]

باتت تذكرنى بالله قاعدةً + والدمع ينهلُ من شأنيهما سَبَلا

يا ابنة عمّى كتابُ الله أخرجنى + كُرهًا وهل أمنَعَنّ الله ما فعَلا

فان رجعت فرب الناس يرجعنى + وإن لحَقتُ بربّى فابتغى بدلا

ماكنت أعرَجَ أو أعمى فيعذرنى + أوضارعًا من ضنىً لم يستطع حولاً

৯. আল- ইকদ আল- ফারীদ- ৩/৩৯১-৩৯২
১০. আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা'-১৩১

সে সারা রাত বসে আমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তখন তার দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা বইতে থাকে। আমি বললাম, হে আমার চাচাতো বোন! আল্লাহর কিতাব আমাকে ঘর থেকে বেরোতে বাধ্য করেছে। তুমি কি আল্লাহর কাজে বিরত রাখতে চাও? আমি যদি ফিরে আসি, তবে মানুষের প্রভূই আমাকে ফিরিয়ে আনবেন। আর যদি আমি আমার প্রভূর সাথে মিলিত হই তাহলে আমার বিকল্প অন্য কাউকে খুঁজে নিও। আমি পঙ্গু, অন্ধ এবং নড়াচড়া করতে অক্ষম এমন রোগগ্রস্ত দুর্বল ব্যক্তি নই যে তিনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন।'

পূর্বাঞ্চলীয় যুদ্ধ শেষ করে তিনি এক সময় মদীনায় ফিরে আসেন। কিছুকাল মদীনায় অবস্থানের পর স্বগোত্রে ফিরে যাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তখন খলীফা হযরত 'উছমানের (রা) যুগ। তিনি খলীফার সাথে দেখা করে নিজের মনের অবস্থার কথা জানিয়ে নিজ গোত্রে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। খলীফা অনুমতি দিলেন। তিনি নিজ গোত্রে ফিরে গেলেন এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকলেন। এর মধ্যে ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ অনেকদূর গড়িয়ে গেল। চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিল। তখন আন-নাবিগা (রা) কূফায়। এ দ্বন্দ্বে তিনি 'আলীর (রা) পক্ষ অবলম্বন করেন। সিফফীন যুদ্ধে তাঁকে 'আলীর (রা) পক্ষে দেখা যায়। এ সময় রচিত তাঁর কবিতায় 'আলীর (রা) প্রশংসা ও মু'আবিয়ার (রা) নিন্দা প্রকাশ পেয়েছে। সেই সব কবিতার কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপঃ[১১]

قد علم المصرانِ والعراقُ + آن عليًا فحلُها العتاقُ

إن الألى جارَوكَ لاأفاقوا + لهم سياق ولكم سياق

قد علمت ذلكم الرِّفاق + سُقتُم إلى نَهجِ الهدى وساقوا

إلى التى ليس لها عِراَق + فى ملّةٍ عادتُهَا النِّفاقُ

'দুইটি শহর-বসরা ও কূফা এবং ইরাক জানে যে 'আলী (রা) তাদের সম্মানীয় নেতা। যারা আপনার সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে তারা চেতনা ফিরে পাবে না। তারা তাদের পথে চলবে, আর তোমরা চলবে তোমাদের পথে।

এই দাসেরা যদি জানতো, তোমরা হিদায়াতের পথে চলেছো এবং তারা চলেছে গন্তব্যহীন এক পথে। আর তারা আছে এমন এক মিল্লাতের উপর যার অভ্যাস হচ্ছে নিফাক তথা কপটতা।'

'আলীকে (রা) জিহবা ও বাহু দ্বারা সমর্থন ও সাহায্য করার কারণে মু'আবিয়ার (রা)

---

১১. *কিতাবুল আগানী-৫/৩১*

সমর্থক কবি কা'ব ইবন জু'আয়লের সাথে কবিতার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। বর্ণিত আছে, 'আলীর (রা) শাহাদাতের পর মু'আবিয়া (রা) খিলাফতের মসনদে আসীন হয়ে মদীনার তৎকালীন গভর্নর মারওয়ানকে নির্দেশ দেন আন-নাবিগাকে (রা) তার পরিবার-পরিজনসহ গ্রেফতার ও ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার। আন-নাবিগা (রা) একটি কবিতার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করায় মু'আবিয়া (রা) সদয় হন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দেন।[১২]

গোত্রের একজন অন্ধ সমর্থক হিসেবে তাঁকে গোত্রের ভালোমন্দ সবকিছুকে সমর্থন করতে দেখা যায়। ইসলাম গ্রহণের পরও এ ধারা অব্যাহত থাকে। আর এ কারণে খলীফা 'উমারের (রা) খিলাফতকালে কোন একটি ঘটনায় বসরার তৎকালীন শাসক হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) তাঁকে বেত্রাঘাত করতে বাধ্য হন।[১৩]

গোত্রের প্রতি এই অন্ধ পক্ষপাতিত্বের কারণে আওস ইবন মাগরা'র সাথে কবিতার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। আর তাতে তিনি পরাজিত হন। ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী বলেন, আওস তেমন কোন বড় মাপের কবি ছিল না। এক পর্যায়ে তিনি গোত্রের একটি দলের সাথে ইসফাহানে যান এবং সেখানে সাওয়ার ইবন আওফা আল-কাশয়ারী ও তাঁর স্ত্রী লায়লা আল-আখলিয়্যার সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মূলক কবিতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। কাব্য ক্ষেত্রে তাঁদের কোন খ্যাতি না থাকলেও তিনি তাঁদের নিকট পরাজিত হন। উমাইয়্যা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আল-আখতালের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তথা হিজা কবিতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। সে ক্ষেত্রেও তিনি পরাজিত হন। আর এই হিজা কবিতা রচনার প্রতিযোগিতায় তিনি 'উকায়ল ইবন খালিদের মত একজন আনাড়ি কবির নিকটও পরাজিত হন। সম্ভবতঃ ইসলাম তাঁর অন্তরের গভীরে শিকড় গেঁড়ে বসায় তিনি পরাজিত হয়েছেন। তখন তিনি অশালীন নিন্দা কবিতা রচনার রুচি হারিয়ে ফেলেন।[১৪]

জাহিলী যুগে তিনি কবি আন-নাবিগা আয -যুবয়ানীর অনুসারী ছিলেন। কিন্তু আয-যুবয়ানীর খ্যাতি তার সকল যোগ্যতাকে ম্লান করে দেয়।[১৫]

উমাইয়্যা খলীফা ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার সময় মক্কায় গিয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ও খিলাফতের দাবীদার হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়রের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর প্রশংসায় 'রা' (ر) অন্ত্যমিল বিশিষ্ট বিখ্যাত কাসীদাটি রচনা করেন। তার দু'টি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ

---

১২. শাওকী দায়ফ-২/১০২
১৩. প্রাগুপ্ত-২/১০৭
১৪. প্রাগুক্ত- ২/১০২
১৫. 'উমার ফাররূখ- ১/৩৪৩

حكيتَ لنا الصِّدِّيقَ لما وَلِيتَنَا + وعثمانَ والفارُوق فارتاح معدم

وَسَوَّيتَ بين الناس فى العدل فاستَووا + فعاد صباحا حالكُ الليل مُظلِمُ

'আপনি যখন আমাদের কর্তৃত্বের অধিকারী হলেন, তখন আমাদের নিকট আবূ বকর সিদ্দীক, 'উছমান ও 'উমার ফারূকের (রা) বর্ণনা করলেন, আর তাতে এ হতভাগা উৎফুল্ল হলো।

'আপনি সাম্য ও ন্যায় বিচারে মানুষের মধ্যে সমতা বিধান করলেন। ফলে তারা সবাই সমান হয়ে গেল। আর রাতের ঘোর অন্ধকার কেটে গিয়ে প্রভাতের আলো ফুটে উঠলো।'

'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়র (রা) সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রতি যথেষ্ট বদান্যতা প্রদর্শন করেন। এরপর আন-নাবিগা আবার ইসফাহানে ফিরে যান। সেখানে ফেরার অল্প কিছু দিনের মধ্যে তিনি মারা যান। সেটা খ্রী. ৬৮৪ হিজরী ৬৫ সন।[১৬] এবং খলীফা মারওয়ান ইবন আল- হাকামের খিলাফতের শেষ অথবা 'আবদুল মালিকের খিলাফতের সুচনা সময়। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং বার্দ্ধক্যে অন্ধ হয়ে যান।[১৭]

তিনি কত বছর জীবন লাভ করেন সে সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মত পার্থক্য দেখা যায়। ইবন কুতায়বা একশো বিশ বছরের কথা বলেছেন।[১৮] অনেকে একশো তিরিশ, আবার কেউ কেউ একশো আশি বা তার চেয়ে বেশী বছরের কথা বলেছেন।[১৯]

একথা সত্য যে ইসলামের আলোয় যে সকল আরব কবির জীবন আলোকিত হয়ে উঠেছিল কবি আন-নাবিগা আল-জা'দী তাঁদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী শিক্ষায় নিজেকে গড়ে তোলার জন্য জন্মভূমিতে আর ফিরে যাননি। বেশ কয়েকটি বছর মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) একান্ত সান্নিধ্যে কাটান। তারপর 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' তে লাগাতার অনেকগুলো বছর ব্যয় করেন। কুরআন তিলাওয়াত তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়। বিনয় ও ভীতির সাথে রাত-দিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন। সুতরাং অন্য সব 'মুখাদরাম' কবির কবিতার মত তাঁর কবিতায়ও ইসলামের প্রভাব সুস্পষ্ট। বহু কবিতায় তিনি তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির কথা বলেছেন।[২০] যেমন ঃ

---

১৬. তাবাকাত আশ-শু'আরা'-২৭; 'আল্লামা আয-যিরিকলী- হি. ৫০/খ্রী.৬৭০ সনের কথা বলেছেন। (আল- আ'লাম- ৬/৫৮)

১৭. 'উমার ফাররূখ- ১/৩৪২

১৮. আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা'-১৩০

১৯. শাওকী দায়ফ- ২/১০২

২০. কিতাবুল হায়ওয়ান- ৩/৫০৪

مَنَعَ الغَدرَ فَلَم أهمُم به + وأخو الغدر إذا هَمَّ فَعَل

خَشيَةُ اللهِ وَأنّى رَجُلٌ + إنَّمَا ذكرى كنارٍ بِقبَلِ

'প্রতারণা করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আমি প্রতারণার প্রতি কোন গুরুত্বই দিইনা। আর একজন প্রতারক যখন ইচ্ছা করে তখন তা করেই ছাড়ে।

আর আল্লাহর ভয় এবং আমি একজন মানুষ। আমার যিক্‌র পাহাড়ের চূড়ায় প্রজ্জলিত আগুনের মত।'

ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়ে, পৌত্তলিকতার অন্ধকার থেকে দীনে হানীফের আলোতে বেরিয়ে আসার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ তাঁর প্রতি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন সে কথা তিনি তাঁর কবিতায় বারবার বহুভাবে বলেছেন।যেমনঃ[২১]

عُمِّرتُ حتى جاء أحمَدُ بالهدى + وقوارع تُتلى من القرآنِ

ولبستُ مل الإسلام ثوبًا واسعًا + من سَيبِ لا حَرِمٍ ولا مَنّانَ .

'আমি বেঁচে ছিলাম। অবশেষে আহমাদ এলেন হিদায়াত ও বহু বিপদ-আপদের কথা নিয়ে-যা আল কুরআন থেকে পাঠ করা হয়।

'আমি ইসলামের প্রশস্ত পোশাক পরলাম যা দাতার দান। কোন নিষেধকারীর বা অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ নয়।'

দীর্ঘ কাসীদার দু'একটি শ্লোকেই শুধু তিনি ইসলামী ভাবের কথা বলেছেন, অথবা দু'একটি খণ্ড কবিতায় ইসলামের মূল বাণী উচ্চারণ করেছেন-একথা ঠিন নয়। বরং এমন কিছু দীর্ঘ কবিতা দেখা যায় যাতে তিনি ইসলামী বিশ্বাস ও জীবন বৈশিষ্টের কথা চমৎকার উপদেশ মূলক ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেছেন। একটি দীর্ঘ কবিতার কয়েকটি চরণ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ[২২]

الحمدُ للهِ لا شريك له! + من لم يَقُلها فنفسَهُ ظَلَما

المُولجُ الليل فى النهارو فى اللّيـ + ـل نَهَاراً يُفرِّجُ الظلما

الخافضِ الرافعِ السَّمَاءَ عَلى الأ + رضِ وَلَم يبنِ تحتَهَا دَعَمَا

الخالقُ البَارئُ المُصوِّر فى الأ + رحام ماء حتى يصيرَ دما

'সকল প্রশংসা আল্লাহর যাঁর কোন শরীক নেই। যে ব্যক্তি একথা উচ্চারণ না করবে নিজের উপর জুলুম করবে।

---

২১. *শারীফ আল- মুরতাদা, কিতাবুল আমালী-১/২৬৬*
২২. *আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা'-১৩২*

তিনি রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর তিনি অন্ধকার দূরীভূত করেন।
আকাশকে তিনি মাটির উপরের উর্দ্ধলোকে কোন স্তম্ভ ছাড়াই স্থাপন করেছেন। তিনি স্রষ্টা ও উদ্ভাবক। মায়ের গর্ভে পানিকে রক্তের রূপ দেন এবং তাদ্বারা প্রাণীকুল সৃষ্টি করেন।'
আন-নাবিগা (রা) এই কবিতার সূচনাতে আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। সাথে সাথে এ ঘোষণাও দিয়েছেন যে, তাঁর কোন শরীক নেই। এই কবিতার সবটুকু ভাব আল-কুরআন হতে গৃহীত। শুধু ভাবই নয়, বহু শব্দ ও বাক্যও কুরআন থেকে চয়নকৃত। যেমন তিনি বলেছেন- الحمدُ لله। বাক্যটি আল-কুরআনের। তাছাড়া তিনি বলেছেন-

المولجُ الليلَ فی النَّهار وَفی الليل نهاراً .

যা আল-কুরআনের এ আয়াতের সামান্য পরিবর্তন ঃ

يُولِجُ الليلَ فی النَّهار وَيُولِجُ النَّهارَ فی الليل.[২৩]

এ ছাড়া আল-কুরআনের বহু আয়াতের ভাব এতে বিধৃত হয়েছে।
তাঁর উপরিউক্ত কবিতার আরো কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ

ياأيها الناس هل ترون إلى + فارس بادت وخد رَغما
أمسواعبيدا يرعون شاءكم + كأنما كان ملكُهم حلُما
أوسبأ الحاضرين مآربَ إذ+ يَبنَونَ من دُونَ سَيله العرما
فُمزِّقوا فی البلاد واعترفُوا ال + هُون وذاقوا البآساءَ والعدَمَا

'হে লোক সকল! ইরানীদের দেখ, তারা বিতাড়িত হয়ে কেমন অবমাননা ভোগ করছে। এখন তারা দাস হয়ে তোমাদের ছাগল চরায়। মনে হয় তাদের সাম্রাজ্য ছিল একটি স্বপ্ন। অথবা সাবার অধিবাসীদের দেখ, যারা মারিব বাঁধের আশে পাশে বসতি স্থাপন করে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল। তারা বিভিন্ন শহরে বিক্ষিপ্ত ও অবমাননাকর জীবন যাপন করছে। কষ্ট ও অভাবের জীবন যাপন করছে।'
মোটকথা, আন-নাবিগা আল-জা'দী (রা) একজন বিশুদ্ধ ভাষী স্বভাবগত 'মুখাদরাম'[২৪] কবি
অত্যন্ত সহজ সাবলীল তাঁর কবিতা। বানোয়াট শিল্প কারিতার ছোঁয়া তাতে নেই। তবে সঠিক ভাবে তাঁর কবিতা দু'টি প্রান্ত সীমায় দেখা যায় –অতি উন্নত ও অতি নিম্নমানের। তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কবিতা হলো প্রশংসা, নিন্দা ও বর্ণনা মূলক। যে সকল আরব কবি ঘোড়ার বর্ণনায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[২৫] জ্ঞান ও নীতিকথা মূলক কবিতাও তিনি রচনা করেছেন।[২৬]

---

২৩. সূরা আল- হাজ্জ- ৬১
২৪. যে সকল কবি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ লাভ করেছেন।
২৫. তাবাকাত আশ-শু'আরা'-২৬-২৭; আল- বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২০৬
২৬. জুরজী যায়দান-১/১৭৫; 'উমার ফাররুখ-১/৩৪৩

আল-হুতায়আ (রা)

আল-হুতায়আ প্রকৃত নাম নয়। এটা তাঁর লকব বা উপাধি। প্রকৃত নাম জারওয়াল, আর ডাক নাম আবূ মুলায়কা।[১]

বিশ্রী দৈহিক গঠন ও বেঁটে হওয়ার কারণে তিনি মানুষের নিকট থেকে আল-হুতায়আ নামটি লাভ করেন। শব্দটির মধ্যেই এ অর্থ বিদ্যমান। আওস ইবন মালিক আল-'আবসীর অবৈধ সন্তান। তাঁর মা আদ-দাররা' ছিলেন রিয়াহ ইবন 'আমরের মেয়ের দাসী। তাঁর সাথে অবৈধ মিলনের ফসল এই আল-হুতায়আ। তারপর আল-কাল্ব ইবন কুনায়স ইবন জাবির আল-'আবসী আদ-দাররা'কে বিয়ে করে। এই আল-কালবের জন্মেরও কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় আল-হুতায়আর মা আদ-দাররা' ছিলেন বহু পুরুষের শয্যা সঙ্গীনী। সে কথা তিনি ছেলে আল-হুতায়আকে বলতেন এভাবে ঃ لَستَ لو احد ولا لأثنين.

'তুমি একজনেরও নও, দু'জনেরও নও।' অর্থাৎ তুমি বহুজনের সন্তান।[২]

উল্লেখ্য যে, আল-হুতায়আর জন্ম ইসলামপূর্ব জাহিলী যুগে।

একটা অস্পষ্ট পিতৃ-পরিচয় নিয়ে তিনি আওস ইবন মালিক আল-'আবসীর তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। চারিপাশের জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে বুঝবার বয়স হলে পিতৃ-পরিচয়ের এ অস্পষ্টতা তাঁকে একটা দু:খ ও মানসিক যন্ত্রনার মধ্যে ফেলে দেয়। তারপর তাঁর কুৎসিত চেহারা ও শ্রীহীন দৈহিক গড়ন নিয়ে মানুষের ভ্রূকুটি যখন বুঝতে শেখেন তখন এ দু:খ ও যন্ত্রণা শতগুণ বেড়ে যায়। বানূ 'আবসে তাঁর এ তুচ্ছ ও হেয় অবস্থার কিছুটা প্রতিবিধান করতে পারে এমন সাহস ও বীরত্বও তাঁর মধ্যে ছিল না। যেমন তাঁর পূর্বে কবি 'আনতারা ইবন শাদ্দাদ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অশ্বারোহী দারুণ সাহসী যোদ্ধা এবং একজন বড় মাপের কবি। এ সকল অপূর্ণতা আল-হুতায়আকে সারা জীবন যন্ত্রণা দিয়েছে। আর এ থেকে সৃষ্ট একটা হীনমন্যতাও সব সময় তাঁর মধ্যে কাজ করেছে। ফলে তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় এক অস্বাভাবিক রূঢ়তা এবং নিন্দা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অসামান্য ক্ষমতা।[৩]

বড় হয়ে যখন জানতে পারেন তিনি কারো অবৈধ সন্তান, তখন পিতা-মাতা ও সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। নিজের কাব্য প্রতিভার সবটুকু সমাজ, সমাজের মানুষ, এমন কি পিতা-মাতার নিন্দা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ক্ষেত্রে নিয়োগ করেন। নিজেকে তিনি একেক সময় একেক গোত্রের প্রতি আরোপ করতে থাকেন। জাহিলী যুগে 'আবস ও যুবইয়ান গোত্রদ্বয়ের মধ্যে ঘোড়দৌড়কে কেন্দ্র করে দাহিস ও আল-গাবরা' নামক যে

১. *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা'-১৪৮*

২. ড. *'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব-আল-'আরাবী ১/৩৩১*

৩. ড. *শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব-আল-'আরাবী ২/৯২*

রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘ যুদ্ধ হয়, আল-হুতায়আ সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।[৪]

সেকালের বিখ্যাত কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমা অপেক্ষাকৃত নবীন কবিদের কবিতা রচনার কলা-কৌশল শিক্ষা দিতেন। যেমন-শব্দ চয়ন, উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ ইত্যাদি। তাঁর পুত্র এবং পরবর্তীকালের বিখ্যাত কবি কা'বেরও (রা) কবিতার হাতে খড়ি হয় তাঁর নিকট। আল-হুতায়আর মধ্যে কাব্য প্রতিভার উন্মেষ হওয়ার পর তিনি যুহায়রের সাহচর্যে যান এবং তাঁর নিকট থেকে কবিতার জ্ঞান লাভ করেন।[৫]

তিনি কবি যুহায়র ও তাঁর পুত্র কবি কা'বের কবিতার রাবী বা বর্ণনাকারীও ছিলেন। মানুষের মুখে মুখে তাঁর নামটি–উচ্চারিত হোক এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পাক, এই উদ্দেশ্যে তিনি কবি কা'বকে (রা) অনুরোধ করেন তাঁর কিছু চরণে তাঁর নামটি উল্লেখ করার জন্য।[৬]

জাহিলী যুগে কাব্য ক্ষেত্রে কবি যুহায়রের একটা স্বতন্ত্র ধারা ও বলয় গড়ে ওঠে। যাকে যুহায়রীয় ধারা বলা যেতে পারে। সব রকমের দোষ-ত্রুটিমুক্ত একটা স্বচ্ছ ও ঝরঝরে প্রকাশ-রীতি ও সুক্ষ্ম ভাব ও অর্থের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা ছিল এ ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আরব উপ-দ্বীপে ইসলামের অভ্যুদয় হলো। অন্য অনেকের মত তিনি ইসলামের আহবানে দ্রুত সাড়া দিলেন না। মক্কা বিজয়ের পর তিনি কবি কা'ব ইবন যুহায়রের (রা) মত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন, নাকি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর ইসলাম গ্রহণ করেন সে ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে।[৭]

তবে খলীফা আবূ বকরের (রা) খিলাফতকালে রিদ্দা তথা ধর্মত্যাগের যে প্লাবন সৃষ্টি হয় তাতে আল-হুতায়আকেও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে দেখা যায়। এ সময় তিনি তাঁর কাব্য-প্রতিভাকে আবূ বকর (রা) ও তাঁর খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য ধর্মত্যাগীদের উৎসাহ দানের কাজে লাগান। যেমন একটি কবিতার দু'টি শ্লোক নিম্নরূপঃ[৮]

أطعنا رسولَ الله اذ كان بيننا + فيالعباد الله ما لأبى بكر

---

৪. ড. 'উমার ফাররূখ-১/৩৩২

৫. তাবাকাত আশ-শু'আরা'-২১; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন ১/২০৪, ২০৬.

৬. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা'-৬৯; হাসান যায়্যাত, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-(মিসর)-১৪৮

৭. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা'-১৪৮; ড. 'উমার ফাররূখ ১/৩৩২.

৮. কিতাবুল আগানী-২/১৫৭; আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা'-১৪৮। কোন কোন বর্ণনায় শ্লোক দু'টো আল-হুতায়আর ভাই আল-খুতায়লের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (আত-তাবারী-২/৪৭৭.

أيُورِثها بكراً،اذا مات، بعده + فتلك، وبيت الله، قاصمة الظهر

'আমরা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছি-যখন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। ওহে আল্লাহর বান্দারা! আমাদের উপর আবূ বকর (বকরের পিতা)-এর কিসের অধিকার ?

'তাঁর মৃত্যুর পর তিনি কি এ খিলাফতকে বকরের উত্তরাধিকার বানিয়ে যাবেন ? আল্লাহর ঘরের শপথ! তাহলে সেটা হবে মেরুদণ্ড ভঙ্গকারী প্রচণ্ড আঘাত।' পরে অন্যদের সাথে তিনিও ইসলামে ফিরে আসেন।[৯]

আল-হুতায়আ জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ লাভ করেন। তাঁর বেশীরভাগ কবিতা স্তুতি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মূলক। এ দু'টি ক্ষেত্রে তাঁর অধিক পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়। ইমাম আল-আসমা'ঈ তাঁর পরিচয় তুলে ধরেছেন এ ভাবে ঃ[১০]

كان الحطيئة جشعا سؤولا ملحفا دنئ النفس، كثير الشر، قليل الخير، بخيلا، قبيح المنظر، رث الهيئة، مغموز النسب فاسد الدين، وما تشاء أن تقول فى شاعر من عيب إلا وجدته، وقلما تجد ذلك فى شعره

'আল-হুতায়আ ছিলেন প্রচণ্ড লোভী, বাড়াবাড়ি রকমের ভিক্ষুক স্বভাবের ও নীচ প্রকৃতির। তাঁর মধ্যে অকল্যাণ বেশী এবং কল্যাণ কম। দারুণ কৃপণ, দেখতে কুৎসিত, জীর্ণ-শীর্ণ অবয়ব, কটাক্ষকৃত বংশ এবং বিকৃত ধর্ম বিশ্বাস ছিল তাঁর। কোন কবির মধ্যে যে দোষের কথাই বলতে চাওনা কেন, তা তুমি হুতায়আর মধ্যে পাবে। তবে তাঁর কবিতার মধ্যে সে দোষ তুমি খুব কমই দেখতে পাবে।' ইবন কুতায়বা তাঁকে দুর্বল ধার্মিক ও নীচ স্বভাবের বলেছেন।[১১]

আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী বলেছেন, তিনি জারজ সন্তান হলেও মর্যাদাবান ব্যাক্তিতে পরিণত হন।[১২]

আল-আসমা'ঈ ও ইবন কুতায়বার এ বক্তব্যে হয়তো কিছুটা অতিরঞ্জন থাকতে পারে, তবে এটা সত্য যে সেই জাহিলী যুগে তাঁর কাব্য প্রতিভার উন্মেষকাল থেকে আরবের বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের প্রশংসা মূলক কবিতা লিখতেন এবং বিভিন্ন গোত্রের পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও গৌরব ও আভিজাত্যের প্রতিযোগিতায় তিনি একটি পক্ষ নিয়ে তাদের প্রশংসা ও প্রতিপক্ষের নিন্দায় কবিতা রচনা করতেন। যেমন, 'উয়ায়না ইবন হিস্‌ন আল-ফিযারী ও তার চাচাতো ভাই যাববান ইবন সায়্যারের মধ্যে

---

৯. ড. শাওকী দায়ফ-২/৯৬.

১০. কিতাবুল আগানী (দারুল কুতুব)-২/১৬৩.

১১. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা'-১৪৮

১২. ড. উমার ফাররূখ-১/৩৩৪.

যে ঝগড়া হয় তাতে তিনি 'উয়ায়নার পক্ষ নেন। তেমনি ভাবে 'আলকামা ইবন 'উলাছা, ও 'আমির ইবন আত-তুফায়লের সেই চরম বিরোধে তাঁকে 'আলকামার পক্ষে দেখা যায়। অথচ সে ঘটনায় তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ দু'জন কবি-আল-আ'শা ও লাবীদ তাঁর প্রতিপক্ষ 'আমিরের সাথে ছিলেন।[১৩] 'আলকামার ছেলেরা হুতায়আকে বাচ্চাসহ একশো'টি উষ্ট্রী দান করে।[১৪]

যিবরিকান ইবন বাদারের (রা) সাথে আল-হুতায়আর একটি ঘটনা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। ঘটনাটি হলো, খলীফা 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে আল-হুতায়আ মদীনার দিকে যাচ্ছেন। পথে যিবরিকান ইবন বাদারের সাথে দেখা। যিবরিকান তখন তাঁর গোত্রের যাকাত আদায়কারীর দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আল-হুতায়আকে নিজ গৃহে নিয়ে যান। যিবরিকানের গোত্রের প্রতিপক্ষ বানূ আন্‌ফ আন-নাকা গোত্রের লোকেরা এ খবর পাওয়ার পর আল-হুতায়আকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। যিবরিকানের স্ত্রী আল-হুতায়আর অভ্যর্থনায় কিছুটা ত্রুটির পরিচয় দেন। বানূ আন্‌ফ আন-নাকা সুযোগটি গ্রহণ করে। তারা আল-হুতায়আকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তাঁর প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করে। তাদের এ ব্যবহারে আল-হুতায়আ তাদের প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেন। তাতে যিবরিকানের নিন্দামূলক নিম্নের শ্লোকটিও জুড়ে দেনঃ

دع المكارم لا ترحل لبغيتها + واقعد فإنك انت الطاعم الكاسى

'উৎকৃষ্ট গুণাবলীর চিন্তা পরিত্যাগ কর এবং তা অর্জনের আশায় কোথাও যেও না। আর তুমি ঘরে বসে থাক, অন্যরা তোমাকে খাওয়াবে-পরাবে।'

যিবরিকান অপমান বোধ করলেন। তিনি খলীফা 'উমারের (রা) কাছে ছুটে গেলেন এবং তাঁকে কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনিয়ে উপরোক্ত শ্লোকটির প্রতি খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খলীফা বলেন আমি জানিনে এতে তোমার নিন্দা হয়েছে কিনা। তুমি কি মানুষকে খাদ্য ও বস্ত্রদানকারী হতে পেরে খুশী নও? যিবরিকান বললেন, এরচেয়ে মারাত্মক নিন্দা আর হয় না। অত:পর খলীফা এ ব্যাপারে কবি হাস্‌সান ইবন ছাবিতের (রা) মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, শুধু নিন্দা নয়, তাঁর উপর আক্রমণ চালিয়েছে। 'আমি অবশ্যই তাকে মুসলমানদের মান-ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করা থেকে বিরত রাখবো'-একথা বলে খলীফা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কারাগার থেকে আল-হুতায়আ খলীফা 'উমারের (রা) নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে নিম্নের বিখ্যাত শ্লোক দু'টি লিখে পাঠান ঃ

---

১৩. তাবাকাত আশ-শু'আরা'-৯৩.
১৪. ড. 'উমার ফাররূখ-১/৩৩৪.

ماذا تقول لأفراخ بذى مَرَخٍ + زُغبِ الحواصل لا ماءٌ ولا شجر

ألقيت كاسبهم فى قعر مظلمةٍ + فاغفر عليك سلام الله ياعمر

'যী মারাখ প্রান্তরে অবস্থিত পাখীর বাচ্চাগুলো (কবির সন্তান-সন্তুতি) সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন, যে গুলোর পেটে সবেমাত্র লোম গজাচ্ছে? তাদের পান করার জন্য না আছে পানি, আর ছায়ার জন্য না আছে কোন গাছ।

আপনি তাদের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করেছেন। তাই আপনি ক্ষমা করে দিন। হে উমার! আপনার প্রতি আল্লাহর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক।'

এ কবিতা শুনে খলীফার মন নরম হয়ে যায় এবং তিনি আল-হুতায়আকে এ শর্তে মুক্তি দেন যে, সে ভবিষ্যতে আর কারো নিন্দা করবে না। একথাও বলা হয়েছে যে, তিন হাজার দিরহামের বিনিময়ে খলীফা তাঁর নিকট থেকে মুসলমানের ইজ্জত-আব্রু ক্রয় করেন।[১৫]

যিবরিকানের উদ্দেশ্যে রচিত এই কবিতার মত তাঁর অন্যান্য কবিতা পাঠ করলে বুঝা যায়, তিনি নিন্দা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ক্ষেত্রে অমার্জিত কোন কথা বলতেন না। উল্লেখিত শ্লোক দু'টির মত অতি কোমল ভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামই তাঁর জিহবার তীক্ষ্ণতা অনেকটা হালকা করে দেয়। তাঁর কিছু শ্লোকে তিনি নিজেই সে কথা বলেছেন এভাবে:[১৬]

ولما أن مدحتُ القوم قلتم + هجوتَ ولا يحلُّ لك الهجاءُ

ألم أكُ مسلماً فيكون بينى + وبينكم المودّةُ والاخاءُ

ولم أشتُم لكم ولكم حسبا ولكن + حدوتُ بحيث يُستَمَعُ الحُدَاءُ

'আমি যখন কোন সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেছি, তোমরা বলেছো, তুমি নিন্দা করেছো এবং নিন্দা করা তোমার জন্য বৈধ নয়। আমি কি মুসলমান নই এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কি ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব নেই?

আমি তোমাদের বংশ নিয়েও কোন গালি দিই নি। তবে আমি এমন কিছু গান গেয়েছি যা শোনা হয়।'

উপরোক্ত শ্লোকগুলোতে তিনি ইসলামী নৈতিকতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার বাইরে যাওয়াকে খারাপ কাজ মনে করেছেন। তিনি বানূ আনফ আন-নাকা, 'আলকামা ইবন 'উলাছা, হযরত 'উছমানের খিলাফতের সময় কূফার আমীর আল-ওয়ালীদ ইবন

১৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/৪২০; কিতাবুল আগানী-২/১৭৯; আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা'-১৪৯-১৫১.

১৬. ড: শাওকী দায়ফ-২/৯৮.

'উকবা, সা'ঈদ ইবন আল-'আস এবং মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান (রা) প্রমুখের প্রশংসায় কবিতা লিখে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। 'আলীর (রা) খিলাফতকালে তাঁকে তেমন দৃশ্যপটে দেখা যায় না।

আল-হুতায়আ তাঁর শিক্ষক যুহায়রের মত কবিতার শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। যুহায়র সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একটি কবিতা রচনার পর এক বছর পর্যন্ত তা ঘষামাজা ও কাটছাঁট করতেন। তারপর তা মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন। তাঁর ছাত্র হিসেবে আল-হুতায়আও তাই করতেন। কবিতার প্রতিটি চরণ সমান ভাবে শিল্প শোভন না হওয়া পর্যন্ত তিনি পরিমার্জন করতেন। দীর্ঘ কবিতায় তিনি সূচনা করতেন প্রাচীন আরবের কাব্য-রীতি অনুসরণে অতীত প্রেম-প্রীতির স্মৃতিচারণ, মরুভূমির দৃশ্য এবং তথাকার বন্য ও পালিত জীব-জন্তুর বর্ণনার মাধ্যমে। তাঁর প্রশংসামূলক কবিতা গুরু যুহায়রের কবিতার মতই শিল্প সুষমা মণ্ডিত।[১৭]

বানূ আন্‌ফ আন-নাকার প্রশংসা করে আল-হুতায়আ বলছেন ঃ[১৮]

يسوسون أحلامًا بعيداً أناتُها + وان غضبوا جاء الحفيظة والجدُّ
أولئك قوم ان بنوا أحسنوا البنا + وان عاهدوا أوفوا وان عقدوا شدواْ

'এসব লোক আত্মম্ভরিতা থেকে দূরে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ধারণ করেন। ক্রুদ্ধ হলে গম্ভীর হয়ে যান। তাঁরা এমন লোক যে, যখন নির্মাণ করেন তখন সুন্দর ভাবে নির্মাণ করেন, অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করেন। কারো সংগে কোন চুক্তি করলে সেটা পাকাপাকি ভাবে করেন।'

বানূ আন্‌ফ আন-নাকা অর্থ উষ্ট্রীর নাকের গোত্র। এ নামের কারণে লোকে এ গোত্রের লোকদেরকে লজ্জা দিত। তিনি যখন যিবরিকান ও তাঁর গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে নিম্নের শ্লোকটি রচনা করলেন তখন থেকে এ নামটি উক্ত গোত্রের জন্য গর্ব ও গৌরবের প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো। শ্লোকটি এই ঃ[১৯]

قوم هم الأنفُ والأذناب غيرهم + ومن يُسَوِّى بأنف الناقة الذنبا

'তারা এমন সম্প্রদায় যাদের গোত্রটি নাক এবং অন্য লোকেরা হচ্ছে লেজ। কেউ উটের লেজকে নাকের সমান বলে দাবী করতে পারে?'

বর্ণনাকারীগন আল-হুতায়আকে কৃপণ স্বভাব এবং হীনমন্য বলে যেমন চিত্রিত করেছেন, তেমনি তাঁর ঈমান ও আমল, তথা বিশ্বাস ও কর্মের শৈথিল্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর এমন বহু বাণী ও শ্লোক পাওয়া যায় যাতে তাঁর চরিত্রের উল্টো

---

১৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২০৪, ২০৬; ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাত আশ-শু'আরা'-২১.

১৮. শাওকী দায়ফ-২/৯৮.

১৯. প্রাগুক্ত.

দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন তিনি প্রশংসামূলক কবিতায় প্রশংসাভাজন ব্যক্তির জন্য দু'আ করেছেন ঃ

فليجزه الله خيراً من أخى ثقة + وليَهده بُهدى الخيرات هاديها

'নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাঁকে কল্যাণময় প্রতিদান দিন। আর ভালো কাজের দিকে পথ প্রদর্শনকারী তাঁকে ভালো কাজের পথ দেখান।' কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্রশংসামূলক কবিতার সূচনা করেছেন আল্লাহর হাম্‌দ-এর মাধ্যমে। যেমন ঃ[২০]

الحمد لله إنى فى جوارفتىً + حامى الحقيقة نفَّاعٍ وضرَّارٍ

'সকল প্রশংসা আল্লাহর যে, আমি এমন এক যুবকের আশ্রয়ে আছি যে সত্য ও বাস্তবতার সাহায্যকারী, কল্যাণকারী ও অনিষ্টকারী।'

আবূ 'আমর ইবন আল-'আলা' বলেছেন: আরবের কোন কবি আল হুতায়আর নিম্নের শ্লোকটির চেয়ে বেশী সত্য শ্লোক আর বলেনিঃ[২১]

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه + لا يذهب العُرف بين الله والناس

'যে ভালো কাজ করে, তার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে না। আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে পূণ্য বিনষ্ট হবে না।'

নীচের এই দু'টি শ্লোকেও বুঝা যায়, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি একজন ভালো ও পরিচ্ছন্ন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। আর তাই তিনি মুত্তাকী ও নেক আমল সম্পর্কে বলতে পেরেছিলেন।[২২]

ولست أرى السـعادة جمع مالٍ + ولكن التقى هو السـعيدُ
وتقوى الله خير الزاد ذخراً + وعند الله للأتقى مزيد

'ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকে আমি কোন সৌভাগ্য বলে মনে করিনে। বরং আল্লাহকে যে ভয় করে সেই সৌভাগ্যবান।

আল্লাহর ভয় উৎকৃষ্ট পাথেয় ও সঞ্চয় এবং আল্লাহভীরু লোকের জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে বিরাট ছাওয়াব।' তিনি বিশ্বাস করেন, দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব ও ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্ভোগের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন সৌভাগ্য নেই। আখিরাত ও তথাকার স্থায়ী আরাম-আয়েশই হলো প্রকৃত সৌভাগ্য। আর তা কেবল তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতির মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। একজন ভালো মুসলমান না হলে এমন কথা বলতে পারতেন না।

আল-হুতায়আকে কৃপণ স্বভাবের বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁর বহু কবিতায় তিনি অতিথি

---

২০. প্রাগুক্ত-২/৯৯

২১. প্রাগুক্ত

২২. কিতাবুল আগানী-২/১৭৫

সেবা ও দানশীলতার কথা বলেছেন। যারা একাজ করে তাদের ভূয়ষী প্রশংসা করেছেন। তিনি "طاوى ثلاث" (তিন রাত্রি অভূক্ত ব্যক্তি) শীর্ষক কবিতায় একটি প্রতীকী গল্প অথবা বাস্তব ঘটনার অবতারণা করেছেন, যাতে তাঁর নিজের এবং তাঁর সন্তানদের সীমাহীন অতিথি সেবার মানসিকতার চিত্র ফুটে উঠেছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই রকমঃ একবার তাঁর গৃহে একজন অতিথি আসে। অতিথির সামনে দেয়ার মত তাঁদের কাছে কোন খাবার ছিল না। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, তাঁর একটি ছেলেকে হত্যা করে তার মাংস দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করবেন। ছোট্ট ছেলেটিও পিতার মনোভাব বুঝে যায় এবং সেও তার পিতাকে এমন কাজ করতে উৎসাহিত করতে থাকে। কিন্তু এমন সময় তিনি দূরের মুরুভূমিতে একদল বন্যগাধা দেখতে পান। সেগুলোকে ধাওয়া করে একটি ধরে ফেলেন এবং তার গোশত দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করেন। তার অবুঝ ছেলেটি বেঁচে যায়। কবিতাটির কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপঃ[২৩]

وقال ابنه، لما رأه بحيرة : + أياأبت، اذبحنى ويسرله طعما
ولا تعتذر بالعُدم، علّ الذى طرا + يَظن لنا مالاً فيوسعنا ذما
فقال: هيا ربّاهُ، ضيف ولا قرى + بحقك، لا تحرمهُ تالليلة لحما

'ছেলে যখন তার পিতাকে হতবিহবল দেখতে পেল তখন বললোঃ হে আমার পিতা! আমাকে জবাই করে তার আহারের ব্যবস্থা করুন।

দারিদ্রের কথা বলে তার কাছে অক্ষমতা প্রকাশ করবেন না। অনেক দূর থেকে সে আমাদের নিকট এসেছে। সে মনে করবে আমাদের অর্থ-সম্পদ আছে। তারপর অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের দুর্নাম করে বেড়াবে।

তিনি (কবি) বললেন: হে আমাদের প্রভূ! অতিথি এসেছে, তাকে আহার করানোর মত কিছু নেই। তোমার সত্তার শপথ! আজকের রাতটি তাকে তুমি মাংস থেকে বঞ্চিত করো না।'

এভাবে দীর্ঘ কবিতাটি এগিয়ে চলেছে।

তিনি কবিতাটি শেষ করেছেন এভাবেঃ

وباتو اكراماً قدقضو احق ضيفهم + وما غرموا غرمًا وقدغنموا غنما

'তারা তাদের অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করার পর সবাই সম্মান ও মর্যাদার সাথে রাত্রি যাপন করে। তাদের কিছু মাত্র ক্ষতি হয়নি। বরং তারা অনেক লাভবান হয়েছে।'

আল-হুতায়আ হি:৫৯/খ্রী: ৬৭৮ সনে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন।[২৪]

---

২৩. দ্র: 'উমার ফাররূখ-১/৩৩৭
২৪. প্রাগুক্ত-১/৩৩৪

খানসা বিন্‌ত 'আমর ইবন আশ-শারীদ (রা)

হযরত খানসার আসল নাম 'তুমাদির'। চপল, চালাক-চোস্ত স্বভাব ও মন কাড়া চেহারার জন্যে খান্‌সা নামে ডাকা হতো। খান্‌সা অর্থ বন্যগাভী ও হরিণী। শেষ পর্যন্ত আসল নামটি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় এবং খানসা নামেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।১ পিতার নাম 'আমর ইবন শারীদ। তিনি ছিলেন কায়স গোত্রের সুলায়ম খান্দানের সন্তান।২ বানূ সুলায়ম হিজায ও নাজদের উত্তরে বসবাস করতো।৩

দুরায়দ ইবন আস-সিম্মাহ্ ছিলেন প্রাচীন আরবের একজন বিখ্যাত নেতা। খানসার বিয়ের বয়স হওয়ার পর দুরায়দ একদিন দেখলেন, অতি যত্ন সহকারে খানসা তাঁর একটি উটের গায়ে ওষুধ লাগালেন, তারপর নিজে পরিচ্ছন্ন হলেন। এতে দুরায়দ মুগ্ধ হলেন এবং তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। খানসা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে ঃ৪

أترانى تَاركَةً بَنِى عَمِّى كَأَنَّهُم عَوَالِى الرِّمَاحِ وَمُرتَثَّةً شَيخِ بَنِى جُشَم؟

'তুমি কি দেখতে চাও যে, আমি আমার চাচাতো ভাইদেরকে এমনভাবে ত্যাগ করি যেন তারা তীরের উপরিভাগ এবং বানু জুশামের পরিত্যক্ত বৃদ্ধ ?'

দুরায়দ প্রত্যাখ্যাত হয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি বরেন, বিভিন্ন গ্রন্থে যার কিছু অংশ সংকলিত হয়েছে। তার দুইটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ৫

حُيُّوا تُمَاضِرَوَ اربِعُوا صَحبِى + وقِفُوا فَإنَّ وَقُوفَكُم حَسبِى

أخنَاسُ قَد هَامَ الفُؤَادُ بِكُم + وَأَصَابَةَ تَبلُ مِنَ الحُبِّ.

হে আমার সাথী-বন্ধুগণ, তোমরা তুমাদিরকে স্বাগতম জানাও এবং আমার জন্য অপেক্ষা কর। কারণ, তোমাদের অবস্থানই আমার সম্বল। খুনাস (হরিণী) কি তোমাদের হৃদয়কে প্রেমে পাগল করে তুলেছে এবং তার ভালোবাসায় তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছো?'

দুরায়দের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর খানসা বিয়ে করেন স্বগোত্রীয় যুবক রাওয়াহা ইবন 'আবদিল 'উয্‌যাকে। তাঁর ঔরসে পুত্র আবূ শাজারা 'আবদুল্লাহর জন্ম হয়। কিছুদিন পর রাওয়াহা মারা গেলে তিনি মিরদাস ইবন আবী 'আমরকে বিয়ে করেন।

---

১. *সাহাবিয়াত-পৃ. ১৮১*

২. *উসুদুল গাবা-৫/৪৪১; আল-ইসাবা-৪/২৮৭*

৩. *ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব-১/৩১৭*

৪. *ইবন কুতায়বা, আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-পৃ.১৬০*

৫. *আল-ইসাবা-৪/২৮৭*

এই দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করে দুই পুত্র-ইয়াযীদ ও মু'আবিয়া এবং এক কন্যা 'উমরা'।৬

মক্কায় যখন রিসালাত-সূর্যের উদয় হয় এবং তার কিরণে সারা বিশ্ব আলোকিত হয়ে ওঠে তখন খানসার (রা) দুই চোখ বিশ্বাসের দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে। তিনি নিজ গোত্রের কিছু লোকের সাথ মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে ছুটে যান এবং ইসলামের ঘোষণা দান করেন। এ সাক্ষাতে তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। রাসূল (সা) দীর্ঘক্ষণ ধৈর্যসহকারে তাঁর আবৃত্তি শোনেন এবং তাঁর ভাষার শুদ্ধতা ও শিল্পরূপ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে আরো শোনার আগ্রহ প্রকাশ করেন।৭

খানসা (রা) কবি ছিলেন। তবে তিনি কাব্য জীবনের প্রথম পর্বে মাঝে মধ্যে দুই/চারটি বয়েত (শ্লোক) রচনা করতেন। আরবের বিখ্যাত আসাদ গোত্রের সাথে তার গোত্রের যে যুদ্ধ হয়, তাতে তাঁর আপন ভাই মু'আবিয়া নিহত হন এবং সৎ ভাই সাখর প্রতিপক্ষের আবূ ছাওর আল-আসাদী নামে এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত নিযায় মারাত্মকভাবে আহত হন। প্রায় এক বছর যাবত সীমাহীন কষ্ট- ক্লেশ সহ্য করে ভাইকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ক্ষত খুব মরাত্মক ছিল। প্রিয় বোনকে দু:খের সাগরে ভাসিয়ে তিনি একদিন ইহলোক ত্যাগ করেন।৮

খানসা (রা) তাঁর পরলোকগত দুইটি ভাইকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। বিশেষত সাখরের জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য, বীরত্ব, দানশীলতা, সুদর্শন চেহারা ইত্যাদি কারণে তাঁর স্থান ছিল খানসার (রা) অন্তরের অতি গভীরে। এ কারণে তার মৃত্যুতে তিনি সীমাহীন দুঃখ পান। আর সে দিন থেকেই তিনি সাখরের স্মরণে অতুলনীয় সব মরসিয়া (শোকগাথা) রচনা করতে থাকেন।৯ ইবন কুতায়বা বলেন ঃ১০

وَلَمْ تَزَلْ تَبْكِيهِ حَتَّى عَمِيَتْ

'সাখরের শোকে কাঁদতে কাঁদতে তিনি অন্ধ হয়ে যান।'

সাখরকে এত গভীরভাবে ভালোবাসার একটি কারণ ছিল। খানসা (সা) বিয়ে করেছিলেন এক অমিতব্যয়ী ভদ্র যুবককে। তিনি তাঁর সকল অর্থ-সম্পদ বাজে কাজে উড়িয়ে দিয়ে নি:স্ব হয়ে যান। খানসা গেলেন ভাই সাখরের নিকট স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে। কিন্তু সাখর তাঁর সম্পদের অর্ধেক বোনের হাতে তুলে দিলেন। তিনি

---

৬. আস-সুয়ূতী, দুররুল মানছুর পৃ. ১১০; আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ, পৃ.১৬০
৭.উসুদুল গাবা-৫/৪৪১; আল-ইসাবা-৪/৫৫০
৮.আল-ইসতী'আব (আল -ইসাবার পার্শ্বটীকা)-৪/২৯৬
৯. উসুদুল গাবা-৫/৪৪১
১০. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬১

তা নিয়ে স্বামীর ঘরে ফিরে গেলেন। উড়নচণ্ডে স্বামী অল্প দিনের মধ্যে তাও শেষ করে ফতুর হয়ে যায়। খানসা (রা) আবার গেলেন সাখরের নিকট। এবারও সাখর তাঁর সম্পদ সমান দুই ভাগ করে ভালো ভাগটি বোনকে দেন।[১১] এভাবে সাখর তাঁর সৎ বোনের অন্তরের গভীরে এক স্থায়ী আসন গড়ে তোলেন।

সাখরের স্মরণে রচিত মরসিয়ায় হযরত খানসা (রা) এমন সব অন্তর গলানো শব্দে নিজের তীব্র ব্যথা- বেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন যা শুনে বা পাঠ করে মানুষ অস্থির না হয়ে পারে না। যে কোন লোকের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তাতে বিধৃত আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে প্রফেসর আর.এ. নিকলসন বলেছেন ঃ [১২]

'It is impossible to translate the poignant and vivid emotion, the energy of passion and noble simplicity of style which distinguish the poetry of Khansa.'

তার একটি মরসিয়ার কয়েকটি বয়েত নিম্নে উদ্ধৃত হলো, যাতে তার শিল্পরূপ, অলঙ্করণ ও স্টাইল প্রত্যক্ষ করা যায়।

اَعَينَىَّ جُوداً وَلاَ تَجمُدَا + آلاَ تَبكيانِ لِصَخرِ النَّدَى

آلاَ تَبكيَانِ الجَرِىَّ الجَمِيلَ + آلاَ تَبكيَانِ الفَتى السَّيِّدى

طَوِيلُ النَّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ + وَسَادَ عَشيرَتَهُ امرَدَا

إذَا القَومُ مَدُّوا بِأَيدِيهِم + إلى المَجدِ ثُمَّ مَضَى مَسعدَا

تَرَى المَجدَ يَهدِى إلى بَيته + يرى فضَلُ المَجدِ آن يُّحمَد

وَإن ذكَرَ المَجدَ اَلفُتيَةُ + تآذُّ رَبالـمجدِ ثُمَّ ارتَدَى

' হে আমার দুই চোখ, উদার হও, কার্পণ্য করোনা। তোমরা কি দানশীল সাখরের জন্য কাঁদবে না ? তোমরা কি কাঁদবে না তার মত একজন সাহসী ও সুন্দর পুরুষের জন্য ? তোমরা কি কাঁদবে না তার মত একজন যুব- নেতার জন্য?

তার অসির হাতল অতি দীর্ঘ,[১৩] ছাইয়ের স্তূপ বিশালকায়।[১৪] সে তার গোত্রের নেতৃত্ব তখনই দিয়েছে যখন সে ছিল অল্প বয়সী।

যখন তার গোত্র কোন সম্মান ও গৌরময় কর্মের দিকে হাত বাড়িয়েছে, সেও দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সুতরাং সে সম্মান ও সৌভাগ্য নিয়েই চলে গেছে।

১১.ড. উমার ফাররূখ-১/৩১৭

১২. A Literary History of the Arabs-P. 126

১৩.'অসির হাতল দীর্ঘ' হওয়ার অর্থ সে ছিল দীর্ঘাকৃতির।

১৪. সে ছিল খুবই অতিথি সেবক। আর সে কারণে তার গৃহে ছাইয়ের বিশাল স্তূপ হয়ে গেছে।

তুমি দেখতে পাবে যে, সম্মান ও মর্যাদা তার বাড়ীর পথ বলে দিচ্ছে। সর্বোত্তম মর্যাদাও তার প্রশংসা করা উচিত বলে মনে করে।

যদি সম্মান ও আভিজাত্যের আলোচনা করা হয় তাহলে তুমি তাকে মর্যাদার চাদর গায়ে জড়ানো অবস্থায় দেখতে পাবে।'

প্রাচীন আরবের নারীদের অভ্যাস ও প্রথা অনুযায়ী খানসা (সা) তাঁর ভাইয়ের কবরের পাশে সকাল-সন্ধ্যায় গিয়ে বসতেন, তাকে স্মরণ করে মাতম করতেন এবং স্বরচিত মরসিয়া পাঠ করতেন। সেই সব মরসিয়ার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ ১৫

يُذَكِّرُنِى طُلُوعُ الشَّمسِ صَخرا + وَاذكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمسِ

وَلَو لاَ كَثرَةُ البَاكِينَ حَولى + على مَوتَا هُم لَقَتَلتُ نَفسِى

'প্রতিদিন সূর্যোদয় আমাকে সাখরের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। আর আমি তাকে স্মরণ করি প্রতিটি সূর্যাস্তের সময়। যদি আমার চার পাশে নিজ নিজ মৃতদের জন্য প্রচুর বিলাপকারী না থাকতো, আমি আত্মত্যাগ করতাম।'১৬

آلاَ يَا صَخرُ ان بَكَيتَ عَينَىَّ + فَقد اضحَكتَنِى زَمَنًا طَوِيلاً

بَكَيتُكَ فِى نِسَاءِ مُعوِلاَت + وَكُنتُ أَحَقُّ مَن أَبدَى اَلعَوِيلاَت

دَفَعتُ بِكَ الخُطُوبَ وَاَنتَ حَىٌّ + فَمَن ذَا يَدفَعُ الخَطبَ الجَمِيلاَ

إذَا قَبُحَ البُكَاءُ عَلى قَتِيلٍ + رَاَيتُ بُكَاءَكَ الحُسنَ الجَمِيلاَ

'ওহে সাখর, যদি তুমি আমার দুই চোখকে কাঁদিয়ে থাক, তাতে কি হয়েছে। তুমি তো একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমাকে হাসিয়েছো।

আমি তোমার জন্য কেঁদেছি একদল উচ্চকণ্ঠে বিলাপকারিণীদের মধ্যে। অথচ যারা উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করে তাদের চেয়ে উচ্চ কণ্ঠে বিলাপ করার আমিই উপযুক্ত।

তোমার জীবনকালে তোমার দ্বারা আমি বহু বিপদ-আপদ দূর করেছি। এখন এই বড় বিপদ কে দূর করবে ?

যখন কোন নিহত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা খারাপ কাজ, তখন তোমার জন্য কান্নাকে আমি একটি খুবই ভালো কাজ বলে মনে করি।'

সাখরের মান ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ১৭

---

১৫. সাহাবিয়াত-১৮৪

১৬. প্রাগুক্ত

১৭. আশ-শি'রু ওয়াশ-শু'আরাউ- ১৬২

إنَّ صَخرًا لَتَأتَمُّ الهُدَاةُ بِه + كَأنَّهُ عَلَمٌ فِى رَأسه نَارٌ

'বড় বড় নেতৃস্থানীয় মানুষ সাখরের অনুসরণ করে থাকে। সাখর এমন একটি পাহাড় সদৃশ যার শীর্ষদেশে আগুন জ্বলছে।'

অর্থাৎ আরবের মানুষ যেমন পর্বত শীর্ষের প্রজ্জলিত আগুনের আলোতে পথ খুঁজে পায়, তেমনিভাবে সাখরের অনুসরণেও পথ পায়।

সাখরের স্মরণে তিনি নিম্নের শোকগাথাটিও রচনা করেন ঃ[১৮]

ألا مَا لِعَينِى ألاَ مَا لَهَا + لَقَد أخضلَ الدَّمعُ سِربَالَهَا

أمن بعد صخرٍ من آلِ الشَّرِيد + حَلَّت بِه الآرضُ أثقالَهَا

فَآلَيتُ أسَى عَلى هَالكٍ + وَآسَألُ بَاكِيَةً مالَهَا

وَهَمَّت بِنفسِى كُلُّ الهُمُومِ + فَأولِى لِنَفسِى أولى لَهَا

سَأحمل نَفسِى على خَطَّة + فَإمَّا عَلَيهَا وَإمَّا لَهَا

'ওহে আমার চোখের কি হয়েছে, ওহে তার কী হয়েছে? সে তার জামা অশ্রু দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে। আশ-শারীদের বংশধর থেকে সাখরের মৃত্যুর পরে যমীন কি তার ভারমুক্ত হয়েছে?

(আরবরা বলে থাকে, একজন দু:সাহসী অশ্বারোহী যমীনের জন্য ভীষণ ভারী। তার মৃত্যু অথবা হত্যায় যমীন সেই ভার থেকে মুক্ত হয়) অতঃপর আমি একজন ধ্বংস হয়ে যাওয়া ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা প্রকাশের জন্য শপথ করে বসেছি। আর কান্নারত অবস্থায় প্রশ্ন করছি-তার কী হয়েছে?

সে নিজেই সকল দু:খ-কষ্ট বহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং আমার নিজের জন্য ভালো কষ্টগুলো অধিক উপযোগী।

আমি নিজেকে একটি পথ ও পন্থায় বহন করবো–হয়তো তা হবে তার বিপক্ষে অথবা পক্ষে।'

একবার খানসাকে বলা হলো ঃ আপনার দুই ভাইয়ের কিছু গুণের কথা বলুন তো। বললেন ঃ

كَانَ صَخْرُ وَاللّه جُنَّةَ الزَّمَانِ الأغبَرِ، وَزُعَافَ الخَمِيسِ الا خمرِ وكَانَ وَاللّه مُعَاوِيَةُ القَائلَ وَالفَاعِلَ

'আল্লাহর কসম, সাখর ছিল অতীত সময়ের একটি ঢাল এবং পাঁচহাতী নেযার বিষাক্ত লাল ফলা। আর আল্লাহর কসম, মু'আবিয়া একজন যেমন বক্তা, তেমনি করিৎকর্মা।'

---

১৮. আল- 'ইকদুল ফারীদ-৩/২৬৮

আবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো ঃ দুইজনের মধ্যে কে বেশী উঁচু মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী ? বললেন ঃ

أَمَّا صَخْرٌ فَحَرُّ الشِّتَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَبَرْدُ الْهَوَاءِ .

'সাখর হচ্ছে শীতকালের উষ্ণতা, আর মুআবিয়া হচ্ছে বাতাসের শীতলতা। আবার প্রশ্ন করা হলো ঃ কার ব্যথা বেশী তীব্র ? বললেন ঃ

أَمَّا صَخْرٌ فَجَمْرُ الْكَبِدِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَسُقَامُ الْجَسَدِ

'আর সাখর, সে তো হৃদপিণ্ডের কম্পন। আর মু'আবিয়া হচ্ছে শরীরের জ্বর।' তারপর তিনি নিম্নের পংক্তি দুইটি আবৃত্তি করেন ঃ

أَسَدَانِ مُحمَرا الْمَخَالِبَ نَجدَةً + بَحرانِ فِى الزَّمنِ الْغَضُوبَ الأنمر

قَمَرَانِ فِى النادى رَفِيعًا مُحتَدٍ + فِى الْمَجد فَرعًا سودد متخير

'তারা দুইজন হলো দু:সাহসী রক্ত লাল পাঞ্জাওয়ালা সিংহ, রুক্ষ মেজাজ ক্রুদ্ধ কালচক্রের মধ্যে দুইটি সাগর, সভা-সমাবেশে দুই চন্দ্র, সম্মান ও মর্যাদায় অত্যুচ্চ, পাহাড়ের মত নেতা ও স্বাধীন।'[১৯]

এখানে উদ্ধৃত এ জাতীয় মর্মস্পর্শী মরসিয়া রচনা ও উক্তির বদৌলতে হযরত খানসা (রা) ইসলাম-পূর্ব গোটা আরবে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মরসিয়া রচয়িতা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে যান।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পর হযরত খানসা (রা) মাঝে-মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতেন। তিনি তৎকালীন আরবের প্রথা অনুযায়ী শোকের প্রতীক হিসেবে মাথায় একটা কালো কাপড় বেঁধে রাখতেন। একবার হযরত 'আয়িশা (রা) তাকে বললেন, এভাবে শোকের প্রতীক ধারণ করা ইসলামে নিষেধ। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পরে আমিও এ ধরনের কোন শোকের প্রতীক ধারণ করিনি। খানসা (রা) বললেন, নিষেধ–একথা আমার জানা ছিলনা। তবে আমার এ প্রতীক ধারণ করার একটা বিশেষ কারণ আছে। 'আয়িশা (রা) কারণটি জানতে চাইলেন।

খানসা (রা) বললেন ঃ আমার পিতা যার সাথে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, সে ছিল তার গোত্রের এক নেতা। তবে ভীষণ উড়নচণ্ডে মানুষ। তার ও আমার সকল অর্থ-সম্পদ জুয়া খেলে উড়িয়ে দেয়। আমরা যখন একেবারে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়লাম তখন আমার ভাই সাখর তার সব অর্থ-সম্পদ সমান দুই ভাগ করে ভালো ভাগটি আমাকে দেয়। আমার স্বামী কিছুদিনের মধ্যে তাও উড়িয়ে ফেলে। সাখর আমার দুরবস্থা দেখে দু:খ প্রকাশ করে এবং আবার তার সকল সম্পদ সমান দুই ভাগ করে ভালো ভাগটি

---

১৯. প্রাগুক্ত-৩/২৬৭

আমাকে বেছে নিতে বলে। তার স্ত্রী তখন বলে ওঠে, এর আগে একবার খানসাকে তোমার সম্পদের অর্ধেক দিয়েছো–তাও ভালো ভাগটি, এখনও আবার ভালো ভাগটি বেছে নিতে বলছো। তা এভাবে আর কতকাল চলবে ? তার স্বামীর অবস্থা তো সেই পূর্বের মতই আছে। সে জুয়া খেলেই সব শেষ করে ফেলবে। সাখর তখন স্ত্রীকে নিম্নের বয়েত দুইটি আবৃত্তি করে শোনায় ঃ২০

وَاللهِ لاَ أمنَحُهَا شِرَارَهَا + وَهِيَ حِصَانٌ قَد كَفَتَنِى عَارَهَا

وَلَو هَلَكتُ مَزَّقَت خِمَارَهَا + وَجَعَلَت مِن شَعَرٍ صِدَارَهَا

'আল্লাহর কসম, আমি তাঁকে আমার সম্পদের নিকৃষ্ট অংশ দিব না। সে একজন সতী-সাধ্বী নারী, আমার জন্য তার হেয় ও লাঞ্ছনা যথেষ্ট। আমি মারা গেলে সে তার ওড়না আমার শোকে ফেড়ে ফেলবে এবং কেশ দিয়ে শোকের প্রতীক ফেটা বানিয়ে নিবে।'

উম্মুল মু'মিনীন, তাই আমি তার স্মরণে শোকের এই প্রতীক ধারণ করেছি।২১

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালের কোন এক সময় খানসা (রা) গেলেন খলীফার দরবারে। তখন তার বয়স পঞ্চাশ বছর এবং তখনও তিনি মৃত ভাইদের জন্য শোক প্রকাশ করে চলেছেন। তার দুই চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে ঝরতে গণ্ডদেশে দাগ পড়ে যায়। খলীফা প্রশ্ন করেন ঃ খানসা, তোমার মুখে এ কিসের দাগ? তিনি বলেন ঃ এ আমার দুই ভাইয়ের জন্য দীর্ঘদিন কান্নার দাগ। খলীফা বললেন ঃ তাদের জন্য এত শোক কেন, তারা তো জাহান্নামে গেছে। খানসা (রা) জবাব দিলেনঃ২২

ذلكَ ادعىَ لِحُزنِى عَلَيهِمَا ، لَقَد كُنتُ مِن قَبلُ أبكِى لَهُمَا مِنَ الثأرِ وَأنَا اليَومُ أبكِى لَهُمَا مِنَ النَّارِ .

'তাদের জন্য আমার শোক করার এটাই বড় কারণ। পূর্বে তাদের রক্তের বদলার জন্য কাঁদতাম, আর এখন কাঁদি তাদের জাহান্নামের আগুনের জন্য।'

ইবন কুতায়বার বর্ণনা মতে খানসা (রা) বলেন ঃ২৩

كُنتُ أبكِى لِصَخرٍ مِنَ القَتلِ فَأنَاأبكِى لَهُ اليَومَ مِنَ النَّارِ

'আগে কাঁদতাম সাখরের নিহত হওয়ার জন্য। আর এখন কাঁদি তার জাহান্নামের শাস্তির কথা ভেবে।'

---

২০. প্রাগুক্ত; আল-ইসাবা-৪/২৯৬
২১. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬১
২২. ড. 'উমার ফাররূখ-১/৩১৭
২৩. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬১; আল-'ইকদুল ফারীদ-৩/২৬৬

হযরত খানসা (রা) জাহিলী জীবন থেকে ইসলামী জীবনে উত্তরণের পর আচার ও সংস্কারে এবং চিন্তা ও বিশ্বাসে একজন খাঁটি মুসলমানে পরিণত হন। নিরন্তর জিহাদই যে একজন সত্যিকার মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য-একথাটি তিনি অনুধাবনে সক্ষম হন। আর এ জন্য তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কুরবানী করতে কুণ্ঠিত হন নি।

হিজরী ষোল সনে খলীফা 'উমারের (রা) খিলাফতকালে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক কাদেসিয়া যুদ্ধ। এ যুদ্ধে বিশাল পারস্য বাহিনী অত্যন্ত সাহস ও দক্ষতার সাথে মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করে। উভয় পক্ষের অসংখ্য সৈনিক হতাহত হয়। হযরত খানসা (রা) তাঁর চার ছেলেকে সংগে করে এ যুদ্ধে যোগ দেন। চূড়ান্ত যুদ্ধের আগের রাতে তিনি চার ছেলেকে একত্র করে তাদের সামনে উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক যে ভাষণটি দান করেন ইতিহাসে তা সংরক্ষিত হয়েছে। আমরা তার কিছু অংশ পাঠকদের সামনে তুলে ধরলামঃ২৪

يابُنَىَّ، أنتم اسلمتُم طائعينَ، وهَاجَرتُم مُختَارِينَ، وَوَاللهِ الَّذى لاإله غَيرُهُ، إنَّكُم لَبنُو رَجُلٍ واحد، كَمَا أنَّكُم بَنُو إمرَأةٍ واحدَة، مَا خُنتُ أبَاكُم، وَلاَ فَضحتُ خَالكُم، وَلاَ هَجَّنتُ حَسَبَكُم، وَلاَ غَيَّرتُ نَسَبَكُم، وَقَد تعلمُونَ مَا اعَدَّ اللهُ لِلمُسلمينَ منَ الثَّواب العَظِيم فى حَرب الكافرينَ، واعلمُوا أنَّ الدَّارَ البَاقيَةَ خَيرٌ منَ الدَّار الفَانيَة، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يا آيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا واتَّقُوا اللهَ لعَلَّكُم تُفلحُونَ- فَإذا اَصبَحتُم غدًا، فَاغدُوا إلى قتَالِ عَدُوِّكُم مَستبصرينَ، وَللهِ عَلَى أعدائه مُستَنصرينَ

'আমার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা আনুগত্য সহকারে ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং হিজরাত করেছ স্বেচ্ছায়। সেই আল্লাহর নামের কসম-যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমরা একজন পুরুষেরই সন্তান, যেমন তোমরা একজন নারীর সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, তোমাদের মাতুল কুলকে লজ্জায় ফেলিনি এবং তোমাদের বংশ ও মান-মর্যাদায় কোন রকম কলঙ্ক লেপনও করিনি। তোমরা জান, কাফিরদের সঙ্গে জিহাদে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য কত বড় সাওয়াব নির্ধারণ করে রেখেছেন। তোমরা এ কথাটি ভালো করে জেনে নাও যে, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের চেয়ে পরকালের অনন্ত জীবন উত্তম। মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ 'হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা

২৪. *খাযানাতুল আদাব-১/৩৯৫; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-১/২৩১; আল-ইসাবা-৪/২৮৮*

অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।'(আলে ইমরান-২০০) আগামীকাল প্রত্যুষে তোমরা শত্রু নিধনে দূরদর্শিতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সাহায্য কামনা করবে।'

মায়ের অনুগত ছেলেরা কান লাগিয়ে মায়ের কথা শুনলো। রাত কেটে গেল। প্রত্যুষে তারা একসাথে আরবী কবিতার কিছু পংক্তি আওড়াতে আওড়াতে রণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেল।২৫ এক পর্যায়ে তারা চূড়ান্ত রকমের বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে সকলে শাহাদাত বরণ করে। শাহাদাতের খবর মা খানসা (রা) শোনার পর যে বাক্যটি উচ্চারণ করেন তা একটু দেখার বিষয়। তিনি উচ্চারণ করেনঃ২৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي شَرَّفَنِي بِقَتْلِهِم، وَأَرْجُوا مِن رَبِّي أَن يَجْمَعَنِي بِهِم فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِه .

'সকল প্রশংসা আল্লাহর- যিনি তাদেরকে শাহাদাত দান করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর আমি আমার রবের নিকট আশা করি, তিনি আখিরাতে তাঁর অনন্ত রহমতের ছায়াতলে তাদের সাথে আমাকে একত্র করবেন।'

যে মহিলা জাহিলী যুগে এক সৎ ভাইয়ের মৃত্যুতে সারা জীবন মরসিয়া লিখে ও শোক প্রকাশ করে সারা আরবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন, তিনিই এভাবে একসাথে চার ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাদের জন্য মাতম, শোকগাথা রচনা বা শোকের প্রতীক ধারণ- কোন কিছু করেছেন বলে কোন কথা জানা যায় না। ঈমান কী পরিমাণ মজবুত হলে এমন হওয়া যায়?

খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর ছেলেদের জীবদ্দশায় প্রত্যেককে এক শো দিরহাম করে ভাতা দিতেন। শাহাদাতের পরেও তাদের ভাতা হযরত খানসার (রা) নামে জারি রাখেন। তিনি আমরণ সে ভাতা গ্রহণ করেন।২৭

কবি হিসেবে হযরত খানসার (রা) স্থান

আরবী কবিতার প্রায় সকল অঙ্গনে খানসার (রা) বিচরণ দেখা যায়। তবে মরসিয়া রচনায় তার জুড়ি মেলা ভার। 'আল্লামা ইবনুল আছীর লিখেছেনঃ২৮

أَجمَعَ أَهلُ العلمِ بِالشِّعرِ أَنَّهُ لَم يَكُن إِمرَأَةٌ قَبلَهَا وَلاَ بَعدَهَا أَشعَرُ منهَا.

'আরবী কাব্যশাস্ত্রের পণ্ডিতরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, খানসার পূর্বে ও পরে

---

২৫. আল-কুরতুবী ও ইবন হাজার সেই সব পংক্তির অনেকগুলি তাদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন। (আল-ইসতী'আব-৪/২৯৬; আল-ইসাবা-৪/২৮৮)

২৬. উসুদুল গাবা-৫/৪৪২; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-১/২৩১

২৭. আল-ইসাবা-৪/২৮৮; খাযানাতুল আদাব-১/৩৯৫, ড. উমার ফাররুখ-১/৩১৮

২৮. উসুদুল গাবা-৫/৪৪১

তাঁর চেয়ে বড় কোন মহিলা কবির জন্ম হয়নি।'

উমাইয়্যা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরব কবি জারীর (মৃত্যু- ১১০ হি)। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল- আরবের শ্রেষ্ট কবি কে? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ২৯

أنا لولا الخنساء 'যদি খানসা না থাকতেন তাহলে আমিই।'

বাশশার বিন বুরদ ছিলেন 'আব্বাসী যুগের একজন শ্রেষ্ঠ আরব কবি। তিনি বলেন, আমি যখন মহিলা কবিদের কবিতা গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করি তখন তাদের প্রত্যেকের কবিতায় একটা না একটা ত্রুটি ও দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করি। লোকেরা প্রশ্ন করলো ঃ খানসার কবিতারও কি একই অবস্থা ? বললেন ঃ তিনি তো পুরুষ কবিদেরও উপরে।৩০

সকল আরব কবি উমাইয়্যা যুগের লায়লা উখাইলিয়্যাকে একমাত্র খানসা (রা) ছাড়া আরব মহিলা কবিদের মাথার মুকুট জ্ঞান করেছেন। আধুনিক যুগের মিশরীয় পণ্ডিত ডঃ 'উমার ফাররূখ হযরত খানসার কাব্য প্রতিভা ও তাঁর কবিতার মুল্যায়ন করেছেন এভাবে ঃ৩১

خنساءُ أعظمُ شَواعِرَ العَرَبِ عَلى الإ طلاقِ، شعرُهَا مُقطَعَات كُلُّهُ، وَهُوَ فَصِيحُ اللَّفظِ رَقِيقُ مَتِينُ السَّبك رائِقُ الدِّيبَاجَة، وَقَد غَلَبَ عَلى شِعرِهَا الفَخرُ قَليلاً والرِّثاَء كَثيراً لَمَا رَأينَا من فَجيعَتِهَا بِآخوَيهَا خَاصة. وَرثاوُهَا وَاضِحُ المَعَانِى رَقِيقُ صَادِقُ العَاطِفة، بَدَوِىُّ المَذهَبِ عَلى كَثرَةِ مَا فِيهِ مِنَ التَّلهُّف وَالمُبَالغَة فِى ذكرِ مَحَامِد أَخَوَيهَا.

'খানসা সার্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ আরব কবি। তাঁর কবিতা সবই খণ্ড খণ্ড। অত্যন্ত বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল, সূক্ষ্ম, শক্ত গঠন ও চমৎকার ভূমিকা সম্বলিত। তাঁর কবিতায় গৌরব গাথার প্রাধান্য অতি সামান্য। যতটুকু আমরা দেখেছি, বিশেষত তার দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে তিনি যে দুঃসহ ব্যথা পান সে জন্য মরসিয়ার প্রাধান্য অনেক বেশী। তার মরসিয়ার অর্থ স্পষ্ট, সূক্ষ্ম ও কোমল এবং আবেগ-অনুভূতির সঠিক মুখপত্র। তাতে অত্যধিক দু:খ ও পরিতাপ এবং দুই ভাইয়ের প্রশংসায় অতিরঞ্জন থাকা সত্ত্বেও তা বেদুইন পদ্ধতি ও ষ্টাইলের।'

জাহিলী যুগে সমগ্র আরবের বিভিন্ন স্থানে মেলা-প্রদর্শনী ও সভা-সমাবেশ করার রীতি ছিল। এর উদ্দেশ্য হতো পরস্পর মত বিনিময়, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। এতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ অংশ গ্রহণ করতো।

---

২৯. দুররুল মানছুর-১১০

৩০ তাবাকাত আশ-শু'আরাউ-২৭১

৩১. তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৩১৮

সমগ্র আরববাসী দূর দূরান্ত থেকে এসব মেলায় ছুটে আসতো। এর সূচনা হতো রাবী'উল আওয়াল মাস থেকে। এ মাসের প্রথম দিন দুমাতুল জান্দালে বছরের প্রথম মেলা বসতো। এই মেলা শেষ করে তারা হিজরের বাজারে চলে যেত। তারপর উমানে, সেখান থেকে হাদরামাউতে। তারপর ইয়ামনের সান'আর আশে-পাশে কোথাও দশ, আবার কোথাও বিশ দিন অবস্থান করতো। এভাবে গোটা আরব ঘোরার পর হজ্জের কাছাকাছি সময়ে জুলকা'দা মাসে মক্কার কয়েক মাইল দূরে 'উকাজের[৩২] বাজারে বছরের সর্বশেষ মেলা বসতো। এ মেলাটি ছিল আরবের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ। আরবের সকল গোত্রের লোক, বিশেষত গোত্র-নেতারা এ মেলায় অবশ্যই যোগদান করতো। কোন গোত্র-নেতা কোন কারণে অংশ গ্রহণ করতে না পারলে প্রতিনিধি পাঠাতো। এ মেলার অঙ্গনে আরববাসী তাদের গোত্রীয় নেতা নির্বাচন, আন্ত-গোত্র কলহের মীমাংসা, পারস্পরিক হত্যা ও সংঘাতের অবসান ইত্যাদি বিষয়ের চূড়ান্ত করতো। এই মেলায় মক্কার কুরায়শ গোত্রের সম্মান ও মর্যাদা ছিল সবার উপরে। যখন যাবতীয় বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যেত তখন প্রত্যেক গোত্রের কবিরা তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাতো। সে সব কবিতার বিষয় হতো বীরত্ব, সাহসিকতা, দানশীলতা, অতিথি সেবা, পূর্ব পুরুষের শৌর্য-বীর্য, গৌরব, শিকার, আনন্দ-উৎসব, খুন-খারাবি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শান্তি-সন্ধি, প্রেম-বিরহ, শোক ইত্যাদির বর্ণনা। এখানে নির্ধারিত হতো আরব কবিদের স্থান ও মর্যাদা।

কবি খানসাও এ সকল মেলা ও সমাবেশে অংশ গ্রহণ করতেন এবং 'উকাজে তাঁর মরসিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে স্বীকৃতি পায়। তিনি যখন উটের উপর সাওয়ার হয়ে আসতেন তখন অন্য কবিরা তার চার পাশে ভীড় জমাতো। সবাই তাঁর কবিতা শোনার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকতো। এক সময় সকলকে মরসিয়া শুনিয়ে তৃপ্ত করতেন।

এ সকল মজলিসে খানসার বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক হিসেবে তাঁর তাঁবুর দরজায় একটি পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হতো, আর তাতে লেখা থাকতো أرثى العرب কথাটি। যার অর্থ আরবের শ্রেষ্ঠ মরসিয়া রচয়িতা। ইবন কুতায়বা বলেন ঃ[৩৩]

---

৩২. 'উকাজ ঃ নাখলা ও তায়িফের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সেখানে সাধারণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার বসতো। ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে এ বাজারের পত্তন হয় এবং হিজরী ১২৯ সনে খারেজীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার সময় পর্যন্ত চালু ছিল। (ডঃ আবুদল মুন'ইম খাফাজী ও ড. সালাহ উদ্দীন আবদুত তাওয়াব ঃ আল-হায়াত আল-আদাবিয়্যা ফী 'আসরায় আল-জাহিলিয়্যা ওয়া সাদরিল ইসলাম-পৃ.২৮) তারপর খারেজীদের ভয়ে সেই যে 'উকাজের বাজার বন্ধ হয়ে যায়, আজ পর্যন্ত আর চালু হয়নি। 'উকাজের পর আরবের মাজান্না ও জুল মাজাযের মত প্রাচীন বাজারও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। মক্কার এ জাতীয় সর্বশেষ বাজারটি ধ্বংস করা হয় ১৯৭ হিজরীতে (আল-আযরুকী ঃ আখবারু মাক্কাহ-১২১-২২)

৩৩.আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬১; সিফাতু জাযীরাতিল 'আরাব-২৬৩

كانت تَقِفُ بِالموسِمِ فَتَسُومُ هَودَجَهَا بِسُومَةٍ وتَعَاظَمَ العَرَبُ بِمُصِيبَتِهَا بِأَبِيهَا عَمروٍ واخَوَيهَا صَخرٍ ومُعَاوِيةَ وتُنشِدُهُم فَتَبكِي النَّاسُ .

'তিনি এ সব মৌসুমী মেলায় অবস্থান করতেন। তার হাওদাটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হতো। তার পিতা 'আমর এবং দুই ভাই- সাখর ও মু'আবিয়ার মৃত্যুর বিপদটিকে আরববাসী খুব বড় করে দেখতো। তিনি কবিতা পাঠ করতেন, আর লোকেরা কাঁদতো।'

জাহেলী আরবে বহু বড় বড় কবি জন্মেছিলেন। আন-নাবিগা আয-যুবইয়ানী (মৃত্যু ৬০৪ খ্রী.) সেই সব বড় কবিদের একজন। তাঁর কাব্যখ্যাতি আজও বিশ্বজোড়া। তাঁর আসল নাম যিয়াদ ইবন মু'আবিয়া এবং ডাকনাম আবু উমামা। আবূ 'উবায়দা তাঁর সম্পর্কে লিখেছেনঃ৩৪

هُوَ مِنَ الطَّبَقَةِ الأُولى المُقَدَّمِينَ عَلى سَائِرِ الشُّعَراءِ .

'সকল কবির পুরোভাগে অবস্থানকারী প্রথম স্তরের অন্যতম কবি তিনি।' উন্নত মানের প্রচুর কবিতা রচনার কারণে তাঁকে 'আন-নাবিগা' বলা হয়। 'উকাজ মেলায় কেবল তাঁরই জন্য লাল তাঁবু নির্মাণ করা হতো। এ ছিল একটি বিরল সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক, যা কেবল তিনি লাভ করার যোগ্য বলে ভাবা হতো। অন্য কারও জন্য এমন লাল তাঁবু নির্মাণ করা যেত না। এর কারণ, কাব্য ক্ষেত্রে যিনি সর্বজন মান্য, কেবল তিনিই এ মর্যাদা লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। ইবন কুতায়বা বলেনঃ৩৫

وكَانَ النَّابِغَةُ تُضرَبُ لَهُ قُبَّةٌ حَمراءُ مِنَ آدَمٍ بِسُوقِ عُكاظٍ وتَأتِيهِ الشُّعَراءُ فَتَعرِضُ عَلَيهِ أشعَارَهَا .

'আন-নাবিগার জন্য 'উকাজে লাল রঙ্গের চামড়ার তাঁবু টাঙ্গানো হতো। সেই তাঁবুতে কবিরা এসে তাকে কবিতা শোনাতো।'

'উকাজের মেলা উপলক্ষ্যে কবি আন-নাবিগার সভাপতিত্বে কবি সম্মেলন হতো। আরবের বড় বড় কবিরা এ সম্মেলনে যোগ দিতেন এবং নিজ নিজ কবিতা পাঠ করে স্বীকৃতি লাভ করতেন। একবার এমনি এক সম্মেলনে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ তিন কবি-আল-আ'শা আবূ বাসীর, হাস্সান ইবন ছাবিত ও খনসা যোগ দেন। প্রথমে আল-আ'শা, তারপর হাস্সান কবিতা পাঠ করেন। সবশেষে পাঠ করেন খানসা। তাঁর পাঠ শেষ হলে সভাপতি আন-নাবিগা তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

---

৩৪. সাহাবিয়াত-১৮৬
৩৫. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬০

وَاللهِ لولاَ أَنَّ أَبَا بَصِير أَنشَدَنِى انفًا لَقُلتُ إِنَّكِ أَشعَرُ الأنسِ وَالجِنِّ .

'আল্লাহর কসম! এই একটু আগে যদি আবু বাসীর আমাকে তাঁর কবিতা না শোনাতেন তাহলে আমি বলতাম, জিন ও মানুষের মধ্যে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।'

আন-নাবিগার এ মন্তব্য শুনে কবি হাস্‌সান দারুণ ক্ষুব্ধ হন। তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এভাবে ঃ আল্লাহর কসম! আমি আপনার চেয়ে এবং আপনার পিতা ও পিতামহের চেয়েও বড় কবি। আন-নাবিগা হাস্‌সানের হাত চেপে ধরে বলেনঃ

'ভাতিজা, তুমি আমার এ শ্লোকটির চেয়ে ভালো শ্লোক বলতে পারবে কি ?

فَإِنَّكَ كَاللَّيلِ الَّذِى هُوَ مَدرِكِى # وَإِن خِلتُ أَنَّ المُنتَآى عَنكَ وَاسِعٌ

'নিশ্চয় তুমি সেই রাত্রির মত, যে রাত্রি আমাকে ধারণ করে। যদিও আমি ধারণা করেছি, তোমার থেকে আমার দূরত্ব অনেক ব্যাপক।' অর্থাৎ রাত্রির মত তুমি আমাকে বেষ্টন করে আছ–তা আমি যত দূরেই থাকি না কেন।

তারপর তিনি খানসাকে বলেন ঃ 'তাকে আবৃত্তি করে শোনাও।'

খানসা তার আরো কিছু শ্লোক আবৃত্তি করেন। তারপর আন-নাবিগা মন্তব্য করেন

وَاللهِ مَارَأَيتُ ذَاتَ ثَديَينِ أَشعَرُ منك .

'আল্লাহর কসম! আমি দুই স্তনবিশিষ্ট কাউকে তোমার চেয়ে বড় কবি দেখিনি।' অর্থাৎ তোমার চেয়ে বড় কোন মহিলা কবিকে দেখিনি। সাথে সাথে খানসা আন্-নাবিগার কথার সংশোধনী দেন এভাবে-

لا واللهِ ولا ذَا خُصيَينِ

'না, আল্লাহর কসম! দুই অণ্ডকোষধারীদের মধ্যেও না।' অর্থাৎ কেবল নারীদের মধ্যে নয়, বরং পুরুষদের মধ্যেও আপনি আমার চেয়ে বড় কোন কবি দেখেননি।'[৩৬]

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে আন-নাবিগার প্রশ্নের জবাবে হাস্‌সান তাঁর নিম্নের শ্লোকটি পাঠ করে শোনান ঃ

لَنَا الجَفَنَاتُ الغُرُّ يَلمَعنَ فِى الضُّحى # وَأَسيَافُنَا يَقطُرنَ مِنَ نَجدَةٍ دَمًا

'আমাদের আছে অনেক বড় বড় স্বচ্ছ ও ঝকঝকে বরতন, পূর্বাহ্ন বেলায় যা চকচক করতে থাকে। আর আমাদের তরবারিসমূহ এমন যে তার হাতল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরতে থাকে।'

---

৩৬. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী ঃ কিতাবুল আগানী-১১/৬; আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬০,

কবি হাস্‌সান তাঁর শ্লোকে নিজের অতিথি সেবা এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কবি আন-নাবিগা, মতান্তরে খানসা হাস্‌সানের শ্লোকটির কঠোর সমালোচনা করে তার ত্রুটিগুলি তুলে ধরেন এবং তাঁর দাবী প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৭]

মোটকথা, কাব্য শক্তি ও প্রতিভার দিক দিয়ে হযরত খানসার (রা) স্থান দ্বিতীয় স্তরের তৎকালীন আরব কবিদের মধ্যে অনেক উঁচুতে। তার কবিতার একটি দিওয়ান ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈরুতের একটি প্রকাশনা সংস্থা সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দিওয়ানটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হয়।[৩৮]

হযরত খানসার (রা) মৃত্যু সন নিয়ে একটু মত পার্থক্য আছে। একটি মতে হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালের সূচনা পর্বে হিঃ ২৪/ খ্রী. ৬৪৪-৪৫ সনে তিনি মারা যান। পক্ষান্তরে অপর একটি মতে হিঃ ৪২/ খ্রী. ৬৬৩ সনের কথা এসেছে।[৩৯]

---

৩৭. কুদামা ইবন জা'ফার ঃ নাকদুশ শি'র-পৃ-৬২; আল-আগানী-৯/৩৪০

৩৮. সাহাবিয়াত-১৮৮

৩৯. ড. 'উমার ফাররূখ-১/৩১৮।

সাফিয়্যা (রা) বিনত 'আবদিল মুত্তালিব

হযরত সাফিয়্যা (রা) ও হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বংশ ও পূর্ব পুরুষ এক ও অভিন্ন। কারণ হযরত সাফিয়্যা (রা) আবদুল মুত্তালিবের কন্যা এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) মায়ের সৎ বোন হালা বিন্ত ওয়াহাব ছিলেন সাফিয়্যার মা। সুতরাং এ দিক দিয়ে সাফিয়্যার মা রাসূলুল্লাহর (সা) খালা।[১] উহুদের শহীদ, সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা তাঁর ভাই। দুইজন একই মায়ের সন্তান।[২]

জাহিলী যুগে সুফইয়ান ইবন হারবের ভাই হারিছ ইবন হারবের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তার ঔরসে এক ছেলের জন্ম হয়। হারিছের মৃত্যুর পর 'আওয়াম ইবন খুওয়াইলিদের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয় এবং এখানে যুবাইর, সায়িব ও 'আবদুল কা'বা–এ তিন ছেলের মা হন।[৩] উল্লেখ্য যে, এই 'আওয়াম ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা'র (রা) ভাই। অতএব দেখা যাচ্ছে তিনি 'আশারা মুবাশ্শারার অন্যতম সদস্য হযরত যুবাইর ইবনুল 'আওয়ামের গর্বিত মা এবং জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ ও স্বৈরাচারী ইয়াযীদের বাহিনীর হাতে শাহাদাত প্রাপ্ত প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের দাদী।

হযরত সাফিয়্যা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফুদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মত পার্থক্য আছে। একমাত্র তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের কোন দ্বিমত নেই। ইবন সা'দ আরওয়া, 'আতিকা ও অন্য ফুফুদের ইসলাম গ্রহণের কথা বলেছেন। তবে সত্য এই যে, একমাত্র সাফিয়্যা ছাড়া অন্যরা ইসলাম গ্রহণ করেন নি। ইবনূল আছীর একথাই বলেছেন।[৪] তাঁর হিজরাত সম্পর্কে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি স্বামী 'আওয়ামের সাথে মদীনা হিজরাত করেন।ইবন সা'দ শুধু এতটুকু বলেছনঃ[৫]

هاجرت إلى المدينة

'তিনি মদীনায় হিজরাত করেন।'

হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, মক্কায় যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এ আয়াত-

وانذر عشيرتك الأقربين - [৬]নাযিল হয় তখন তিনি দাঁড়িয়ে এভাবে সম্বোধন করেনঃ[৭] 'হে ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মদ, হে সাফিয়্যা বিন্ত 'আবদিল মুত্তালিব, হে 'আবদুল

১.উসদুল গাবা-৫/৪৯২; আল-ইসাবা-৪/৩৪৮
২. তাহজীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৪৯
৩. তাবাকাত-৮/৪২
৪.উসদুল গাবা-৫/৪৯২; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৪৯
৫.তাবাকাত-৮/
৬. সূরা আশ-শু'আরা-২১৪
৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭১

মুত্তালিবের বংশধরেরা, আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। তোমরা আমার ধন সম্পদ থেকে যা খুশি চাইতে পার।'

তিনি কয়েকটি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে তাঁর সাহস ও দৃঢ়তা বিস্ময়কর দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে আছে।

খন্দক মতান্তরে উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) মুসলিম মহিলাদেরকে কবি হাস্‌সান ইবন ছাবিতের (রা) ফারে' দূর্গে নিরাপত্তার জন্যে রেখে যান। এই ফারে' দূর্গকে 'উতুম' দূর্গও বলা হতো। তাঁদের সাথে হযরত হাস্‌সানও ছিলেন। এই মহিলাদের মধ্যে হযরত সাফিয়্যা (রা)ও ছিলেন। একদিন এক ইহুদীকে তিনি দূর্গের আশে-পাশে ঘুর ঘুর করতে দেখলেন। তিনি প্রমাদ গুণলেন, যদি সে মহিলাদের অবস্থান জেনে যায়, ভীষণ বিপদ আসতে পারে। কারণ, রাসূল (সা) তাঁর বাহিনীসহ তখন জিহাদের ময়দানে অবস্থান করছেন। হযরত সাফিয়্যা (রা) বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে হাস্‌সানকে বললেন, এই ইহুদীকে হত্যা কর। তা না হলে সে আমাদের অবস্থানের কথা অন্য ইহুদীদেরকে জানিয়ে দেবে। হাস্‌সান (রা) বললেন, আপনার জানা আছে, আমার নিকট এর কোন প্রতিকার নেই। আমার মধ্যে যদি সেই সাহস থাকতো তাহলে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথেই থাকতাম। সাফিয়্যা তখন নিজেই তাঁবুর খুঁটি হাতে নিয়ে ইহুদীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করেন। তারপর হাস্‌সানকে (রা) বলেন, যাও, এবার তার সঙ্গের জিনিসগুলি নিয়ে এসো। যেহেতু আমি নারী, আর সে পুরুষ, তাই একাজটি আমার দ্বারা হবে না। এ কাজটি তোমাকে করতে হবে। হাস্‌সান বললেন, ঐ জিনিসের প্রয়োজন নেই।[৮]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত সাফিয়্যা (রা) লোকটিকে হত্যার পর মাথাটি কেটে এনে হাস্‌সানকে বলেন, ধর, এটা দূর্গের নীচে ইহুদীদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে এসো। তিনি বলেন ঃ এ আমার কাজ নয়। অত:পর হযরত সাফিয়্যা (রা) নিজেই মাথাটি ইহুদীদের মধ্যে ছুঁড়ে মারেন। আর ভয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সাফিয়্যা (রা) বলতেন ঃ

أنا أول إمرأة قتلتُ رجلا.

'আমিই প্রথম মহিলা যে একজন পুরুষকে হত্যা করেছে।' একথা উরওয়া বর্ণনা করেছেন।[৯]

উহুদ যুদ্ধ হয় খন্দক যুদ্ধের পূর্বে। এই উহুদ যুদ্ধেও হযরত সাফিয়্যা (রা) অংশ গ্রহণ করেন এবং সাহসিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই যুদ্ধের এক পর্যায়ে

---

৮. তাবাকাত-৮/৪১; কানযুল 'উম্মাল-৭/৯৯; সীরাত ইবন হিশাম-২/২২৮; আল-আগানী-৪/১৬৪; আল বিদায়া-৪/১০৮,

৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭০, ৫২২; তাহযীবুল কামাল-৬/২৪

মুসলমানরা কুরাইশ বাহিনীর আক্রমণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পালাতে থাকে। তখন মূলত এক রকম পরাজয়ই ঘটে গিয়েছিল। তখন হযরত সাফিয়্যা (রা) হাতে একটি নিযা নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে পলায়নপর সৈনিকদের যাকে সামনে পাচ্ছিলেন, পিটাচ্ছিলেন, আর উত্তেজিত কণ্ঠে বলছিলেন–তোমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) ফেলে পালাচ্ছো ? এ অবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দৃষ্টিতে পড়েন। রাসূল (সা) যুবাইরকে বলেন, তিনি যেন হামযার লাশ দেখতে না পান। কারণ, কুরায়শরা লাশের সাথে অমানবিক আচরণ করে। কেটে-কুটে তারা লাশ বিকৃত করে ফেলে। ভাইয়ের লাশের এমন বিভৎস অবস্থা দেখে তিনি ধৈর্যহারা হয়ে পড়তে পারেন, এমন চিন্তা করেই রাসূল (সা) যুবায়রকে এমন নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ মত যুবায়র (রা) মার নিকট এসে বলেন, মা, রাসূল (সা) আপনাকে ফিরে যাবার জন্য বলছেন। জবাবে তিনি বলেন, আমি জেনেছি, আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। আল্লাহ জানেন, আমার ভাইয়ের লাশের সাথে এমন আরচরণ আমার মোটেও পছন্দ নয়, তবুও আমি অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করবো। ইন্‌শাআল্লাহ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবো। মায়ের এ সব কথা যুবায়র (রা) রাসূলকে (সা) জানালেন। তারপর তিনি সাফিয়্যাকে (রা) ভাইয়ের লাশের কাছে যাবার অনুমতি দান করেন। হযরত সাফিয়্যা ভাইয়ের লাশের নিকট যান এবং দেহের টুকরো টুকরো অংশগুলি দেখেন। নিজেকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখেন। মুখে শুধু 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' উচ্চারণ করে তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করতে থাকেন। তিনি চলে যাবার পর রাসূল (সা) হযরত হামযার (রা) লাশ দাফনের নির্দেশ দান করেন।১০

রাসূল (সা) সেদিন বলেছিলেন, যদি সাফিয়্যার কষ্ট না হতো এবং আমার পরে এটা একটা রীতিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা না থাকতো তাহলে হামযার লাশ এভাবে ময়দানে ফেলে রাখতাম। পশু-পাখীতে খেয়ে ফেলতো।১১

হযরত সাফিয়্যার (রা) জীবিকার জন্যে রাসূল (সা) খায়বার বিজয়ের পর সেখানে উৎপাদিত ফসল থেকে বাৎসরিক চল্লিশ ওয়াসক শস্য নির্ধারণ করে দেন।১২

হযরত 'উমারের (রা) খেলাফতকালে হিজরী ২০ সনে ৭৩ (তিয়াত্তার) বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। বাকী'গোরস্তানে মুগীরা ইবন শু'বার আঙ্গিনায় অজুখানার পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। অনেকে বলেছেন, তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।১৩ কিন্তু এ কথা সঠিক নয়।

---

১০. তাবাকাত-৮/৪২; উসুদুল গাবা-৫/৪৯২,
১১. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৯৫,
১২. তাবাকাত-৮/৪১,
১৩. প্রাগুক্ত-৮/৪২; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৪৯; আল-ইসতী'আব (আল-ইসাবার পার্শ্ব টীকা) -৪/৩৪৫

কাব্য প্রতিভা

হযরত সাফিয়্যা (রা) ছিলেন কুরায়শ গোত্রের হাশিমী শাখার একজন মহিলা কবি এবং একজন সুভাষিণী মহিলা। জিহাদ ও অন্যান্য সৎকর্মের অঙ্গনে তিনি যেমন চমক সৃষ্টি করেন, তেমনি শুদ্ধ ও সাবলীল ভাষার জন্যেও খ্যাতি অর্জন করেন। আরবী ভাষাকে বেশ ভালো মতই আয়ত্তে আনেন। তাঁর মুখ থেকে অবাধ গতিতে কবিতার শ্লোক বের হতো। সেই সব শ্লোক হতো চমৎকার ভাব বিশিষ্ট, প্রাঞ্জল ও সাবলীল, কোমল, সত্য ও সঠিক আবেগ-অনুভূতি এবং চমৎকার বীরত্ব ও সাহসিকতায় পরিপূর্ণ। বর্ণিত হয়েছে, তিনি যখন তাঁর ছোট্ট শিশু সন্তান আয- যুবায়রকে কোলে নিয়ে দোলাতেন তখন তাঁর মুখ থেকে বীরত্ব ব্যাঞ্জক কবিতার শ্লোক অবাধে বের হতে থাকতো।[১৪]

ইতিহাস ও সীরাতের (চরিত অভিধান) গ্রন্থসমূহে হযরত সাফিয়্যা (রা) -এর যে সকল কবিতা সংরক্ষিত দেখা যায় তাতে তিনি যে আরবের একজন বড় মহিলা কবি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ মরসিয়া রচনায় তাঁর সাফল্য লক্ষ্য করার মত। এ কারণে অনেকে তাঁকে خنساء قريش বা 'কুরায়শ বংশের খানসা' অভিধায় ভূষিত করেছন।[১৫]

আল্লামা সুয়ূতী 'আদ-দুররুল মানছুর' গ্রন্থে বলেছেন ঃ[১৬]

'তিনি একজন বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী কবি ছিলেন। কথা, কর্মে, সম্মান-মর্যাদা ও বংশ গৌরবে তিনি গোটা আরববাসীর নিকট বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন।'

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর সাফিয়্যা (রা) তাঁর বোনদের ও বানু হাশিমের মেয়েদের সমবেত করে একটি শোক অনুষ্ঠানের মত করেন। সেই অনুষ্ঠানে অনেক মহিলা স্বরচিত মরসিয়া পাঠ করেন। হযরত সাফিয়্যাও একটি মরসিয়া পাঠ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থে সেই মরসিয়াটি সংকলিত হয়েছে।[১৭]

তার দুটি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ

أرقت لصوت نائحة بليلٍ # على رجل بقارعة الصَّعيد
ففاضت عند ذلكم دموعي # على خدى كمنحدر الفريد

উঁচু ভূমির এক ব্যক্তির জন্যে রাত্রিকালীন
বিলাপকারিণীর আওয়াজে আমি জেগে উঠি
অত:পর আমার দু'গণ্ড বেয়ে এমন ভাবে অশ্রু গড়িয়ে
পড়লো যেমন ঢালু স্থান থেকে মতি গড়িয়ে পড়ে।

---

১৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৪৫,
১৫. নিসা' মিন 'আসরিন নুবুওয়াহ্-৪১৯,
১৬.আদ-দুররুল মানছুর-২৬১,
১৭. দ্রষ্টব্য: সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬৯-১৭৪; আ'লাম আন নিসা'-২/৩৪৩,

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ইনতিকালের পর তিনি একটি শোকগাথা রচনা করেন। তার কিছু অংশ বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। তার কয়েকটি বয়েত এখানে তুলে ধরা হলোঃ১৮

عينُ جودی بدمعة وسهود # واندبی خير هالك مفقود
واندبی المصطفی بحزن شديد # خالط القلب فهو كالمعمود
كدت أقضی الحياة لما أتاه # قدرٌ خطٌ فی كتاب مجيد
ولقد كان بالعباد رؤوفًا # ولهم رحمة، وخير رشيد
رضی الله عنه حيًا وميتًا # وجزاهُ الجنان يوم الخلود

হে আমার চক্ষু! অশ্রু বর্ষণ ও রাত্রি জাগরণের
ব্যাপারে বদান্যতা দেখাও। একজন সর্বোত্তম মৃত,
হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির জন্যে বিলাপ কর।
প্রচণ্ড দু:খ- বেদনা সহকারে মুহাম্মদ আল-মুসতাফার
স্মরণে বিলাপ কর। যে দু:খ- বেদনা অন্তরে মিলে
মিশে একাকার হয়ে তাকে ঠেস দিয়ে বসানো
রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মত করে দিয়েছে।
'আমার জীবন আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল-যখন তাঁর সেই নির্ধারিত মৃত্যু এসে যায়, যা একটি মহা সম্মানিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।
তিনি ছিলেন মানুষের প্রতি কোমল, দয়ালু ও সর্বোত্তম পথ প্রদর্শক।
জীবন ও মৃত্যু-সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় থাকুন এবং সেই চিরন্তন দিনে আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করুন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) -এর স্মরণে রচিত আরেকটি শোকগাথার কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ১৯

ألا يارسول الله كنت رجاءنا # وكنت بنا براً ولم تك جافيا
وكنت رحيما هاديا ومعلما # لبيك عليك اليوم من كان باكيا
فدیً لرسول الله أمي وخالتی # وعمی وخالی ثم نفسی وماليا
فلو أن ربَّ الناس أبقی نبيّنا # سعدنا ولكن أمره كان ماضيا
عليك من الله السلام تحية # وأدخلت جنات من العدن راضيا

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ছিলেন আমাদের আশা-ভরসা। আপনি ছিলেন আমাদের

১৮. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭১; দ্রষ্টব্য; হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৭-৩৪৮; তাবাকাত-২/৩৩০*
১৯. *শা'ইরাতুল'আরাব-২০২-২০৫*

সাথে সদাচারণকারী এবং কঠোর ছিলেন না।

আপনি ছিলেন দয়ালু, পথের দিশারী ও শিক্ষক। যে কোন বিলাপকারীর আজ আপনার জন্যে বিলাপ করা উচিত।

আল্লাহর রাসূলের জন্যে আমার মা, খালা, চাচা, মামা এবং আমার জীবন ও ধন-সম্পদ সবই উৎসর্গ হোক।

মানব জাতির প্রতিপালক যদি আমাদের নবীকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতেন, আমরা সৌভাগ্যবান হতাম। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত তো পূর্বেই হয়ে আছে।

আপনার সম্মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক! আর সন্তুষ্টচিত্তে আপনি চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করুন।'

উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলিম সৈনিকরা বিপর্যস্ত অবস্থায় রাসূল (সা) থেকে দূরে ছিটকে পড়ে তখন হযরত সাফিয়্যা (রা) যে সাহসের পরিচয় দেন তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সে সময় তিনি হামযার (রা) স্মরণে একটি কবিতাও রচনা করেন। তাতে একটি চিত্র তুলে ধরেন। তার একটি বয়েত নিম্নরূপ ঃ২০

إن يومًا أتى عليك ليومٌ # كورت شمسه وكان مضيئًا

'আজ আপনার উপর এমন একটি দিন এসেছে- যে দিনের সূর্য অন্ধকার হয়ে গেছে অথচ তা ছিল আলোকোজ্জ্বল।'

২০. আল-ইসাবা-৪/৩৪৯।

আন-নামির ইবন তাওলাব (রা)

আন-নামির (রা) একজন "মুখাদরাম" বা জাহিলী ও ইসলামী যুগের কবি। তিনি 'উকল গোত্রের সন্তান। তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, জাহিলী যুগে জন্ম গ্রহণ করেন। ইসলামী যুগ লাভ করেন এবং একজন ভালো মুসলমান হন।১ তাঁর বংশের উর্দ্ধতন পুরুষ এক সময় বর্তমান সৌদি আরবের 'নাজদ' ও তার আশে-পাশের মুরু ভূমিতে বসবাস করতো। তারপর তারা হাজার-এর দিকে চলে যায় এবং সবশেষে তাঁর গোত্র ইয়ামামা ও হাজার-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে।২ তিনি একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। আরবী-কবিতার প্রাচীন সংকলন সমূহে তাঁর কবিতার যে সব অংশ বিশেষ সংকলিত হয়েছে তার মাধ্যমে তাঁর জাহিলী ও ইসলামী জীবনের বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও তথ্য জানা যায়। আল-বালাযুরী বলেছেন, বাকর গোত্রের একটি শাখা একবার 'উকল গোত্রের উপর আক্রমণ চালায় এবং সে যুদ্ধে আক্রান্ত 'উকল গোত্র বিজয় লাভ করে। আন-নামির তখন তাঁর গোত্রের নেতা। এ সম্পর্কে তাঁর একটি পংক্তি এরকম ঃ৩

لقد شهدتُ الخيل نحوى ما رآت + وشهدتها تعدوعلى آثارها

'আমি একদল অশ্বারোহীকে আমার দিকে আসতে দেখলাম-যারা আমাকে দেখেনি। আর আমি দেখলাম তারা তাদের আগমনের পথ ধরে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।'

তাঁর আরেকটি পংক্তিতে জানা যায়, রাবী'আ গোত্রের ওয়াহাব নামক এক ব্যক্তি "আদ-দাহূল" নামক একটি পানির কূপ নিয়ে তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। মতান্তরে আন-নামির তাকে পানি পান করান, কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করায় তিনি বুঝে নেন যে তার কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে। সে কথা তিনি একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন। জাহিলী যুগে কোন একটি গোত্র আন-নামিরকে অতিথি হিসেবে সমাদর করে। পরবর্তীতে আন-নামির সেই লোকটিকে আপ্যায়ন করেন চারটি উট জবাই করে এবং এক মট্‌কা মদ উপস্থাপনের মাধ্যমে। এই বাহুল্য খরচে তাঁর স্ত্রী তাকে তিরস্কার করলে এবং নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখালে তিনি একটি কবিতায় তাকে ভর্ৎসনা করেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বার্দ্ধক্যে ইসলামী যুগ লাভ করেন এবং মুসলমান হন। তাঁকে একজন সাহাবী কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। কবি লাবীদ, হাসসান, কা'ব,

---

১. *শু'আরা' ইসলামিয়্যূন -৩০০*

২. *আল-বিকরী, মু'জামু মা ইসতা'জামা-১/৮৮*

৩. *শু'আরা' ইসলামিয়্যূন-৩০০*

আবদুল্লাহ (রা) প্রমূখ সাহাবী কবিদের মত তিনিও তাঁর কাব্য প্রতিভাকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেন। বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায় তিনি তাঁর গোত্রের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) নিকট যান এবং রাসূলুল্লাহকে (সা) উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা পাঠ করেন। সেই কবিতার কয়েকটি চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো।[৪]

إنا أتيناك وقد طال السفر + نقود خيلاً ضُمَّراً فيهَا عسر
نُطعمُها اللحم إذا عزَّ الشجر + والخيل فى إطعامها اللحم ضَرَر

'ওহে, আমরা আপনার নিকট দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। আমরা হাঁকিয়ে এসেছি ঔদ্ধত্য ও রূঢ়তায় পরিপূর্ণ শীর্ণকায় একপাল অশ্ব।

বৃক্ষ দুর্লভ হওয়ার কারণে আমরা তাদেরকে মাংস খাওয়াই। আর অশ্বকে মাংস খাওয়ানোতে ক্ষতি আছে।'

আরেকটি কবিতায় তিনি তাঁর গোত্রকে লক্ষ্য করে বলছেন ঃ[৫]

ياقوم إنى رجل عندى خبر + الله من آياته هذا القمر
والشمس والشعرى و آيات أخر

'ওহে আমার সম্প্রদায়, আমি এক ব্যক্তি যার কাছে গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। আল্লাহ যার প্রমাণ হলো এই চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্ররাজি ও অন্যান্য নিদর্শনাবলী।'

আল-বালাযুরী বলেছেন, তিনি এবং তাঁর ছেলে রাবী'আ দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর রাবী'আ কূফায় অভিবাসী হন এবং পিতাকে অনুরোধ করেন কূফায় তাঁর কাছে বসবাস করার জন্য। তিনি ছেলের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে এই চরণ দু'টি শুনিয়ে দেন ঃ[৬]

أعذنى ربٍّ من حَصَروعَىِّ + ومن نفس أعالجها علاجًا
ومن حاجات نفسى فاعصمنى + فان لمضمرات النفسَ حاجا

'প্রভু হে, তোতলামী, বাকরুদ্ধতা এবং এমন প্রবৃত্তি যার আমি বিশেষ চিকিৎসা করছি–এসব কিছু থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে পবিত্র রাখুন আমার প্রবৃত্তির প্রয়োজন ও দাবীসমূহ থেকে। কারণ, প্রবৃত্তির অনেক গোপন প্রয়োজন ও দাবী থাকে।'

আন-নামির ইবন তাওলাব (রা) থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

---

৪. উস্‌দুল গাবা-৫/৩৯; আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা'-১৪১; কিতাবুল আগানী-১৯/১৫৯

৫. আল-ইসাবা- ৩/৫৭৩

৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৩

আবুল 'আলা' ইবন ইয়াযীদ বলেন ঃ আমরা একদিন বাসরার মিররাদে বসে ছিলাম। এমন সময় উস্কো খুস্কো কেশ বিশিষ্ট একজন বেদুঈন এসে আমাদের পাশে দাঁড়ালো। আমরা বলাবলি করলাম, লোকটিকে এ শহরের কেউ বলে মনে হচ্ছে না। তাঁকে প্রশ্ন করাতে সেও তা স্বীকার করে। তারপর সে তার নিকট থাকা এক টুকরো চামড়া দেখিয়ে বলে ঃ এটি হলো মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক আমাকে লিখে দেওয়া একটি পুস্তিকা। আমরা তার নিকট থেকে সেটি নিয়ে পড়ে দেখি তাতে লেখা আছে ঃ

هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنى زهير بن أقيس ، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم الخمس من الغنائم، وسهم ذى القربى والصفى فأنتم امنون بأمان اللهو أمان رسوله.

'এটা বানূ যুহায়র ইবন উকায়সের জন্য লেখা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর (সা) একটি চিঠি। তোমরা যদি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, আর নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, মুশরিকদের পরিত্যাগ কর, গনীমতের এক পঞ্চমাংশ, নিকট আত্মীয়দের অংশ এবং আল্লাহর রাসূলের অংশ দান কর তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তায় থাকবে।' লোকেরা তখন তাকে রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শোনা কিছু বাণী শোনাতে অনুরোধ করে। তখন সে বললো ঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ সবর তথা রমজান মাসের রোযা এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযা বুকের যাবতীয় পঙ্কিলতা দূর করে দেয়। লোকেরা তখন তাকে প্রশ্ন করলো ঃ একথাটি তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছো? সে বললোঃ মনে হচ্ছে, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি মিথ্যা আরোপ করছি বলে তোমরা সন্দেহ করছো। এ সন্দেহ ঠিক নয়। আমি কেবল একটি হাদীছ বর্ণনা করেছি। তারপর সে তার চিঠিটির প্রতি ইঙ্গিত করে প্রস্থান করে। কুররা ইবন ইয়াযীদ বলেন ঃ তখন আমাকে বলা হলো, ইনি হলেন আন-নামির ইবন তাওলাব।৭

আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী বর্ণনা করেছেন। আল-হারিছ ইবন তাওলাব নামক আন-নামিরের এক ভাই ছিল। সে ছিল এক সম্মানীত নেতা। জাহিলী যুগে একবার সে বানূ আসাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট করে এবং জামরা বিনত নাওফাল নাম্নী এক মহিলাকে ছিনতাই করে নিয়ে আসে। সে জামরাকে তার ভাই

৭. *উসুদুল গাবা- ৫/৩৯; তাবাকাত-৭/২৬; খাযানাতুল আদাব -১/১৫৫; আল-আগানী -১৯/১৫৭*

আন-নামিরকে উপহার দেয়। আন-নামির তাকে নিয়ে দম্পত্য জীবন শুরু করেন। তাঁদের অনেকগুলো সন্তান হয়। অনেক বছর পর একদিন জামরা তার স্বামী আন-নামিরকে বলে, পিতৃগৃহে যাওয়ার আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে। আমাকে একটু নিয়ে চলো। আন-নামির বললেন, আমার আশংকা হয়, তুমি সেখানে গেলে আর ফিরে আসবে না। কিন্তু জামরা তাঁকে আশ্বস্ত করে। একদিন আন-নামির জামরাকে নিয়ে তার পিতৃগোত্র বানূ আসাদের দিকে যাত্রা করেন। বানূ আসাদের আবাস স্থলের কাছাকাছি পৌঁছে আন-নামির এক স্থানে অবস্থান নিয়ে জামরাকে একাকী তার পিতৃ-গৃহে যাওয়ার জন্য ছেড়েদেন। জামরা সোজা গিয়ে উঠলো তার প্রথম স্বামীর গৃহে। এ দিকে আন-নামির জামরার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকলেন। প্রতীক্ষার পালা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। জামরা আর ফিরে এলোনা। আন-নামির বুঝলেন, জামরা তাঁকে ধোঁকা দিয়েছে। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাড়ীর পথ ধরেন। সে সময় রচিত একটি কবিতায় তাঁর সে সময়ের মানসিক যন্ত্রণা চমৎকার রূপে বিধৃত হয়েছে। তার একটি চরণ নিম্নরূপ ঃ৮

جزى الله عنا جمرة ابنة نوفل + جزاء مغل بالأمانة كاذبِ

'আল্লাহ নাওফালের মেয়ে জামরাকে আমার পক্ষ থেকে প্রতিদান দিন। তিনি তাকে একজন মিথ্যাবাদী, আমানতের খিয়ানতকারীর প্রতিদান দিন।'

আবুল ফারাজ আল- ইসফাহানী আরো উল্লেখ করেছেন যে, জামরা পালিয়ে যাওয়ার অনেক বছর পর আন-নামির একবার হজ্জ করতে যান। এদিকে জামরাও তার পুর্ব-স্বামীর সাথে হজ্জে যায়। আন-নামির মিনায় যেখানে অবস্থান করছিলেন ঘটনাক্রমে জামরাও তার অনতিদূরেই ছিলেন। সে আন-নামিরকে দেখেই চিনে ফেলে। সে লোক মারফত আন-নামিরকে সালাম জানায় এবং তাঁর কুশল জানতে চায়। সেই সাথে তার সন্তানদের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য তাঁকে উপদেশ দেয়। এঘটনাও আন-নামির কবিতায় ধরে রেখেছেন। তার দু'টি চরণ নিম্নরূপ ঃ৯

فحييتُ عن شحط وخيد حديثنا + ولا يأمن الأيام الا المضلَّلُ
يود الفتى طول السـلامة والغنى + لكيف يرى طول السـلامة يفعل

'দূর থেকে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং আমাদের চমৎকার কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। একমাত্র পথভ্রষ্ট ছাড়া আর কেউ যুগ বা কালকে নিরাপদ ও বিশ্বস্ত ভাবে না। যুবক কামনা করে সুস্থ্যতা ও সম্পদ। দীর্ঘ সুস্থ্যতা যে কি করে তা সে কিভাবে দেখবে?"

---

৮. আল- আগানী- ১/১৫৯
৯. প্রাগুক্ত; আল-ইসাবা-৩/৫৭৩

তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতা পাঠ করলে বুঝা যায়, তিনি জামরাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। জামরাকে তিনি একদিনের জন্যেও ভুলতে পারেননি। কিছু দিন পর জামরা মারা যায়। তার মৃত্যুর খবর আন-নামিরের নিকট পৌছলে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন তাতে তাঁর হৃদয়ের গভীর বেদনার কথা প্রকাশ পেয়েছে।১০

জামরা ধোঁকা দিয়ে চলে যাওয়ার পর আন-নামিরের মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়। তখন তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে সান্তনা দেয়। তাঁকে মানসিকভাবে সুস্থ্য করে তোলার জন্য তারা "দা'দ" নাম্নী এক সুন্দরী মহিলার সাথে তাঁর বিয়ে দেয়। জীবনের বাকী অংশ তিনি এই মহিলাকে নিয়ে কাটান এবং জামরাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। তাঁর অনেক কবিতায় এই "দা'দ"-এর কথা দেখা যায়।১১

আন-নামির একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বহু কবিতায় তাঁর এ গুণের কথা প্রকাশ পেয়েছে। অনেক সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে এজন্য তিরস্কার করেছে এবং তিনি তার জবাবও দিয়েছেন। এ সব চিত্র তাঁর কবিতায় দেখা যায়। তাঁর এ বদান্যতার গুণটিকে অনেকে হাতিম তায়-এর বদান্যতার সাথে তুলনা করেছেন। আন-নামির দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। বয়সের ভারে শেষ জীবনে তাঁর বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটে। এ সময় তাঁকে বলতে শোনা যেত ঃ ' তোমরা অতিথি সেবা কর, অভাবীকে দান কর এবং আগন্তুককে স্বাগত জানাও।' এমন কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দু'শো বছর জীবন লাভ করেন।১২

আন-নামিরের কবিতা ছিল তাঁর জীবন, মনমানস ও পরিবেশের সঠিক চিত্র। তাঁর সময়ে কবিরা যে তাদের কাব্য-প্রতিভাকে জীবিকা উপার্জনের উপায় ও অবলম্বনে পরিণত করেছিল, তিনি ছিলেন এর ব্যতিক্রম। এ কারণে তাঁর কোন মাদাহ্ বা স্তুতিমূলক কবিতা দেখা যায় না। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসায় একটিমাত্র কবিতা ছাড়া তাঁর এ জাতীয় দ্বিতীয় কোন কবিতা নেই। এতে বুঝা যায় তিনি ছিলেন প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন একজন আদর্শবাদী মানুষ। তাঁর কবিতায় তাঁর সততা, সত্যবাদিতা ও উন্নত মন-মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, মিথ্যাকে তিনি দারুণ ঘৃণা করতেন এবং কেউ মিথ্যা বললে ভীষণ কষ্ট পেতেন। জামরার বিচ্ছেদে তাঁর হৃদয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তাঁর কবিতায় বার বার তা বিধৃত হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পর শব্দ চয়ন, ভাব ও বিষয় নির্বাচনে ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উদার হস্তে খরচ করার জন্য স্ত্রী তাঁকে তিরস্কার করলে জবাবে তিনি বলছেন ঃ১৩

ترى أن ما أبقيت لم أك ربه + وإن الذى أمضيت كان نصيبى

'তুমি দেখ, আমি যা অবশিষ্ট রাখছি, আমি তার মালিক নই। আর যা কিছু আমি খরচ

---

১০. শু'আরা' ইসলামিয়্যিন-৩০৬

১১. আশ- শি'র ওয়াশ-শু'আরা' -১৪১; আল- ইসাবা-৩/৪৫৩

১২. আল-ইসাবা-৩/৫৭৩; শু'আরা'ইসলামিয়্যিন-৩১১

১৩. শু'আরা' ইসলামিয়্যিন-৩২৩

করছি, সেটুকুই আমার অংশ।'

মূলত : উপরোক্ত চরণটিতে রাসূলুল্লাহর (সা) এই হাদীছটির ভাবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছেঃ[১৪]

يقول ابن أدم مالي مالي ، وإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو أعطيت فأمضيت.

'আদমের সন্তান বলে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। আসলে যতটুকু তুমি খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলেছো, অথবা যতটুকু পরে ছিড়ে ফেলেছো অথবা দান করেছো সম্পদের ততটুকুই তোমার।'

আরবী কাব্য জগতে আন-নামির ইবন তাওলাব এক বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন। সেই জাহিলী যুগেই তিনি নেতৃস্থানীয় কবি হিসেবে গণ্য হন।[১৫] তাঁর কবিতার উৎকৃষ্টতা ও উন্নতমানের জন্য আবূ 'আমর ইবন আল-'আলা' তাঁকে "আল-কায়্যিস" তথা বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ নাম দেন।[১৬] আরবী সাহিত্যের প্রাচীনকালের সাহিত্য সমালোচকগণ তাঁকে একজন বিশুদ্ধভাষী কবি এবং একজন বাকপটু মানুষ হিসেবে গণ্য করেছেন। অনেকে একথাও বলেছেন যে, আরব কবিদের মধ্যে তাঁর কবিতাই সবচেয়ে বেশী-উপমা ও দৃষ্টান্ত হিসেবে মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়েছে।[১৭] ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী জাহিলী যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের যে স্তর বিন্যাস করেছেন তাতে আন-নামিরকে অষ্টম স্তরে স্থান দিয়েছেন। এই স্তরের কবি হলেন চার জন ঃ 'আমর ইবন কামীআ, আন-নামির ইবন তাওলাব, আওস ইবন গালফা' ও 'আওফ ইবন 'আতিয়্যা। আবূ যায়দ আল-কারশী তাঁকে দ্বিতীয় স্তরে স্থান দিয়েছেন।

---

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. আল-ইসতী'আব-৪/১৫৩৩; খাযানাতুল-আদাব-১/১৫৩

১৬. তাবাকাত আশ-শু'আরা'-১৩৪; আশ-শি'র ওয়াশ- শু'আরা'-১৪১

১৭. আল-আগানী-১৯/১৬০

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) সাহিত্য রুচি

জীবন ঃ

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা স্ত্রী। তাঁর ডাকনাম বা কুনিয়াত উম্মু 'আবিদিল্লাহ এবং উপাধি "সিদ্দীকা"। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি ফরসা সুন্দরী ছিলেন, এ কারণে তাঁকে "আল-হুমায়রা" বলা হতো।[১] 'আবদুল্লাহ ছিলেন 'আয়িশার (রা) বোন আসমার (রা) ছেলে। ইতিহাসে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র নামে প্রসিদ্ধ। 'কুনিয়াত' হয় কোন সন্তানের নামের সাথে। 'আয়িশা (রা) ছিলেন নিঃসন্তান। তাই তাঁর কোন 'কুনিয়াত' ছিল না। সেকালের আরবে 'কুনিয়াত' ছিল শরাফত ও আভিজাত্যের প্রতীক। অভিজাত শ্রেণীর লোকদের নাম ধরে ডাকার নিয়ম ছিল না। কুনিয়াত বা উপনামেই তাদেরকে সম্বোধন করা হতো। একদিন 'আয়িশা (রা) স্বামী রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন ঃ আপনার অন্য স্ত্রীগণ তাঁদের পূর্বের স্বামীদের সন্তানদের নামে নিজেদের কুনিয়াত ধারণ করেছেন, আমি কার নামে কুনিয়াত ধারণ করি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমার বোনের ছেলে 'আবদুল্লাহর নামে। সেই দিন থেকে তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম হয় 'উম্মু 'আবদিল্লাহ'-'আবদুল্লাহর মা।[২]

হযরত 'আয়িশার (রা) পিতা খলীফাতু রাসূলিল্লাহ, আস-সিদ্দীকুল আকবর আবূ বকর (রা) এবং মাতা উম্মু রূমান যায়নাব বিন্‌ত 'আমির, মতান্তরে 'উমায়র আল-কিনানী। পিতার দিক দিয়ে তিনি কুরায়শ গোত্রের বানূ তায়ম শাখার এবং মাতার দিক দিয়ে বানূ কিনানার সন্তান। রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আয়িশার (রা) বংশধারা পিতৃকূলের দিক দিয়ে উপরের দিকে সপ্তম/অষ্টম পুরুষে এবং মাতৃকূলের দিক দিয়ে একাদশ/দ্বাদশ পুরুষে মিলিত হয়েছে।[৩]

হযরত 'আয়িশার (রা) জন্মের সঠিক সময়কাল সম্পর্কে তারীখ ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তেমন কিছু পাওয়া যায়না। একারণে তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে বেশ মতপার্থক্য দেখা যায়। ইবন সা'দ এবং তাঁর অনুসরণে আরও অনেক সীরাত বিশেষজ্ঞ বলেছেন, নুবুওয়াতের চতুর্থ বছরের সূচনায় 'আয়িশা জন্ম গ্রহণ করেন এবং দশম বছরে ছয় বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। মূলত হযরত 'আয়িশার (রা) বয়স সম্পর্কে কয়েকটি কথা সর্বসম্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তা হলো, হিজরাতের তিন বছর পূর্বে ছয় বছর বয়সে বিয়ে

---

১. আনসাবুল আশরাফ- ১/৪১৪; সিয়ারু আ'লাম আন- নুবালা- ২/১৪০
২. আবূ দাউদ: কিতাবুল আদাব; মুসনাদে আহমাদ- ৬/১০৭, ১০৯; তাবাকাত- ৮/৬৪
৩. উসুদুল গাবা- ৫/৫৮৩

হয়। প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে নয় বছর বয়সে স্বামীগৃহে যান এবং এগারো হিজরীর রাবী'উল আওয়াল মাসে আঠারো বছর বয়সে বিধবা হন।[৪] ইমাম যাহাবী বলেন ঃ 'আয়িশা (রা), ফাতিমার (রা) চেয়ে আট বছরের ছোট।[৫] হযরত 'আয়িশা (রা) হিজরী ৫৮ সনের ১৭ রমজান/১৩ জুন ৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬৬ বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। তখন হযরত আমীর মু'আবিয়ার (রা) খিলাফত কালের শেষ পর্যায়।[৬]

উম্মুল মু'মিননি হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) দারসগাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধাবী শিক্ষার্থী। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা ছিল অতুলনীয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তৎকালীন সকল নারী অথবা উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীগণ, যাঁরা বিশ্বের সকল বিশ্বাসীদের মাতা), অথবা সাহাবীদের একটি অংশের উপরই ছিল না, বরং কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবী ছাড়া সকল সাহাবীর উপরই ছিল। হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আবী (রা) বলেন ঃ 'আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীরা, কখনো এমন হয়নি যে, কোন কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি, সে বিষয়ে 'আয়িশার (রা) নিকট জানতে চেয়েছি এবং সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান আমরা তাঁর কাছে পাইনি।'[৭] হযরত 'আয়িশার (রা) ছাত্র-শিষ্যরা বর্ণনা করেছেন যে, আরবের ইতিহাস, বক্তৃতা-ভাষণ, সাহিত্য ও কবিতায় তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। হযরত 'উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) বলেনঃ[৮] 'আমি কুরআন, হালাল-হারাম , ফিকহ্, আরবের ইতিহাস, ও চিকিৎসা বিদ্যায় উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী অন্য কাউকে দেখিনি।' 'আল্লামা যাহাবী বলেনঃ 'তিনি ছিলেন বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার। উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে, সার্বিক ভাবে মহিলাদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী আর নেই।'[৯] এ ধরনের কথা যুহ্‌রী, যিয়াদ, 'আতা', মিকদাদ প্রমুখের মত বিখ্যাত তাবি'ঈগণও বলেছেন।[১০]

হযরত আয়িশা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) এত বেশী সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, হাতে গোনা চার-পাঁচজন পুরুষ সাহাবী ছাড়া আর কেউই তাঁর সমকক্ষতার দাবী করতে পারেন না। তাঁর সর্বমোট বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা দু'হাজার দু'শো দশ।

---

৪. আনসাবুল আশরাফ- ১/৪১০; সীরাতে 'আয়িশা (রা)-২১; সাহাবিয়াত- ৩৭
৫. সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা'- ২/১৩৯
৬. আ'লাম আন নিরা'- ৩/১৩৯
৭. জামি' তিরমিযী, মানাকিবু 'আয়িশা (রা); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'- ২/১৭৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/২৮; আল-ইসাবা- ৪/৩৬০
৮. তাবাকাত - ৮/৭৭
৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/২৮; সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা'-২/১৪০
১০. আ'লাম আন নিরা'-৩/১০৫, ১০৬

তার মধ্যে সাহীহায়ন তথা বুখারী ও মুসলিমে ২৮৬ টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে। ১৭৪টি মুত্তাফাক 'আলায়হি, ৫৪টি শুধু বুখারীতে এবং ৬৯টি মুসলিমে একক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই হিসাবে বুখারীতে সর্বমোট ২২৮ টি এবং মুসলিমে ২৪৩টি হাদীছ এসেছে।[১১] এছাড়া তাঁর অন্য হাদীছগুলো বিভিন্ন গ্রন্থে সনদ সহকারে সংকলিত হয়েছে। ইমাম আহমাদের (রা) মুসনাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডে (মিসর) হযরত 'আয়িশার (রা) বর্ণিত সকল হাদীছ সংকলিত হয়েছে।

সাহিত্য

অসংখ্য বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন একজন সুভাষিণী। তাঁর কথা ছিল অতি স্পষ্ট, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। মূসা ইবন তালহা তাঁর একজন ছাত্র। ইমাম তিরমিজী 'মানাকিব' পরিচ্ছেদে তার এ মন্তব্য-

مارأيت أفصح من عائشة

বর্ণনা করেছেন। যার অর্থ-'আমি আয়িশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী কাউকে দেখিনি।' মুসতাদরিকে হাকেমে আহনাফ ইবন কায়সের একটি মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমি আয়িশার (রা) মুখের চমৎকার বর্ণনা ও শক্তিশালী কথার চেয়ে ভালো কথা আর শুনিনি।' হযরত 'আয়িশার (রা) থেকে যে শত শত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে তাঁর নিজের ভাষার অনেক বর্ণনাও সংরক্ষিত হয়েছে। সেগুলি পাঠ করলে তার মধ্যে চমৎকার এক শিল্পরূপ পরিলক্ষিত হয়। তাতে রূপক ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) উপর ওহী নাযিলের বর্ননা দিতে গিয়ে বলছেনঃ[১২]

أول مابدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة

فى النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.

'প্রথম প্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী লাভ করতেন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন না কেন, তা প্রভাতের দীপ্তির মত উদ্ভাসিত হতো।' হযরত 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সত্য স্বপ্নসমূহকে প্রভাতের দীপ্তি ও কিরণের সাথে তুলনা করেছেন। ওহী লাভের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারকে ঘাম জমতো। এই ঘামের ফোঁটাকে তিনি উজ্জ্বল মোতির দানার সাথে তুলনা করেছেন। মুনাফিকরা যখন তাঁকে নিয়ে কুৎসা রটনা করেছিলো, তাঁর চরিত্রের প্রতি কলঙ্ক আরোপ করেছিলো, তখন সেই দিনগুলি যে কেমন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল, তার একটা সুন্দর চিত্র আমরা

---

১১. প্রাগুক্ত- ৩/১০৭; সিয়ারু আ'লাম আন- নুবালা'- ২/১৩৯
১২. বুখারী ঃ কায়ফা কানা বুদউল ওহয়ি

পাই তাঁর বর্ণনার মধ্যে। সেই সময়ে তাঁর জীবনের একটি রাতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ[১৩]

فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقألى دمع ولا اكتحل بنوم.

'সারারাত আমি কাঁদলাম। সকাল পর্যন্ত আমার অশ্রুও শুকায়নি এবং আমি চোখে ঘুমের সুরমাও লাগাইনি।' তিনি সে রাতটি বিনিদ্র অবস্থায় এবং চোখের পানি ঝরিয়ে কাটিয়েছেন, সে কথাটি সরাসরি না বলে একটি সুন্দর চিত্রকল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। চোখে ঘুম আসাকে তিনি চোখে সুরমা লাগানোর সাথে তুলনা করেছেন। ভাষায় প্রচণ্ড অধিকার থাকলেই কেবল এমনভাবে বলা যায়। একবার তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এমন দুইটি চারণভূমি থাকে-যার একটিতে পশু চারিত হয়েছে, আর অন্যটি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে, তখন আপনি কোনটিতে উট চরানো পছন্দ করবেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, যেটি সুরক্ষিত আছে, সেটিতে। মূলত তিনি জনতে চেয়েছেন, যে নারী স্বামীসঙ্গ লাভ করেছে, আর যে লাভ করেনি, এর কোনটিকে আপনি পছন্দ করেন? আসলে তিনি নিজের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) ইচ্ছার কথা জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরাসরি সে কথাটি না বলে একটি উপমার মাধ্যমে চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দেন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণের মধ্যে একমাত্র 'আয়িশা (রা) ছিলেন কুমারী। অন্যরা সকলেই ছিলেন হয় বিধবা, নয়তো স্বামী পরিত্যক্তা।

হযরত 'আয়িশা (রা) প্রাচীন আরবের অনেক লোক কাহিনীও জানতেন এবং সুন্দরভাবে তা বর্ণনাও করতে পারতেন। হাদীছের কোন কোন গ্রন্থে তাঁর বলা দুই একটি গল্প বর্ণিত হয়েছে। আরবের এগারো সহদরার একটি দীর্ঘ কাহিনী তিনি একদিন স্বামী রাসূলুল্লাহকে (সা) শুনিয়েছিলেন। রাসূল (সা) অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাঁর গল্প শোনেন।[১৪] এ গল্পে তাঁর চমৎকার বাচনভঙ্গি এবং শিল্পকারিতা লক্ষ্য করা যায়। শব্দ ও বাক্যালংকারের ছড়াছড়ি দেখা যায়।

বক্তৃতা-ভাষণ

বাগ্মী ও বাকপটু ব্যক্তিরাই বক্তৃতা-ভাষণ দিতে পারে। এ এক খোদাপ্রদত্ত গুণ। মানুষকে স্বীয়মতে আনার জন্য, প্রভাবিত করার জন্য এ এক অসাধারণ শিল্প। সেই আদিকাল থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে সকল জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে এ শিল্পের চর্চা দেখা যায়। সেই প্রাচীন আরবদের মধ্যে এর ব্যাপক চর্চা ছিল। জাহিলী আরবের বড় বড় খতীব এবং তাদের খুতবা বা ভাষণের কথা ইতিহাসে দেখা যায়।

---

১৩. প্রাগুক্তঃ বাবু হাদীছুল ইফ্‌ক
১৪. সীরাতে 'আয়িশা (রা)-৫৪-৫৫

নানা কারণ ও প্রয়োজনে ইসলামী আমলে এই খুতবা শাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ও বিকাশ ঘটে। পুরুষদের গণ্ডি অতিক্রম করে নারীদের মধ্যেও এর বিস্তার ঘটে। হযরত 'আয়িশা (রা) একজন শ্রেষ্ঠ মহিলা খতিব বা বক্তা ছিলেন। আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সূত্রসমূহে হযরত 'আয়িশার (রা) বহু খুতবা বা বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে। উটের যুদ্ধের ডামাডোলের সময় তিনি যে সকল খুতবা দিয়েছিলেন তাবারীর ইতিহাসে তা সংকলিত হয়েছে। ইবন 'আবদি রাব্বিহি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-'ইকদুল ফারীদ' এ তার কিছু নকল করেছেন।[১৫]

বাগ্মিতা ও বিশুদ্ধভাষিতা যেমন একজন সুবক্তার অন্যতম গুণ, তেমনি স্পষ্ট উচ্চারণ, উচ্চকণ্ঠ এবং ভাব-গাম্ভীর্যের অধিকারী হওয়াও তার জন্য জরুরী। হযরত 'আয়িশার (রা) কণ্ঠধ্বনি এমনই ছিল। তাবারী বর্ণনা করেছেন ঃ[১৬]

فتكلمت عائشة وكانت جهورية يعلو صوتها كثيرة كأنه صوت إمرأة جليلة.

'হযরত 'আয়িশা (রা) ভাষণ দিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। তাঁর গলার আওয়ায অধিকাংশ মানুষকে প্রভাবিত করতো। যেন তা কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার গলার আওয়ায।' আহনাফ ইবন কায়স একজন বিখ্যাত তাবে'ঈ। সম্ভবতঃ তিনি বসরায় হযরত আয়িশার (রা) একটি ভাষণ শোনার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'আমি হযরত আবূ বকর (রা), হযরত 'উমার (রা), হযরত উছমান (রা), হযরত 'আলী (রা) এবং এই সময় পর্যন্ত সকল খলীফার ভাষণ শুনেছি; কিন্তু 'আয়িশার (রা) মুখ থেকে বের হওয়া কথায় যে কলামণ্ডিত সৌন্দর্য ও জোর থাকতো তা আর কারও কথায় পাওয়া যেত না।' আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী আহনাফ ইবন কায়সের মন্তব্যের উদ্ধৃতি টেনে বলছেন, 'আমার মতে, আহনাফ ইবন কায়সের এ কথা অতিরঞ্জিত থেকে মুক্ত নয়, তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, 'আয়িশা (রা) একজন স্বচ্ছন্দ ও শুদ্ধভাষী বক্তা ছিলেন।'[১৭]

আহনাফের মত ঠিক একই রকম মন্তব্য করেছেন হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) ও মূসা ইবন তালহা। উটের যুদ্ধের সময় তিনি যে সকল বক্তৃতা-ভাষণ দান করেছিলেন, তাতে

১৫. দেখুন ঃ কালকাশান্দীর 'সুবহুল আ'শা- ১/২৪৮; ইবন 'আবদি রাব্বিহির আল 'ইকদুল ফারীদ-২/১৫৬, ২০৬, ২২৬; মাহমূদ শুকরী আল-আলুসীর-নিহায়াতুর আরিব-৭/২৩০; ইবনুল আছীরের আল-কামিল- ৩/১০৫; তাবারীর তারিখ-৫/১৭৫ ও শারহু ইবন আবী আল হাদীদ-২/৮১

১৬. তাবারী ঃ তারীখ-৫/১৭৫; জামহারাতু খুতাবিল আরাব-১/২৮৬

১৭. সীরাতে 'আয়িশা-২৫০

যে আবেগ, শক্তি ও উত্তাপ দেখা যায় তা অনেকটা তুলনাহীন। তাঁর ঐ সময়ের একটি ভাষণের ছোট্ট উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলো। হযরত 'আয়িশা (রা) যখন হযরত তালহা ও যুবায়রকে (রা) সঙ্গে নিয়ে বসরায় পৌঁছলেন তখন বসরাবাসীরা 'আল মিরবাদ'-এ সমবেত হলো। সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে প্রথম তালহা (রা) 'তারপরে যুবায়র (রা) ভাষণ দিলেন। সবশেষে হযরত 'আয়িশা (রা) বক্তৃতা করলেন। সর্বপ্রথম তিনি আল্লাহর হাম্‌দ এবং রাসূলের (সা) প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করলেন। তারপর বললেন ঃ[১৮]

كان الناس يتجنون على عثمان رضى الله عنه، ويزرون على عماله، ويأتوننا بالمدينة، فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم، فننظر فى ذلك فنجده بريا، تقيا وفيا، ونجدهم فجرة غدرة كذبة، يحاولون غير مايظهرون، فلما قووا على المكاثرة كاثروه، واقتحموا عليه داره، واستحلوا الدم الحرام، والمال الحرام، والبلد الحرام، بلاترة ولا عذر، ألا إن مما ينبغى، لا ينبغى لكم غيره أخذ قتلة عثمان رضى الله عنه، وإقامة كتاب الله عزوجل: ألم ترألى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، الاية.

'মানুষ 'উছমানের (রা) অপরাধের কথা বলতো, তাঁর কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রতি দোষারোপ করতো। তারা মদীনায় আসতো এবং তাঁদের সম্পর্কে নানা রকম তথ্য আমাদের জানিয়ে পরামর্শ চাইতো। আমরা বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতাম। আমরা 'উছমানকে (রা) পবিত্র, খোদাভীরু ও অঙ্গীকার পালনকারী হিসেবে দেখতে পেতাম। আর অভিযোগকারীরা আমাদের কাছে পাপাচারী, ধোঁকাবাজ ও মিথ্যাবাদী বলে প্রতীয়মান হতো। তারা মুখে যা বলতো, তার বিপরীত কাজ করার চেষ্টা করতো। যখন তারা মুকাবিলা করার মত শক্তিশালী হলো, সম্মিলিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। তারা তাঁর উপর তাঁর বাড়ীতেই হামলা চালালো। যে রক্ত ঝরানো হারাম ছিল তা তারা হালাল করলো, আর যে মাল লুট করা, যে শহরের অবমাননা করা অবৈধ ছিল তা তারা বিনা দ্বিধায় ও বিনা কারণে বৈধ করে নিল। শোন! এখন যা করণীয় এবং যা ব্যতীত

---

১৮. ইবনুল আছীর ঃ আল-কামিলঃ ৩/১০৫; তাবারী ঃ আত-তারীখ- ৫/১৭৫; জামাহারাতু খুতাবিল আরাব- ১/২৮৬-২৮৭

অন্য কিছু করা তোমাদের উচিত হবে না, তা হলো 'উছমানের (রা) হত্যাকারীদের ধরা এবং তাদের উপর কিতাবুল্লাহর হুকুম কার্যকরী করা। তারপর তিনি সূরা আলে 'ইমরানের ২৩ নং আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

'আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে। আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্য মীমাংসা করা যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'

বসরায় তিনি আরেকটি আগুনঝরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই দীর্ঘ বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য যেন একটা প্রবল আবেগ ও উদ্দীপনা ঢেলে দিয়ে শ্রোতাদের সম্মোহিত করে তুলেছে। এখানে তাঁর মূল ভাষায় কয়েকটি লাইন তুলে ধরা হলোঃ [১৯]

أيهاالناس: صه صه، إن لى عليكم حق الأمومة وحرمة الموعظة، لايتهمنى إلامن عصى ربه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرى ونحرى، فأناإحدى نسائه فى الجنة، له ادخرنى ربى وخلصنى من كل بضاعة، وبى ميزمنافقكم من مؤمنكم، وبى أرخص الله لكم فى صعيد الأبواء، ثم أبى ثانى اثنين الله ثالثهما وأول من سمى صديقا، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا عنه، ... وأنا نصب المسئلة عن مسيرى هذا، لم ألتمس أثما ولم أونس فتنة أوطئكموها ...

'ওহে জনমণ্ডলী! চুপ করুন, চুপ করুন। নিশ্চয় আপনাদের উপর আমার মায়ের দাবী আছে, উপদেশ দানের অধিকার আছে। আমার প্রতি কেউ কলঙ্ক আরোপ করতে পারেনা। একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) আমারই বুকে মাথা রেখে ইনতিকাল করেছেন। জান্নাতে আমি হবো তাঁর অন্যতম স্ত্রী। আমার রব আমাকে তাঁর জন্যই সংরক্ষিত রেখেছেন এবং অন্যদের থেকে পবিত্র রেখেছেন। আমার সত্তা দ্বারাই তোমাদের মুনাফিকদেরকে তোমাদের মুমিনদের থেকে পৃথক করেছেন। আমার দ্বারাই আল্লাহ তোমাদেরকে আবওয়ার মাটিতে তায়াম্মুমের সুযোগ দিয়েছেন। অতঃপর আমার পিতা সেই ছাওর পর্বতের গুহায় দুই জনের মধ্যে দ্বিতীয়, আর আল্লাহ ছিলেন তৃতীয়। তিনিই সর্বপ্রথম সিদ্দীক উপাধি লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি খুশী থাকা অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। হাঁ, এখন আমি মানুষের এই প্রশ্নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছি যে, আমি কিভাবে বাহিনী নিয়ে বের

১৯. *আল-'ইকদুল ফারীদ- ৪/৩১৪-৩১৬*

হলাম? এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য কোন পাপের বাসনা ও ফিত্না ফাসাদের অন্বেষণ করা নয়।'

চিঠি-পত্র

আরবী সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য প্রাচীন সংকলনসমূহে হযরত 'আয়িশার (রা) বহু গুরুত্বপূর্ণ চিঠি দেখতে পাওয়া যায়। সে সব চিঠি তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিকট লিখেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এ সব চিঠি কি তিনি নিজ হাতে লিখেছিলেন, না তার পক্ষ থেকে কোন সেক্রেটারি এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন?[২০] যিনিই লিখুন না কেন, তার ভাব ও ভাষা যে হযরত 'আয়িশার (রা) ছিলনা, এমন কোন প্রমাণ নেই। তাই আরবী সাহিত্যের প্রাচীন কালের পণ্ডিতরা হযরত আয়িশার এ সব চিঠির সাহিত্য-মূল্য বিবেচনা করে নিজেদের রচনাবলীতে স্থান দিয়ে গেছেন। ইবন 'আবদি রাব্বিহি আল-আন্দালুসীর বিখ্যাত সংকলন-'আল-'ইকদুল ফরীদ'-এর ৪র্থ খণ্ডে তার অনেকগুলি চিঠি সংকলিত হয়েছে। যেমন, তিনি বসরায় পৌঁছে তথাকার এক নেতা যায়দ ইবন সূহানকে লিখেছেন ঃ[২১]

من عائشة أم المؤ منين إلى إبنها الخالص زيد بن صوحان، سلام عليك، أما بعد، فإن أباك كان رأسا فى الجاهلية وسيدا فى الاسلام، وإنك من ابيك بمنزلة المصلى من السابق يقال كاد أولحق وقد بلغك الذى كان فى الاسلام من مصاب عثمان بن عفان، ونحن قادمون عليك، والعيان أشفى لك من الخبر. فإذا أتاك كتابى هذا فثبط الناس عن على بن أبى طالب، وكن مكانك حتى يأتيك أمرى، والسلام.

'উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) পক্ষ থেকে তার নিষ্ঠাবান ছেলে যায়দ ইবন সূহানের প্রতি। সালামুন আলাইকা। অতঃপর তোমার পিতা জাহিলী আমলে নেতা ছিলেন, ইসলামী আমলেও। তুমি তোমার পক্ষ থেকে মাসবূক মুসল্লীর অবস্থানে আছ যাকে বলা যায় প্রায় অথবা নিশ্চিতভাবে লাহেক হয়েছে। তুমি জেনেছো যে, 'উছমান ইবন 'আফ্ফান হত্যার মাধ্যমে ইসলামে কী বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। আমরা তোমাদের কাছে এসেছি। চাক্ষুস দেখা সংবাদের চেয়ে অধিক স্বস্তিদায়ক। তোমার কাছে আমার এ চিটি

---

২০. আল কালকাশান্দী বলেছেন, সেকালে একদল মহিলা লেখালেখি জানতেন একথা বর্ণিত হয়েছে এবং প্রথম পর্বের পণ্ডিতদের কেউ তা অস্বীকার করেননি। আবূ জা'ফার আন্‌-নাহহাস বলেছেন, আয়িশা (রা) বিসমিল্লাহ দ্বারা লেখা শুরু করতেন।

২১. প্রাগুক্ত ঃ ৪/৩১৬-৩২০

পৌঁছার পর মানুষকে 'আলী ইবন আবী তালিবের পক্ষাবলম্বন থেকে ঠেকিয়ে রাখবে। তুমি তোমার গৃহে অবস্থান করতে থাক, যতক্ষণ না আমার নির্দেশ তোমার কাছে যায়। ওয়াস্সালাম।'

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) উপরোক্ত চিঠির যে জবাব যায়দ ইবন সূহান দিয়েছিলেন তা একটু দেখার বিষয়। আমরা সেই চিঠিটি তুলে দিয়ে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানছি। যায়দ ইবন সূহান লিখছেন ঃ[২২]

من زيد بن صوحان إلى عائشة أم المؤ منين سلام عليك، أما بعد، فإنك أمرت بأمر وأمرنا بغيره، أمرت أن تقر فى بيتك، وأمرنا أن نقاتل الناس حتى لا تكون فتنة، فتركت ما أمرت به وكتبت تنهينا عما أمرنا به والسلام.

'যায়দ ইবন সূহানের পক্ষ থেকে উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর আপনাকে কিছু কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ভিন্ন কিছু কাজের। আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঘরে অবস্থান করার জন্য, আর আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য, যতক্ষণ ফিত্না দূরীভূত না হয়। আপনি ছেড়ে দিয়েছেন যা আপনাকে করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমাদের যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা থেকে বিরত থাকার জন্য আপনি লিখেছেন। ওয়াস সালাম।'

হযরত 'আয়িশার (রা) কাব্যপ্রীতি

ইসলাম-পূর্ব আমলের আরবরা ছিল একটি কাব্যরসিক জাতি। তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কবি ও কবিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাদের নিকট কবির স্থান ছিল সবার উপরে। তারা কবি ও নবীকে একই কাতারের মানুষ বলে মনে করতো। তাইতো তারা রাসূলুল্লাহকেও (সা) কবি বলে আখ্যায়িত করেছিল। ইবন রাশীক আল-কায়রোয়ানী জাহিলী আরবে কবির স্থান ও মর্যাদার কথা বর্ননা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ[২৩]

كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنئتها، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر، كما يصنعون فى الأعراس، ويتباشر الرجال والولدان، لأنه (اى الشاعر) حماية لأعراضهم وذب عن أحسا بهم وإشادة بذكر هم ...

---

২২. *প্রাগুক্ত ঃ ৪/৩১৭-৩১৮*
২৩. *কিতাবুল 'উমদাহ- ১/৭৮*

'আরবের কোন গোত্রে যখন কোন কবি প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন তখন অন্যান্য গোত্রের লোকেরা এসে সেই গোত্রকে অভিনন্দন জানাতো। নানা রকম খাদ্য-দ্রব্য তৈরী করা হতো। বিয়ের অনুষ্ঠানের মত মেয়েরা সমবেত হয়ে বাদ্য বাজাতো। পুরুষ ও শিশু কিশোররা এসে আনন্দ প্রকাশ করতো। এর কারণ, কবি তাদের মান-মর্যাদার রক্ষক, বংশের প্রতিরোধক এবং নাম ও খ্যাতির প্রচারক।'

প্রাচীন আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, জাহিলী আরবে যেন কাব্য চর্চার প্লাবন বয়ে চলেছে। অসংখ্য কবির নাম পাওয়া যায় যা গুণেও শেষ করা যাবে না। ইবন কুতায়বা বলেছেন ঃ[২৪]

والشعراء المعوفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم فى الجاهلية والاسلام أكثر من أن تحيط بهم محيط.

'কবিরা-যাঁরা কবিতার জন্যে তাদের সমাজে ও গোত্রে জাহিলী ও ইসলামী আমলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাঁদের সংখ্যা এত বেশী যে কেউ তা শুমার করতে পারবে না।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ[২৫]

ولو قصدنا لذكر من لم يقل من الشعر الا الشذ اليسير لذكرنا أكثر الناس.

'যারা কবিতা বলেনি- তাদের সংখ্যা খুবই কম-তাদের নাম যদি আমরা উল্লেখ করতে চাই তাহলে অধিকাংশ লোকের নাম উল্লেখ করতে পারবো।'

রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন ঃ[২৬]

قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فى الانصار بيت إلا وهو يقول الشعر.

'রাসলুল্লাহ (সা) যখন আমাদের এখানে আসেন তখন আনসারদের প্রতিটি গৃহে কবিতা বলা হতো।'

মোটকথা একজন আরব কবি তার কবিতার মাধ্যমে কোথাও যেমন আগুন জ্বালিয়ে দিত তেমনিভাবে কোথাও জীবনের বারি বর্ষণও করতো। এ গুণটি কেবল পুরষদের সাথে সংযুক্ত ছিল না; বরং নারীরাও এর সাথে প্রযুক্ত ছিল। ইসলামের পূর্বে এবং ইসলামের পরেও শতবর্ষ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে আরবীয় এ গুণ-বৈশিষ্টটি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান

২৪. আশ-শি'রু ওয়াশ্ শু'আরাউ- পৃ.৩
২৫. প্রাগুক্ত- পৃ. ৩
২৬. আল 'ইকদুল ফারীদ-৫/২৮৩

ছিল। সে আমলের এমন অসংখ্য নারীর পরিচয় পাওয়া যায় যাঁরা কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় এমন নৈপুণ্য দেখিয়েছেন যে, তাঁদের কথা আরবী কাব্যজগতের একেকটি সৌন্দর্যে পরিণত হয়েছে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) আরবের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এমন একটি পর্বে জন্মলাভ করেন। তাঁর নিজের পরিবারেও কবিতার চর্চা ছিল। পিতা আবূ বকর (রা) একজন কবি ছিলেন।[২৭] প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসয়্যিব বলেন ঃ[২৮]

كان ابوبكر شاعرا، وعمر شاعرا وعلى أشعر الثلاثة.

'আবূ বকর (রা) কবি ছিলেন। 'উমার (রা) কবি ছিলেন। আর 'আলী (রা) ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।'

তাই বলা চলে পিতার কাছ থেকেই তিনি কাব্যশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। কবিতার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, চিত্রকল্প ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যেসব মন্তব্য ও মতামত রেখেছেন তাতে এ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণিত হয়। তাঁর এক গুণমুগ্ধ শাগরিদ আল মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ বলেছেন ঃ[২৯]

ما كنت أعلم أحدا من أصحاب رسول صلعم أعلم بشعر ولا فريضة من عائشة رضى الله عنها.

'রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে কাব্য ও ফারায়েজ শাস্ত্রে আয়িশার (রা) চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখে এমন কাউকে আমি জানিনে।'

হযরত 'উরওয়া ইবন যুবায়র ঠিক একই রকম কথা বলেছেন।[৩০] তাঁর অন্য একজন শাগরিদ বলেছেন, আমি 'আয়িশার (রা) কাব্য-জ্ঞান দেখে বিস্মিত হইনে। কারণ তিনি আবূ বকরের (রা) মেয়ে।'

হযরত 'আয়িশা (রা) নিজেও একজন কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার কিছু চরণ কোন কোন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[৩১]

ইমাম বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে হযরত 'উরওয়ার একটি বর্ণনা নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত কা'ব ইবন মালিকের (রা) একটি পূর্ণ কাসীদা হযরত 'আয়িশার (রা) মুখস্থ ছিল। একটি কাসীদায় কম-বেশী চল্লিশটি শ্লোক ছিল।[৩২] হযরত 'আয়িশা

---

২৭. মুসনাদ-৬/৬৭
২৮. আল-'ইকদুল ফারীদ-৫/২৮৩
২৯. প্রাগুক্ত-৫/২৭৪
৩০. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/২৮
৩১. আ'লাম আন-নিসা'- ৩/১১৩-১১৪
৩২. বাবুঃ আশ-শি'রু হাসানুন কা হাসানিল কালাম

(রা) বলতেন ঃ[৩৩]

روو أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم.

'তোমরা তোমাদের সন্তানদের কবিতা শেখাও। তাতে তাদের ভাষা মাধুরীময় হবে।' জাহিলী ও ইসলামী যুগের কবিদের বহু কবিতা হযরত 'আয়িশার (রা) মুখস্থ ছিল। সেই সকল কবিতা বা তার কিছু অংশ সময় ও সুযোগমত উদ্ধৃতির আকারে উপস্থাপন করতেন। তার বর্ণিত বহু কবিতা বা পংক্তি হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি হযরত 'আয়িশাকে (রা) জিজ্ঞেস করে, রাসূলুল্লাহ (সা) কি কখনও কবিতা আবৃত্তি করেছেন? বললেন ঃ হাঁ, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কিছু শ্লোক তিনি আবৃত্তি করতেন। যেমন ঃ[৩৪]

ويأتيك بالأخبار من لم تزود.

'তুমি যাকে পাথেয় দিয়ে পাঠাওনি সে অনেক খবর নিয়ে তোমার কাছে আসবে।' রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন শুনলেন, 'আয়িশা (রা) কবি যুহায়র ইবন জানাবের নিম্নোক্ত পংক্তি দুইটি আবৃত্তি করছেন ঃ[৩৫]

إرفع ضعيفك لايحريك ضعفه + يوما فتدركه عواقب ماجنى
يخزيك أويثنى عليك فان من + أثنى مليك بما فعلت كمن جزى.

'তুমি উঠাও তোমার দুর্বলকে। যার দুর্বলতা তোমার বিরুদ্ধে কোন দিন যুদ্ধ করবে না। অতঃপর সে যা অর্জন করেছে তার পরিণতি সে লাভ করবে।

সে তোমাকে প্রতিদান দিবে অথবা তোমার প্রশংসা করবে। তোমার কর্মের যে প্রশংসা করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে প্রতিদান দিয়েছেন।'

পংক্তি দুইটি শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'আয়িশা! সে সত্য বলেছে। যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

আবু কাবীর আল-হুযালী একজন জাহিলী কবি। তিনি তাঁর সৎ ছেলে কবি তায়াব্বাতা শাররান-এর প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেন। যার দুইটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ[৩৬]

ومبرء من كل غير حيفة + وفساد مرضعة وداء مغيل

---

৩৩. *আল-'ইকদুল ফারীদ-৫/২৭৪*

৩৪. *আদাবুল মুফরাদ-বাব ঃ আশা শি'রু হাসানুল কা হাসানিল কালাম*

৩৫. *আল-'ইকদুল ফারীদ- ৫/২৭৫*

৩৬. *হাফেজ ইবন কায়্যিম তাঁর মাদারিজুস সালিকীন গ্রন্থে পংক্তি দুইটি বর্ণনা করেছেন। পৃ. ২৭৭ (মিসর)*

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه + برقت كبرق العارض المتهلل

'সে তার মায়ের গর্ভের সকল অশুচিতা এবং
দুধ দানকারী ধাত্রীর যাবতীয় রোগ-থেকে মুক্ত।
যখন তুমি তার মুখমণ্ডলের মজবুত শিরা উপশিরার দিকে
দৃষ্টিপাত করবে, তখন তা প্রবল বর্ষণের সাথে
বিদ্যুতের চমকের মত চমকাতে দেখবে।'

হযরত 'আয়িশা (রা) একদিন উপরোক্ত শ্লোক দুইটি রাসূলুল্লাহকে (সা) শুনিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই তো এ দুইটি শ্লোকের বেশী হকদার। তাঁর এ কথায় রাসূলুল্লাহ (সা) উৎফুল্ল হন।

'আয়িশা (রা) নিম্নের দুইটি বয়েত দিয়ে প্রায়ই মিছাল দিতেন ঃ[৩৭]

إذا ما الدهر جرى على أناس + حوادثه أناخ باخرينا

قل للشامتين بنا أفيقوا + سيلقى الشامتون كما لقينا

কালচক্র যখন তার বিপদ মুসীবত সহ কোন জনমণ্ডলীর উপর দিয়ে ধাবিত হয় তখন তা আমাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে থামে। আমাদের এ বিপদ দেখে যারা উৎফুল্ল হয় তাদের বলে দাও- তোমরা সতর্ক হও। খুব শিগগিরই তোমরা মুখোমুখি হবে, যেমন আমরা হয়েছি।'

হযরত 'আয়িশার (রা) ভাই 'আবদুর রহমান ইবন আবী বকরের (রা) ইনতিকাল হয় মক্কার পাশে এবং মক্কায় দাফন করা হয়। পরে যখন হযরত 'আয়িশা (রা মক্কায় যান তখন ভাইয়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটি আবৃত্তি করেন ঃ[৩৮]

وكنا كند مانى جذيمة حقبة + من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

فلماتفرقا كأنى ومالكا + لطول اجتماع لم نبت ليلة معا.

'আমরা দুইজন বাদশাহ জাযীমার দুইজন সহচরের মত একটা দীর্ঘ সময় একসাথে থেকেছি। এমনকি লোকে আমাদের সম্পর্কে বলাবলি করতো যে, আমরা আর কখনও পৃথক হবো না।

অতঃপর আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম তখন আমি ও মালিক যেন দীর্ঘকাল সহঅবস্থান সত্ত্বেও একটি রাতও এক সাথে কাটাইনি।'

---

৩৭. আল-'ইকদুল ফারীদ-২/৩২২। আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী এই বয়েত দুইটি কবি আল-ফারাযদাকের মামা কবি আল-আলা' ইবন কারাজা-এর বলে উল্লেখ করেছেন। (আল-আগানী, মাতবায়াতু বুলাক, মিসর, খণ্ড ১৯, পৃ. ৪৯)

৩৮. তিরমিজী ঃ যিয়ারাতুল কুবুর লিন্-নিসা

মক্কার মুহাজিরদের শরীরে প্রথম প্রথম মদীনার আবহাওয়া খাপ খাচ্ছিল না। হযরত আবূ বকর (রা), হযরত 'আমির ইবন ফুহায়রা (রা), হযরত বিলাল (রা) এবং আরো অনেকে, এমনকি খোদ 'আয়িশা (রা) মদীনায় আসার পর প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বরের ঘোরে তাঁদের অনেকের মুখ থেকে তখন কবিতার পংক্তি উচ্চারিত হতো। এমন কিছু পংক্তি হযরত 'আয়িশার (রা) স্মৃতিতে ছিল এবং তিনি বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ হযরত আবূ বকরের (রা) জ্বরের প্রকোপ দেখা দিলে নিম্নোক্ত শ্লোকটি আওড়াতেন ঃ[৩৯]

كل إمرئ مصبح فى أهله
والموت أدنى من شراك نعله.

'প্রতিটি মানুষ তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে দিনের সূচনা করে।

অথচ মৃত্যু তার জুতোর ফিতের চেয়েও বেশী নিকটবর্তী।'

হযরত বিলাল (রা) জ্বরের ঘোরে নিম্নের পংক্তি দুইটি জোরে জোরে আওড়াতেনঃ

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة + بوالى حولى ذخر وجليل
وهل أردن يوما مياه مجنة + وهل يبدون لى شامة وطفيل.

'হায়! আমি যদি জানতে পারতাম যে, কোন একটি রাত আমি মক্কার উপত্যাকায় কাটাবো এবং আমার চারপাশে ইজখীর ও জলী ঘাস থাকবে। অথবা মাজান্নার সরোবরে কোন একদিন আমার বিচরণ ঘটবে, অথবা শামা ও তুফায়েল পর্বতদ্বয় কোনদিন আমর দৃষ্টিগোচর হবে!'

হযরত 'আমির ইবন ফুহায়রাকে (রা) তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে এই পংক্তিটি আবৃত্তি করতেন ঃ[৪০]

إنى وجدت الموت قبل ذوقه + إن الجبان حتفه من فوقه.

'আমি স্বাদ চাখার আগেই মৃত্যুকে পেয়ে গেছি। ভীরু-কাপুরুষের মৃত্যু তার উপর দিক থেকেই আসে।'

বদর যুদ্ধে কুরায়শদের অনেক বড় বড় নেতা নিহত হয় এবং তাদেরকে বদরের কুয়োয় নিক্ষেপ করা হয়। কুরায়শ কবিরা তাঁদের স্মরণে অনেক আবেগজড়িত মরসিয়া রচনা করেছিল। সেই সকল কবিতার অনেক পংক্তি হযরত 'আয়িশার (রা) স্মৃতিতে ছিল এবং তিনি তা বর্ণনাও করেছেন। নিম্নের বয়েত দুইটিও তিনি বর্ণনা করেছেন।[৪১]

---

৩৯. সহীহ বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ্
৪০. মুসনাদ- ৬/৬৫
৪১. সহীহ বুখারী ঃ বাবুল হিজরা

وماذا بالقليب بدر + من القينات والشرب الكرام
تحى بالسلامة أم بكر + وهل لى بعد قومى من سلام.

'বদরের কূপের মধ্যে কতনা নর্তকী ও অভিজাত শরাবখোর পড়ে আছে, তাদের অবস্থা কি? উম্মে বকর তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছে। আমার স্বগোত্রের লোকদের মৃত্যুর পরে আমার জন্য কোন শান্তি আসতে পারে কি?'

হযরত সা'দ ইবন মু'আজ (রা) খন্দক যুদ্ধের সময় আরবী রজয ছন্দের একটি গানের একটি কলি আওড়াতেন, তাও হযরত 'আয়িশা (রা) মনে রেখেছিলেন। সেটি তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

ليت قليلا يدرك الهيجا جمل + ماأحسن الموت إذا حان الأجل.

'হায়! যদি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে উট যুদ্ধের নাগাল পেয়ে যেত। মরণের সময় যখন ঘনিয়ে এসেছে তখন সে মরণ কতনা প্রিয়।'

মক্কার কুরায়শ কবিরা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিন্দায় কবিতা বলতো তখন মদীনার মুসলমান কবিরা কিভাবে তার জবাব দিতেন, সে কথাও আমরা হযরত 'আয়িশার (রা) মাধ্যমে জানতে পারি। তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা কুরায়শদের নিন্দা করে কবিতা রচনা কর। এ কবিতা তাদের উপর তরবারির আঘাতের চেয়েও বেশী কার্যকর হবে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) একজন কবি ছিলেন। তিনি একটি কবিতা রচনা করলেন; কিন্তু তা রাসূলুল্লাহর (সা) তেমন পছন্দ হলো না। তিনি কবি কা'ব ইবন মালিককে (রা) নির্দেশ দিলেন কুরায়শদের জবাবে একটি কবিতা লিখতে। অবশেষে হযরত হাস্‌সান ইবন ছাবিতের পালা এলো। তিনি এসে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমি তাদের এমন বিধ্বস্ত করে ছাড়বো, যেমন লোকেরা চামড়াকে করে থাকে।' রাসূল (সা) বললেন ঃ তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই। আবূ বকর গোটা কুরায়শ খান্দানের মধ্যে কুরায়শদের নসবনামা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ। আমারও তাঁর সাথে নিকট সম্পর্ক। আমার বংশসূত্র তাঁর কাছ থেকে ভালো করে বুঝে নাও। অতঃপর তিনি আবূ বকরের (রা) নিকট যান এবং বংশসূত্রের নানা রকম প্যাঁচ ও জটিলতা সম্পর্কে জেনে আবার রাসূলুল্লাহর(সা) নিকট এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই জাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাকে তাদের থেকে এমনভাবে বের করে আনবো, যেমন লোকেরা আটার দলা থেকে চুল টেনে বের করে আনে। তারপর হাস্‌সান (রা) একটি কাসীদা পাঠ করেন যার একটি বয়েত এই ঃ

إن سنام المجد من ال هاشم + بنو بنت مخزوم ووالدك

'আলে হাশিমের সম্মান ও মর্যাদার শিখর হচ্ছেন মাখযূমের নাতি। আর তোমার বাপ ছিল দাস।'

হযরত 'আয়িশা (রা) বলছেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, 'হাস্‌সান! যতক্ষণ তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করতে থাকবে, রুহুল কুদুসের সাহায্য তুমি লাভ করবে।' তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) একথাও বলতে শুনেছি, 'হাস্‌সান তাদের জবাব দিয়ে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করেছে।' এসব কথা বর্ণনার পর উম্মুল মুমিনীন আমাদেরকে হাস্‌সানের এ কাসীদাটিও শুনিয়েছেন ঃ[৪২]

هجوت محمدا فاجبت عنه + عند الله فى ذاك الجزاء

هجوت محمدا برا حنيفا + رسول الله شيمته الوفاء

فان أبى ووالده وعرضى + لعرض محمد منكم وقاء

فمن يهجورسول الله منكم + ويمدحه وينصره سواء

وجبريل رسول الله فينا + وروح القدس ليس له كفاء.

'তুমি করেছো মুহাম্মাদের নিন্দা, আর আমি তার জবাব দিয়েছি। আমার এ কাজের প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর কাছে।

তুমি মুহাম্মাদের নিন্দা করেছো, যিনি সৎকর্মশীল, ধার্মিক ও আল্লাহর রাসূল। প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা পালন যার স্বভাব-বৈশিষ্ট।

আমার বাপ-দাদা আমার ইজ্জত-আব্রু সবই তোমাদের আক্রমণ থেকে মুহাম্মাদের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ।

তোমাদের মধ্য থেকে কেউ রাসূলুল্লাহর নিন্দা, প্রশংসা বা সাহায্য করুক না কেন, সবই তাঁর জন্য সমান।

জিবরীল আমাদের মধ্যে আছেন। যিনি আল্লাহর বার্তাবাহক ও পবিত্র রূহ-যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'

হযরত 'উছমানের (রা) শাহাদাতের পর মদীনার বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা যখন জানলেন তখন তাঁর মুখে নিম্নোক্ত পংক্তিটি উচ্চারিত হলো ঃ[৪৩]

ولوأن قومى طاوعتنى سراتهم + لا نقذتهم من الحبال والخبل.

---

৪২. এই ঘটনা ও কাসীদাটি সহীহ মুসলিমে 'মানাকিবে হাস্‌সান' পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে

৪৩. দেখুন ঃ তাবারী, ব্রীলি সংস্করণ, পৃ. ৩০৯৯, ৩২০১

'যদি আমার সম্প্রদায়ের নেতারা আমার কথা মানতো তাহলে আমি তাদের এই ফাঁদ ও ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারতাম।'

বসরা পৌঁছার পর তাঁর মুখে নিম্নের দুইটি বয়েত শোনা যেত ঃ

دعى بلاد جموع الظلم اذ صلحت + فيها المياه وسيرى سير مذعور
تخيرى النبت فارعى ثم ظاهرة + وبطن واد من الضماد ممطور.

'অত্যাচারীদের আবাসভূমি ছেড়ে দাও-যদিও সেখানে পানি বিশুদ্ধ থাকে এবং ভীতিগ্রস্থদের চলার মত চল।

ঘাস নির্বাচন কর। অতঃপর দামাদের সবুজ উপত্যাকায় রোদের মধ্যে চরতে থাক।'

উটের যুদ্ধে কোন কোন বীর সৈনিক রজয ছন্দের যে চরণ দুইটি আবৃত্তি করেছিলেন, তা হযরত 'আয়িশার (রা) স্মরণে ছিল। একবার তিনি চরণ দুইটি আবৃত্তি করে খুব কেঁদেছিলেন। সেই চরণ দুইটি এই ঃ

ياأمنا يا خير أم نعلم + أما ترين كم شجاع يكلم
وتختلى هامته والمعصم.

'হে আমাদের মা! যাঁকে আমরা সর্বোত্তম মা বলে জানি, আপনি কি দেখছেন না, কত বীর আহত হয়েছে, কত মাথা ও হাত ঘাসের মত কাটা গেছে।'

হিশাম ইবন 'উরওয়া তাঁর পিতা 'উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। 'আয়িশা (রা) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা কবি লাবীদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন। তিনি বলতেন।[৪৪]

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم + وبقيت فى خلف كجلد الأجرب.

'যাঁদের পাশে বসবাস করা যেত, তাঁরা সব চলে গেছেন। এখন আমি বেঁচে আছি চর্মরোগগ্রস্ত উটের মত উত্তরসূরীদের মাঝে।'

তারপর হযরত 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ

'তিনি যদি আমাদের এ কালের অবস্থা দেখতেন, তাহলে কী বলতেন! আমি কবি লাবীদের এ রকম হাজারটি বয়েত বলতে পারি। অবশ্য অন্য কবিদের যে পরিমাণ বয়েত আমি বলতি পারি তার তুলনায় এ অতি নগণ্য।'

হযরত 'আয়িশার (রা) এ মন্তব্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, তিনি কি পরিমাণ কাব্যরসিক ছিলেন, এ শাস্ত্রে তাঁর কি পরিমাণ দখল ছিল এবং কত শত আরবী বয়েত

---

৪৪. আল- 'ইকদুল ফারীদ- ২/৩৯৯; ৫/২/৭৫

তাঁর মুখস্থ ছিল। হাদীছ শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন। আরবী কবিতার ক্ষেত্রে একই দৃশ্য দেখা যায়।

হযরত 'আয়িশার (রা) এমন কাব্যরুচি এবং শিল্পরস আস্বাদন ক্ষমতা দেখে অনেক কবি তাঁকে নিজের কবিতা শোনাতেন। হযরত হাস্সান ইবন ছাবিত (রা) আনসারদের মধ্যে কবিত্বের স্বীকৃত উসতাদ ছিলেন। ইফ্কের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার কারণে হযরত 'আয়িশার (রা) তাঁর প্রতি অসন্তোষ থাকা স্বাভাবিক ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি হযরত 'আয়িশার (রা) খিদমতে হাজির হয়ে তাঁকে নিজের কবিতা শোনাতেন।[৪৫] হযরত 'আয়িশা (রা) তার প্রশংসা করতেন এবং তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করতেন। তাছাড়া প্রসঙ্গক্রমে নবীর (সা) জলসার অপর দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) ও হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) নামও উল্লেখ করতেন।[৪৬]

মূলগতভাবে কাব্যচর্চা করা না ভালো, না মন্দ। কবিতাও কথার একটি প্রকার। কথার ভালো মন্দ কবিতার ছন্দের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল। বিষয়বস্তু যদি খারাপ না হয় তাহলে সেই কবিতায় কোন দোষ নেই। গদ্যেরও ঠিক একই অবস্থা। ভালোমন্দ নির্ভর করে বিষয়বস্তুর উপর।

কবিতার ভালোমন্দ সম্পর্কে হযরত 'আয়িশা (রা) ঠিক এ রকম কথাই বলেছেন ঃ[৪৭]

الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القابح.

'কিছু কবিতা ভালো হয়, কিছু কবিতা খারাপ হয়। ভালোটি গ্রহণ কর, খারাপটি পরিত্যাগ কর।'

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ 'সবচেয়ে বড় গুণাহগার ঐ কবি, যে গোটা গোত্রের নিন্দা করে। অর্থাৎ এক দুই জনের খারাপ কাজের জন্য গোটা গোত্রের নিন্দা করা নৈতিকতার পদস্খলন এবং কবিত্ব শক্তির অপব্যবহার মাত্র।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, হযরত 'আয়িশা (রা) এমন এক বিস্ময়কর প্রতিভা যার বর্ণনা ও মূল্যায়ন কোন সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। তাঁর জীবন ও বিচিত্রমুখী প্রতিভার বিবরণের জন্য প্রয়োজন একখানি বৃহদাকৃতির গ্রন্থের। আমাদের আলোচনায় আমরা তাঁর কিছু পরিচয় পাঠকবর্গের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

---

৪৫. সহীহ বুখারী ঃ মানকিবু হাস্সান

৪৬. প্রাগুক্ত

৪৭. আদাবুল মুফরাদ ঃ বাবুশ শি'র

কবিতা ও কবিদের প্রতি 'উমারের (রা) দৃষ্টিভঙ্গি

রাসূলুল্লাহর (সা) মহান সাহাবী হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা)। খিলাফতে রাশিদার দ্বিতীয় খলীফা। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ক যাবতীয় ইসলামী আইন-কানুন এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ক সকল নিয়ম-নীতির সফল বাস্তবায়নকারী তিনি। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবর্তিত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করেন তিনিই। রাষ্ট্র পরিচালনা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় কেবল তিনি প্রবাদ পুরুষে পরিণত হননি বরং মানব জীবন ও সমাজের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে ইতিহাসে স্থায়ী আসন রেখে গেছেন। মানুষের সংস্কৃতির একটি অংশ হলো সাহিত্য ও কবিতা চর্চা করা। এ বিষয়ে তাঁর রুচি কেমন ছিল, কবিতার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল এবং কবিদের সাথে তাঁর আচরণই বা কেমন ছিল, এ সব বিষয়ে অনেক তথ্য সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে। সে সব তথ্য একত্র করলে শিল্প, সাহিত্য ও কবিতা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির একটা চিত্র লাভ করা যায়। আর তা আমাদের সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনার কাজ করতে পারে। কোন রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে না গিয়ে আমরা সেই সব তথ্য ও ঘটনার কিছু উপস্থাপন করেছি। এর দ্বারা পাঠকগণ কবিতা ও কবিদের প্রতি 'উমারের (রা) দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারবেন।

প্রখ্যাত তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) বলেছেন, 'উমার (রা) একজন কবি ছিলেন।[১] কিন্তু আমরা তাঁর কোন কবিতা পাইনি। হতে পারে আরো অনেকের মত তাঁরও কবিতা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।[২] তবে তাঁকে প্রচুর কবিতা আবৃত্তি করতে, কবিদের কবিতার মূল্যায়ন করতে যেমন দেখা যায়, তেমনি তার দরবারে কবিদের গমনাগমনও দেখা যায়। এখানে তারই কিছু তুলে ধরা হলো।

কবিতা সম্পর্কে 'উমারের (রা) মন্তব্য

'উমার (রা) বলেন, আরবদের শিল্পসমূহের মধ্যে কবিতা হলো সর্বোত্তম। একজন মানষ তার প্রয়োজনের সময় তা উপস্থাপন করে, একজন ভদ্র ব্যক্তি এর দ্বারাই কোথাও অবতরণের অনুমতি চায় এবং একজন ইতর প্রকৃতির মানুষ এর দ্বারাই করুণা প্রার্থনা করে।[৩]

তিনি আরো বলেন 'কবিতা কোন জাতি-গোষ্ঠীর এমন জ্ঞান যার থেকে বেশী শুদ্ধ ও

---

১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ –৫/২৮৩

২. সিরাতে ইবনে হিশামের টীকায় হযরত 'উমারের (রা) ৮টি চরণ বিশিষ্ট একটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। বলা হয়েছে, এটি তিনি ইসলাম গ্রহণের পর রচনা করেন এবং এতে তাঁর সে সময়ের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। (সীরাত ইবন হিশাম, ১/৩৪৮; টীকা নং ৩)

৩. আল- বায়ান ওয়াত তাবয়ীন –২/৮১, ২৫৬

সঠিক জ্ঞান আর নেই।' ইসলাম আসার পর আরবরা জিহাদ ও পারসিক-রোমানদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তারা কবিতা বলা ও বর্ণনার ব্যাপারে মনোযোগী হতে পারেনি। অতঃপর ইসলামের যখন ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে, একের পর এক বিজয় হতে থাকে এবং বিভিন্ন শহরে আরবরা যখন নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হয়ে যায় তখন আবার কবিতা বর্ণনার দিকে ফিরে আসে। তবে তারা না কোন দিওয়ান তৈরী করেছে, আর না কোন লিখিত গ্রন্থ। (অর্থাৎ কোন দিওয়ান বা গ্রন্থে কবিতা সংরক্ষণ করেনি।) অতঃপর তারা গ্রন্থাবদ্ধ করেছে। কিন্তু ততদিনে অনেক আরব স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে এবং অনেকে নিহত হয়েছে। সুতরাং তারা তাদের কবিতার অতি অল্পই সংরক্ষণ করেছে এবং তাদের মৃত্যুর সাথে বেশী অংশ হারিয়ে গেছে।[৪]

তিনি ছেলে 'আবদুর রহমানকে বলেন : তুমি নিজেকে বংশের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করবে, তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখতে পারবে। সুন্দর সুন্দর কবিতা মুখস্থ করবে, তাহলে তোমার আচার-আচরণ সুন্দর হবে। যে ব্যক্তি নিজের বংশধারা জানেনা সে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতে পারে না। আর যে সুন্দর সুন্দর কবিতা মুখস্থ করেনা সে কারো অধিকার প্রদান করেনা এবং শিষ্টাচারও অর্জন করতে পারে না।[৫]

তিনি সিরীয়দেরকে লেখেন : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে লেখা, সাঁতার, তীর চালনা এবং অশ্বারোহণ শিক্ষা দাও। তাদেরকে অশ্বের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দাও। আর তাদের নিকট প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন ও সুন্দর সুন্দর কবিতা বর্ণনা কর।[৬]

তিনি আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে (রা) লেখেন : তুমি তোমার ওখানকার লোকদেরকে কবিতা শিখতে বল। কারণ, কবিতা উন্নত নৈতিকতা, সঠিক মতামত এবং বংশের জ্ঞানের দিকে পথ দেখায়।[৭]

তিনি আরো বলেন : তোমরা শালীন কবিতা, সুন্দর কথা এবং যে বংশ সম্পর্কে তোমরা জান, যার সাথে সম্পর্ক অটুট রেখেছো, তা বর্ণনা কর। অনেক অজ্ঞাত রক্তসম্পর্ক, কখনো জানা যায় এবং সম্পর্ক জোড়া লাগানো হয়। সুন্দর সুন্দর কবিতা মহত্তম নৈতিকতার দিকে নিয়ে যায় এবং খারাপ নৈতিকতা থেকে বিরত রাখে।[৮]

কবিতা দ্বারা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন

তাঁর সামনে বড় ধরনের কোন বিষয় বা সমস্যা উপস্থাপিত হলেই তিনি সব সময় সে

---

৪. তাবাকাত আশ-শু'আরা' -১৭ ; আল-'উমদা -১/১৪

৫. জামহারাতু আশ'আর আল-'আরাব -১৮

৬. 'উয়ুন আল-আখবার -২/১৬৮ ; আল- মুবাররিদ, আল-কামিল -১/১৫৫ ; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন -৩/১৪৬

৭. আল-'উমদা-১/১৫

৮. জামহারাতু আশ'আর আল-'আরাব-১৮

বিষয়ের উপযোগী দু' একটি শ্লোক আবৃত্তি করতেন।[৯] একবার তাঁর উপস্থিতিতে আওস গোত্রের এক বুদ্ধিমতী মহিলার প্রসঙ্গ উঠলো। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে সুন্দর? জবাবে তিনি বলেছিলেন: সবুজ উদ্যানে শুভ্র প্রাসাদসমূহ। একথা শুনে 'উমার (রা) কবি 'আদী ইবন যায়দ আল-'ইবাদীর নিম্নের এই চরণটি আবৃত্তি করেনঃ[১০]

كدمى العاج فى المحاريب أوكالـ + بيض فى الروض زهره مستنير

'যেন সমাবেশস্থলের মাঝখানে হাতির দাঁতের পুতুল, অথবা যেন বাগিচায় শ্বেত-শুভ্র ডিম, যার ফুল আলোকোদ্ভাসিত।'

আল-আসমা'ঈ (মৃ. ১৫৫ হি.) বলেন: একবার 'উমার (রা) কোন এক ভ্রমণে ছিলেন। তাঁর উষ্ট্রীটি ছিল বেশ অবাধ্য ধরনের। ফলে তিনি পরিশ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েন। এক ব্যক্তি একটি ভালো চলনের বাধ্য উষ্ট্রী নিয়ে এলো। তিনি সেটার উপর চড়লেন এবং উষ্ট্রীটি হেলে-দুলে সুন্দর চালে চলতে লাগলো। তিনি তখন নিম্নের এই চরণটি গুনগুন করে আওড়ালেন :

كان راكبها غصن بمروحة + إذا استمرت به أوشارب ثمل

'যেন তার (উষ্ট্রীর) আরোহী পত্রধারী বৃক্ষের শাখা, যখন সে চলতে থাকে, অথবা নেশাগ্রস্ত মাতাল।'

চরণটি আবৃত্তি করে তিনি "আসতাগফিরুল্লাহ" পাঠ করেন। আল-আসমা'ঈ বলেন, আমি জানিনে এটা তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে অন্য কারো কবিতা পাঠ করেন, না নিজেই এটা বলেন।[১১]

সেকালে আরবের উটের রাখালরা গান গেয়ে গেয়ে উট চরাতো, অথবা ভ্রমণের সময় দলবদ্ধ ভাবে তারা যখন চলতো তখন উটের আরোহীরা বা উটের চালকরা এক ধরনের গান গেয়ে উট হাঁকাতো। এ গানকে "হুদী" বলে। বিখ্যাত সাহাবী 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) বলেন: আমি একদিন 'উমারের (রা) বাড়ীর দরজায় গিয়ে শুনলাম "হুদী" গানের সুরে নিম্নের এ চরণটি আবৃত্তি করছেন:

كيف ثوائُ بالمدينة بعدما + قضى وطرا منها جميل بن معمر

'জামীল ইবন মা'মার মদীনা থেকে তার বাসনা পূর্ণ করার পর সেখানে আমার অবস্থান কেমন হবে?'

আমি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন: আমি যা বলেছি, তুমি কি তা

---

৯. *আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন –১/২০৪*

১০. *প্রাগুক্ত –১/৪৫৩ ; আল-কামিল–২/৪৮*

১১. *ইবন দুরায়দ, আল–ইশতিকাক–১/৩৩ ; কিতাবুল আগানী–৮/১৪৪*

শুনেছো? বললাম: হাঁ, শুনেছি। বললেন: আমরা যখন একাকী হই তখন লোকেরা তাদের বাড়ীতে যা কিছু বলে আমরাও তা বলে থাকি।[১২]

আবূ খালিদ আল-গাসসানী বলেছেন: শামের (সিরিয়া) অধিবাসী কিছু প্রবীণ লোক যাঁরা 'উমারকে (রা) পেয়েছেন, তাঁরা আমাকে বলেছেন। 'উমার (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর মিম্বরে উঠলেন। যখন দেখলেন সব মানুষ তাঁর থেকে নীচে বসা তখন আল্লাহর হামদ জ্ঞাপন করলেন। তারপর আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর রাসূলের প্রতি সালাম পেশ করে প্রথম যে কথাটি উচ্চারণ করেন তা হলো নিম্নের চরণ দু'টি :[১৩]

وهون عليك فإن الأمور + بكف الإله مقاديرها
فليس يؤاتيك منهيها + ولاقاصرعنك مأمورها

'নিজের জন্য সব কিছু সহজ করে নাও। কারণ, সব কিছুর নির্ধারণ আল্লাহর হাতে।

সুতরাং নিষিদ্ধ কোন কিছু যেমন তোমার কাছে আসতে পারে না, তেমনি ভাবে আদেশ প্রাপ্ত কোন কিছুও আসতে অক্ষম হয়না।'

একদিন 'উমার (রা) এক ব্যক্তিকে কবিতার একটি চরণ আবৃত্তি করতে শুনে বলেন: ইনি তো রাসূলুল্লাহ (সা)। চরণটি এই:[১৪]

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره + تجد خير نارعندها خيرموقد

'যখন তুমি সেখানে যাবে তখন রাতের বেলা তার প্রজ্জ্বলিত আগুনের আলোর দিকে এগিয়ে যাবে। সেই আগুনকে তুমি সবচেয়ে ভালো আগুন এবং তার পাশেই সবচেয়ে ভালো প্রজ্জ্বলনকারীকে দেখতে পাবে।' উল্লেখ্য যে, প্রাচীন আরবে অতিথিপরায়ণ ব্যক্তিরা এবং সাধু-সন্যাসীরা মরুভূমিতে রাতের বেলা কোন উঁচু টিলার উপর আগুন জ্বালিয়ে রাখতো। যাতে রাতের বেলা মরুভূমিতে চলাচলকারী পথিকরা তাদের নিকট থেকে পথের সন্ধান নিতে পারে। অথবা তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করতে পারে।

একবার যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম (রা) 'উমারের (রা) সাথে চলছিলেন। মুহাস্‌সার উপত্যাকা অতিক্রমের সময় 'উমার (রা) বাহনটি জোরে হাঁকিয়ে নিম্নের শ্লোক দু'টি গুনগুন করে আওড়াতে থাকেনঃ[১৫]

إليك تعدو قلقا وضينها + مخالفا دين النصارى دينها
معترضا فى بطنهاجنينها + قد ذهب الشحم الذى يزينها

'উদ্বিগ্ন অবস্থায় সে এবং তার ছোট বাচ্চা তোমার দিকে দৌড়ে আসে। তার ধর্ম খ্রীষ্ট ধর্মের বিপরীত।

---

১২. আল-কামিল—১/২৬৭

১৩. মুনতাখাবু কানয আল-'উম্মাল—৬/৩০৫

১৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন—২/২৯

১৫. আখবারু 'উমার (রা) —২৪৫

সে দৌড়ে আসে তার ভ্রূণ গর্ভে আটকে রেখে। তখন যে চর্বি তাকে সুন্দর ও লাবন্যময় করে তা দূর হয়ে যায়।'

'উমার (রা) প্রায়ই নিম্নের শ্লোকটি দিয়ে দৃষ্টান্ত দিতেনঃ[১৬]

كأ نك لم توترمن الدهرمرة + إذا أنت أدركت الذى أنت طالبه

'তুমি যেন কালের পক্ষ থেকে একবার প্রতিশোধের শিকার হওনি। আর তা হলো, তুমি যা চাও তা যখন লাভ কর।'

সুফইয়ান আছ-ছাওরী বলেন: আমার নিকট এ তথ্য পৌচেছে যে, 'উমার (রা) নিম্নের শ্লোকটি দিয়ে দৃষ্টান্ত দিতেনঃ[১৭]

لايغر نك عشاء ساكن + قد يوافى بالمنيات السحر

'প্রশান্ত সন্ধ্যা যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয়। প্রভাত মৃত্যু নিয়ে উপস্থিত হতে পারে।'

'উমার (রা) প্রায়ই বলতেন, আমি সালামা গোত্রের এই কবির নিম্নের চরণ দু'টি ছাড়া আবূ বকরের (রা) দৃষ্টান্ত আর খুঁজে পাই না:[১৮]

من يسع كى يدرك أفعاله + يجتهد السد بأرض فضاء
والله لايدرك أفعاله + ذومئزرضاف ولاذو رداء

'কেউ যদি তাঁর কর্মকাণ্ডের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে মূলত সে শূন্যের মাটি দ্বারা বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করবে।

আল্লাহর কসম! প্রশস্ত লুঙ্গি ও চাদর পরিহিতদের কেউ তাঁর কর্মের নাগাল পাবেনা।'

তিনি এ চরণটিও প্রায়ই আওড়াতেন :

ولاتأخذواعقلامن القوم إننى + أرى الجرح يبقى والمعاقل تذهب

'কোন সম্প্রদায়ের নিকট থেকে দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ নিবেনা। আমি দেখি, ক্ষত থেকে যায় এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে গৃহীত অর্থও শেষ হয়ে যায়।'

একবার 'উমারের (রা) নিকট ইয়ামন থেকে কিছু কাপড় এলো। এ খবর পেয়ে মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার ইবন আবী তালিব, মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর আস-সিদ্দীক, মুহাম্মাদ ইবন তালহা ইবন 'উবায়দুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইবন হাতিব এসে 'উমারের (রা) দরজায় ভিড় করলেন। যায়দ ইবন ছাবিত (রা) ঘরে ঢুকে বললেন: আমীরুল মু'মিনীন! এই মুহাম্মাদগণ কাপড়ের জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বললেন: বালক! তাদেরকে ভিতরে আসতে বল। তারপর তিনি কাপড়গুলো আনতে বলেন। যায়দ ইবন ছাবিত সর্বপ্রথম

---

১৬. *প্রাগুক্ত –২৪৬*
১৭. *ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস–১৬২*
১৮. *প্রাগুক্ত–১৬৩*

তার মধ্য থেকে ভালোটি বেছে নিয়ে বলেন : এটি মুহাম্মাদ ইবন হাতিবের জন্য। উল্লেখ্য যে, এই মুহাম্মদ ইবন হাতিব ছিলেন বানূ লুআয় গোত্রের সন্তান এবং তার মা তখন যায়দের স্ত্রী। তাঁর এ কাণ্ড দেখে 'উমার (রা) হায় হায় করে উঠলেন। তারপর 'আম্মারা ইবন আল-ওয়ালীদের নিম্নের দু'টি চরণ দিয়ে উপমা টানলেন:

أسرك لماصرع القوم نشوة + خروجى منها سالما غير غارم
بريئا كأنى قبل لم أك منهم + وليس الخداع مرتضى فى التنادم

'নেশাগ্রস্ততা যখন সম্প্রদায়কে ভূপাতিত করে তখন তার থেকে কোন প্রকার অর্থদণ্ড ছাড়াই আমার বেরিয়ে আসা কি তোমাকে উৎফুল্ল করে?

এমন নিরাপরাধ অবস্থায়, যেন পূর্বে আমি তাদের সাথে ছিলাম না। একত্রে শরাব পানের ক্ষেত্রে ধোঁকাবাজি পছন্দনীয় নয়।'

এরপর তিনি যায়দকে বলেন: কাপড়টি যথাস্থানে রেখে দাও। সেটি অন্য কাপড়ের সাথে রাখার পর তিনি বলেন: এবার চোখ বন্ধ করে এর থেকে একটি উঠিয়ে নাও। যায়দ (রা) তাই করলেন। 'উমার (রা) এবার সেই কাপড়টি তাঁকে দিলেন। আবদুল মালিক বলেন: আমি এর চেয়ে ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন আর দেখিনি।[১৯]

আল-'আয়িশী (মৃ. ২৮৮ হি.) বলেন: কবিতা বিষয়ে 'উমার ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। তবে তিনি আন-নাজ্জাশী ও আল-'আজলানী এবং আল-হুতায়আ ও আয-যিররিকান এর মধ্যে কবিতার বিবাদে জড়াতে পছন্দ করেন নি। তিনি কবিদের এই সব বিবাদে হাস্‌সান ইবন ছাবিতের (রা) মত কবিদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আর এ ভাবে তিনি নিজেকে এসব দ্বন্দ্ব থেকে দূরে রেখেছেন।[২০] আসলে কবিদের এ সব বিবাদে 'উমার (রা) ছিলেন বিচারক। আর বিচারক নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। তাই কবিতা বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও নিজে কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে অন্য কবিদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

কবিদের সম্পর্কে 'উমারের (রা) মতামত এবং তাঁদের সাথে তাঁর আচরণ

ইমরাউল কায়স

একবার আল-'আব্বাস ইমন 'আবদিল মুত্তালিব (রা) কবিদের সম্পর্কে 'উমারের মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেনঃ ইমরাউল কায়স হলেন প্রথম ব্যক্তি যে কবিতার ঢেকে থাকা চোখের পর্দা ফেঁড়ে সুস্থ-সুন্দর চোখ বের করে আনেন। অর্থাৎ তিনিই সর্বপ্রথম কবিতার ভাব ও অর্থকে স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত করেছেন। তার উপর থেকে

---

১৯. 'আবদুল কাহির আল-জুরজানী, দালায়িল আল-ই'জায-১৮
২০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৩৯

সকল পর্দা উন্মোচন করেছেন এবং তার যাবতীয় জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা দূর করেছেন।[২১] উল্লেখ্য যে, এই ইমরাউল কায়স জাহিলী আরবের শ্রেষ্ঠতম ভোগবাদী কবি।

তামীম ইবন মুকবিল ও আন-নাজ্জাশী

একবার তামীম ইবন মুকবিল 'উমার ইবন আল খাত্তাবের নিকট কবি আন-নাজ্জাশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! সে তার কবিতায় আমাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে। সুতরাং তার উপর বদলা নিতে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

'উমার (রা) আন-নাজ্জাসীকে ডেকে প্রশ্ন করেন: তুমি তামীম সম্পর্কে কি বলেছো?

আন-নাজ্জাশী ঃ আমিরুল মু'মিনীন! আমি যা বলেছি তাতে আমার কোন অপরাধ হয়েছে এমন তো দেখিনা। তারপর তিনি এই চরণটি আবৃত্তি করেন :

إذا الله عادى أهل لؤم وذلة + فعادى بنى العجلان رهط ابن مقبل

'আল্লাহ যদি কোন হেয় ও নীচ লোকদের শত্রু হন তাহলে তিনি ইবন মুকবিলের গোত্র বানূ আল-'আজলানের শত্রু হবেন।'

শ্লোকটি শুনে 'উমার (রা) মন্তব্য করলেন: আল্লাহ কোন মুসলমানের শত্রু হন না। তারপর আন-নাজ্জাশী এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেন:

قبيلته لايغدرون بذ مة + ولا يظلمون الناس حبة خردل

'তার গোত্র কোন প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে না এবং একটা সরিষার দানা পরিমাণও মানুষের উপর জুলম করেনা।'

শ্লোকটি শুনে 'উমার (রা) মন্তব্য করেন : হায়! আমি যদি এদের একজন হতে পারতাম। তারপর আন-নাজ্জাশী আবৃত্তি করেন :

تعاف الكلاب الضاريات لحومهم + وتأكل من عوف بن كعب بن نهشل

'অতিমাত্রায় মাংস লোভী কুকুরও তাদের মাংস স্পর্শ করেনা। তবে তারা 'আওফ ইবন কা'ব ইবন নাহশাল গোত্রের লোকদের মাংস খায়।'

উমার (রা) মন্তব্য করলেনঃ কুকুরে যাদের মাংস খায় তাদের ধ্বংসের জন্য তাই যথেষ্ট। আন-নাজ্জাশী আবার আবৃত্তি করলেন :

ولايردون الماء إلاعشية + إذاصدرالورادعن كل منهل

'তারা রাতের বেলা পানি পানের স্থানে আসে, যখন সকল পানি পানের স্থান থেকে সকল আগমনকারী ফিরে যায়।'

---

২১. আখবারু 'উমার (রা)–২৪৮

'উমার (রা) মন্তব্য করলেন : তখন স্বচ্ছ পানি পাওয়া যায় এবং ভীড়ও কম থাকে। আন-নাজ্জাশী পাঠ করলেন :

وماسمى العجلان إلالقولهم + خذالقعب واحلب أيها العبد واعجل

'আল-'আজলান নামে নামকরণ করা হয়েছে তাদের এই কথার জন্য : ওরে দাস, বাটি নিয়ে এসে তাড়াতাড়ি দুধ দুইয়ে নাও।' উল্লেখ্য যে, আল-'আজালান অর্থ তাড়াহুড়ো করে কর্ম সম্পাদনকারী।

'উমার মন্তব্য করলেন : যারা তাদের পরিবার-পরিজনের বেশী কল্যাণ সাধন করে তারাই তো সবচেয়ে বেশী ভালো মানুষ। এবার তামীম, 'উমারকে বলেন, আপনি তাকে এই চরণটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন:

أولئك أولاد الهجين وأسرة الـ + لئيم ورهط العاجزالمتذلل

'তারা সব দাসীর সন্তান, নীচ পরিবার এবং তুচ্ছ, অক্ষম মানুষ।'

'উমার (রা) বললেনঃ এবার তোমাকে আর ক্ষমা করবো না। তিনি তাঁকে বন্দী করে বেত্রাঘাত করেন।[২২]

আয-যিবরিকান ও আল-হুতায়আ

একবার আয-যিবরিকান ইবন বদর হযরত 'উমারের (রা) নিকট এসে কবি আল-হুতায়আর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। 'উমার (রা) আল-হুতাআকে ডেকে আনালেন। তারপর যিবরিকানকে বললেন: এবার বলো, সে তোমাকে কি বলেছে। আয-যিবরিকান বললেন, সে আমাকে বলেছে:

دع المكارم لاترحل لبغيتها + واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى

'তুমি মহৎ গুণাবলীর চিন্তা ছেড়ে দাও এবং তা অর্জনের চেষ্টা না করে ঘরে বসে থাক। সেখানেই খেতে -পরতে পারবে।'

'উমার বললেন: এর মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কিছু তো দেখছিনে। তবে কিছু তিরস্কার আছে। আয-যিবরিকান বললেন : খাওয়া-পরা ছাড়া ব্যক্তিত্ব বলতে কি আমার আর কিছু নেই? আল্লাহর কসম! আমীরুল মু'মিনীন, আমাকে নিয়ে এর চেয়ে বেশী কঠিন ব্যঙ্গাত্মক কবিতা আর কেউ রচনা করেনি। আপনি ইবনুল ফুরায়'আকে (কবি হাস্‌সান ইবন ছাবিত) জিজ্ঞেস করুন।

'উমার (রা) হাসসানকে ডেকে আনালেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কি মনে করেন, এই শ্লোকটিতে তাকে নিন্দা ও ব্যঙ্গ করা হয়েছে? হাস্‌সান বললেন: হাঁ, শুধু তাই নয়, বরং তার উপর অস্ত্র উঠিয়েছে।

আসলে হাস্‌সান যা বুঝেছেন, 'উমার (রা) তা বুঝেছিলেন। কিন্তু তিনি আল-হুতায়আর

২২. *আল-ইসাবা-১/১৮৮ ; খাযানাতুল আদাব-১/১১৩ ; যাহ্‌রুল আদাব-১/২০*

বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ দাঁড় করাতে চেয়েছেন। হাস্সানের স্বাক্ষীর ভিত্তিতে তিনি আল-হুতায়'আকে গ্রেফতার করে জেলখানায় ঢুকিয়ে দেন।

জেলখানায় বসে এবার আল-হুতায়আ খলীফা 'উমারের দয়া ও অনুকম্পা কামনা করে কবিতা রচনায় মেতে উঠলেন এবং লোক মারফত তা তাঁর নিকট পাঠাতে লাগলেন। যেমন তিনি পাঠালেন:

تحنن على هداك المليك + فإن لكل مقام مقالا

فلاتسمعن لى مقال العدى + ولاتؤكلنى هديت الرجالا

فإنك خير من الزبرقان + أشد نكالاوخير نوالا

'আপনি আমার প্রতি সদয় হোন। সব কিছুর মালিক আপনাকে হিদায়াত দান করুন। নিশ্চয় প্রত্যেকটি বিশেষ স্থানের বিশেষ কথা থাকে।

আপনি আমার সম্পর্কে আমার শত্রুদের কথায় কান দিবেন না এবং মানুষের হাতেও আমাকে ছেড়ে দিবেন না। আল্লাহ্ আপনাকে পথ দেখান।

আপনি যিবরিকান অপেক্ষা উত্তম। আপনি কঠোর শাস্তি বিধানকারী এবং ভালো দানশীল।'

'উমার এসব কবিতার প্রতি তেমন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। অবশেষে আল-হুতায়আ একদিন এই চরণগুলো পাঠালেন :

ماذا تقول لأفراخ يذى مرخ + زغب الحواصل لاماء ولاشجر

ألقيت كاسبهم فى قعر مظلمة + فاغفرعليك سلام الله ياعمر

أنت الإمام الذى من بعد صاحبه + ألقى إليك مقاليدالنهى البشر

لم يؤثروك بها إذقدموك لها + لكن لأنفسهم كانت بك الأثر

'পানি ও বৃক্ষহীন যূ-মারিখ উপত্যকায় অবস্থিত রূপোর মত সাদা নরম পালক বিশিষ্ট ছানা গুলোকে আপনি কি বলবেন?

তাদের জন্য উপার্জনকারীকে তো আপনি অন্ধকার গর্তে নিক্ষেপ করেছেন। 'উমার আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহর শান্তি আপনার প্রতি বর্ষিত হোক।

আপনার বন্ধুর পরে আপনি হলেন ইমাম বা নেতা। মানুষ জ্ঞানী ব্যক্তিদের লাগাম আপনার হাতে তুলে দিয়েছে। যখন তারা আপনাকে এই ক্ষমতা গ্রহণের জন্য এগিয়ে দিয়েছে তখন তাদের অন্তরে আপনার একটা প্রভাব ছিল। তাই তারা আপনাকে প্রাধান্য দিয়েছে।'

এদিকে 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফও (রা) তাঁর জন্য সুপারিশ করলেন। 'উমারের (রা) অন্তর নরম হলো। তিনি আল-হুতায়আকে মুক্তি দিয়ে তাকে বললেন: তুমি মানুষের নিন্দা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ছেড়ে দাও।

আল-হুতায়আ বললেন: তাহলে তো আমার পরিবার-পরিজন অনাহারে মারা যাবে। তাদের খাদ্য-খাবারের ব্যবস্থা এর মাধ্যমেই হয়। একটা পিঁপড়ে যেন সব সময় আমার জিহবায় বিড় বিড় করে চলতে থাকে। এটাই আমার জীবিকার উৎস। এর উপরই আমার জীবন ধারণ।

'উমার (রা) একটা চেয়ার আনিয়ে তার উপর বসলেন। আল-হুতায়আকে ডেকে সামনে বসালেন। তারপর ধারালো ব্লেড ও ছিদ্র করার যন্ত্র আনালেন। মনে হলো তিনি এখনই আল-হুতায়আর জিহবা কেটে ফেলবেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে অভিযোগকারী আয-যিবরিকান বলে উঠলেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে আল্লাহর নামে কসম করে অনুরোধ করছি, তার জিহবাটি কাটবেন না। আর যদি একান্ত কাটতেই হয়, তাহলে আয-যিবরিকানের বাড়ীতে কাটাবেন না। আল-হুতায়আও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি 'উমারকে (রা) বললেন: আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর কসম, আমি আমার বাবা-মার নিন্দা করেছি, আমার স্ত্রীর নিন্দা করেছি এবং আমি আমার নিজকেও নিন্দা করেছি। এবার 'উমার (রা) একটু মুসকি হেসে দিয়ে বলেন : তুমি কি বলেছো?

বললেন : আমি আমার মাকে বলেছি :

ولقد رأيتك فى النساء فسؤتنى + وأبا بنيك فساء نى فى المجلس

'মহিলাদের মধ্যে তোমাকে যখন আমি দেখেছি, কষ্ট পেয়েছি। আর তোমার ছেলেদের পিতাও মজলিস-মাহফিলে আমাকে পীড়া দিয়েছে।'

আমার মাকে আরও বলেছি :

تنحى فاجلسى منى بعيدا + أراح الله منك العالمينا

'সরে যাও, আমার থেকে দূরে গিয়ে বস। বিশ্ববাসীকে আল্লাহ তোমার অকল্যাণ থেকে শান্তি দান করুন।'

আর আমার স্ত্রীকে বলেছি :

أطوف ماأطوف ثم آوى + إلى بيت قعيدته لكاع

'আমি চারিদিকে ঘোরাঘুরি করে এমন এক বাড়ীর দিকে ফিরে এলাম যার বসবাসকারিণী এক নীচ প্রকৃতির মহিলা।'

'উমার (রা) প্রশ্ন করলেন : তুমি নিজের নিন্দা করেছো কিভাবে? বললেন : আমি একটি কূয়োর কিনারে গিয়ে পানিতে উঁকি দিয়ে নিজের চেহারাটি দেখলাম। খুব কুৎসিত মনে

হলো। তখন আমি বললাম :

أبت شفتاى اليوم إلاتكلما + بسوء فماأدرى لمن أناقائله
أرى لى وجهاشوه الله خلقه + فقبح من وجه وقبح حامله

'আজ আমার ঠোঁট দু'টি খারাপ কথা ছাড়া আর কোন কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আমি জানিনে, একথা আমি কার উদ্দেশ্যে বলছি।

আমি আমার চেহারাকে দেখেছি, আল্লাহ্ যা কুৎসিত করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এই চেহারার মন্দ হোক এবং এর বহনকারীরও মন্দ হোক।'

একটি বর্ণনা মতে, এরপর 'উমার (রা) তিন হাজার দিরহামের বিনিময়ে তাঁর নিকট থেকে মুসলমানদের মান-ইজ্জত খরিদ করেন। তাঁর কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেন যে, আর কোন দিন কারো নিন্দা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে কবিতা রচনা করবেন না।

'উমারের (রা) মৃত্যু পর্যন্ত আল-হুতায়আ তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি আবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক কবিতা রচনার দিকে ফিরে যান।[২৩]

'উমার (রা) বলতেন : আল-হুতায়আ নীচের এই চরণটিতে মিথ্যা বলেছে:

وإن جياد الخيل لاتستعزنا + ولا جا لات العاج فوق المعا صم

'উন্নত জাতের ঘোড়া আমাদের সম্মান বয়ে আনেনা। হাতের কবজীতে হাতী অংকনকারী মহিলারাও কোন মর্যাদা নিয়ে আসেনা।'

তারপর তিনি বলেনঃ ঘোড়া দাবড়িয়ে আগে যাওয়াকে কেউ যদি ছেড়ে দিত তাহলে রাসূল (সা) অবশ্যই ছেড়ে দিতেন।

কোন কোন বর্ণনায় لاتستفز শব্দ এসেছে। যার অর্থ উন্নত জাতের ঘোড়া আমাদেরকে হেয় ও অপমান করতে পারে না।'[২৪]

আল-আগলাব ও লাবীদ (রা)

মুগীরা ইবন শু'বা (রা) তখন কূফার ওয়ালী। একবার 'উমার (রা) তাঁকে লিখলেন, তোমার ওখানকার কবিরা ইসলাম সম্পর্কে কি বলে তা আমাকে জানাও। মুগীরা রজয ছন্দের কবি আল-আগলাব আল-'ইজলীর নিকট লোক পাঠালেন। তিনি তাঁর কবিতা শুনতে চাইলেন। আল-আগলাব এই পংক্তিটি পাঠ করলেন:

أرجزا تريد أم قصيدا + لقد طلبت هينا موجودا

'তুমি রজয ছন্দের কবিতা চাচ্ছো, না কাসীদা? তুমি খুব সহজ জিনিস চেয়েছো। আমার

---

২৩. *আল-আগানী—২/৫২, ৫৭ ; আল-কামিল—১/৩৫৩ ; তাবাকাত আশ-শু'আরা'—৪০ ; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন—২/২৫৪*

২৪. *আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন—২/২৯*

কাছে সবই প্রস্তুত আছে।'

তিনি কবি লাবীদের নিকট লোক পাঠালেন। লোকটি গিয়ে লাবীদকে কবিতা শোনাতে বললেন। লাবীদ (রা) বললেন : আমার জাহিলী আমলের কবিতা শুনতে চাও? বললেন না। আপনি ইসলামী জীবনে যা বলেছেন তার থেকে কিছু শোনান। লাবীদ (রা) উঠে গেলেন। তারপর সূরা আল-বাকারা লিখে এনে তার হাতে দিয়ে বলেন : কবিতার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই জিনিস দিয়েছেন।

মুগীরা (রা) এই দুই কবির মন্তব্য 'উমারকে (রা) লিখে জানালেন। 'উমার (রা) আল-আগলাবের নির্ধারিত ভাতা পাঁচশো দিরহাম কমিয়ে তা লাবীদের (রা) ভাতার সঙ্গে যোগ করে দেন। এতে লাবীদের (রা) ভাতা হয় আড়াই হাজার। আল-আগলাব লিখলেন : আমীরুল মু'মিনীন, আমি আপনার আনুগত্য করা সত্ত্বেও আমার ভাতা কমিয়ে দিলেন? 'উমার (রা) সদয় হন এবং তাঁর পাঁচশো দিরহাম আবার ফিরিয়ে দেন। তবে লাবীদের (রা) আড়াই হাজার ঠিকই থাকে।[২৫]

আন-নাবিগা আয-যুবয়ানী

প্রখ্যাত তাবি'ঈ শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে। একবার 'উমার (রা) গাতফান গোত্রের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নিম্নের এই চরণ দু'টো কারঃ

ألاسليمان إذ قال الإله له + قم فى البرية فاحد ها عن الفند
وخيس الجن أنى قد أذنت لهم + يبنون تدمر بالصفاح و العمد

'সুলায়মানকে যখন তাঁর প্রভূ বললেন, তুমি প্রাণীজগতের মধ্যে দাঁড়াও এবং তাদের অক্ষমতা দূর করে তেজোদ্দীপ্ত করে তোল।

জিনদেরকে বলে দাও, আমি তাদেরকে বড় বড় পাথর ও স্তম্ভ দ্বারা তাদমুর নির্মাণের অনুমতি দিয়েছি।'

তারা বললো : আমীরুল মু'মিনীন! আন-নাবিগা আয-যুবয়ানীর। 'উমার (রা) আবার জানতে চাইলেন, এই শ্লোক দু'টো কে বলেছে?

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة + وليس وراء الله للمرء مذهب
لئن كنت قد بلغت عنى جناية + لمبلغك الواشى أغش وأكذب

'আমি শপথ করেছি এবং তোমার অন্তরে কোন সন্দেহ রাখিনি। আর আল্লাহ ছাড়া মানুষের আর কোন পথ ও পন্থা নেই।

যদি আমার কোন অপরাধের কথা তোমাকে পৌছানো হয়ে থাকে তাহলে তোমার কাছে প্রচারকারী চোগলখোর ভীষণ প্রতারক ও মিথ্যুক।'

---

২৫. আল-আগানী –১৪/৯৪

তারা বললো : আমীরুল মু'মিনীন এ দু'টো শ্লোক আন-নাবিগা বলেছেন।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এই শ্লোকগুলো কে বলেছেন?

إلى ابن محرق أعملت نفسي + وراحلتي وقد هدت العيون
فألفيت الأما نة لم يخنها + كذلك كان نوح لايخون
أتيتك عاريا خلقاثيالبى + على خوف تظن بى الظنون

'আমি আমার নিজেকে ও আমার বাহনকে ইবন মুহাররাকের দিকে চালিত করেছি এবং মানুষের চোখ পৌঁছে দিয়েছে।

আমি সেখানে বিশ্বস্ততা পেয়েছি। সে বিশ্বাস ঘাতকতা করেনি। এমনি ভাবে নূহ বিশ্বাস ঘাতকতা করতেন না।

আমি তোমার নিকট এসেছি ছেঁড়া-ফাটা পোশাকে উলঙ্গ অবস্থায়। এমন একটা ভয়-ভীতির সাথে যে আমাকে নিয়ে নানা রকম ধারণা সৃষ্টি হবে।'

তারা বললোঃ হে আমীরুল মু'মিনীন। এগুলিও আন-নাবিগা বলেছেন। 'উমার (রা) মন্তব্য করলেনঃ তাহলে তিনি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। অন্য একটি বর্ণনা মতে, 'উমার (রা) বলেন, তাহলে তিনি আরবের সর্বশ্রেষ্ট কবি।[২৬]

কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমা

'উমার (রা) একদিন ইবন 'আব্বাসকে (রা) প্রশ্ন করলেন: আচ্ছা আপনি কি কবিদের কবি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবির কোন কবিতা বলতে পারেন? ইবন 'আব্বাস পাল্টা প্রশ্ন করলেন: তিনি আবার কে? বললেন: যিনি এই চরণটি বলেছেন:

ولوأن حمدا يخلد الناس أخلدوا + ولكن حمد الناس ليس بمخلد

'একটি প্রশংসা যদি মানুষকে চিরস্থায়ী করতো তাহলে মানুষ চিরঞ্জীব হতো। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষের প্রশংসা চিরস্থায়ী কোন কিছু নয়।'

ইবন আব্বাস (রা) বললেন: এ কথা তো যুহায়র বলেছেন। 'উমার (রা) বললেন: তিনিই হলেন কবিদের কবি। ইবন 'আব্বাস জানতে চাইলেন: কি কারণে তিনি কবিদের কবি হলেন? বললেন: তিনটি কারণে তিনি কবিদের কবি: ১. তিনি কথায় পুনরাবৃত্তি করেন না। ২. তাঁর কবিতায় জংলী ও বর্বর ভাব নেই। ৩. তিনি কাউকে তার মধ্যে বিদ্যমান গুণ ছাড়া অহেতুক প্রশংসা করেন নি।[২৭]

একবার 'উমার (রা) যুহায়রের কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। অবশেষে নিম্নের শ্লোকটি পর্যন্ত পৌঁছলেন :

২৬. প্রাগুক্ত–৯/১৫৫ ; তাবাকাত আশ-শু'আরা'–২৭ ; জামহারাতু আশ'আর আল-'আরাব–৩৪
২৭. প্রাগুক্ত

فإن الحق مقطعه ثلاث + يمين أونفار أوجلاء

'সত্যের তিনটি অংশ: শপথ, বিচার ও স্পষ্ট হওয়া।'

শ্লোকটি আবৃত্তি করে 'উমার (রা) বিচার বিষয়ে যুহায়রের জ্ঞান দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন: সত্য এই তিনটির যে কোন একটির বাইরে যেতে পারে না। হয় শপথ, বিচার অথবা প্রমাণ। শ্লোকটি তিনি বার বার আওড়াতে থাকেন। শেষে বলেন: আমি যদি যুহায়রকে পেতাম, তাহলে বিচার বিষয়ে তার জ্ঞানের কারণে তাকে কাজী নিয়োগ করতাম।[২৮] উল্লেখ্য যে, যুহায়র জাহিলী যুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

জাহিলী যুগের একজন সৎকর্মশীল নেতা হারিম ইবনে সিনান। কবি যুহায়র একটি কবিতায় তঙ্গার কিছু গুণাবলী তুলে ধরে প্রশংসা করেন। আর এতে হারিম আরবের একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিতে পরিণত হন। আল-আসমা'ঈ বলেন, একদিন 'উমারকে (রা) কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনালে তিনি মন্তব্য করেন: এ তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)।[২৯] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) তো এ সব গুণের অধিকারী।

একবার হারিম ইবন সিনানের এক মেয়ে হযরত 'উমারের (রা) নিকট আসেন। 'উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন: যুহায়রের যে কবিতার জন্য তোমার পিতার নাম সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ে তার বিনিময়ে তোমার পিতা তাকে কি দিয়েছিলেন? বললেন: ধ্বংস উপযোগী কিছু উট, ঘোড়া, কাপড়-ছোপড় ও অর্থ- সম্পদ দিয়েছিলেন। 'উমার (রা) বললেন: কিন্তু যুহায়র তাঁকে যা দিয়েছিলেন তা কালের বিবর্তনে কখনো ধ্বংস ও বিলীন হবে না।[৩০]

আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেছেন। একবার 'উমার (রা) হারিম ইবন সিনানের এক ছেলেকে বলেন: তোমার পিতার প্রশংসায় রচিত যুহায়ররের কবিতাটি আমাকে একটু শোনাও। সে আবৃত্তি করে শোনালো। 'উমার (রা) মন্তব্য করলেন: তিনি তোমাদের সম্পর্কে সুন্দর কথা বলেছেন। ছেলে বললো: আমরাও তো তাঁকে চমৎকার প্রতিদান দিয়েছি। 'উমার (রা) বললেন: তোমরা তাঁকে যা কিছু দিয়েছো তা সবই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তা চিরকাল থাকবে।[৩১] উল্লেখ্য যে, 'উমার (রা) যুহায়রের উপর অন্য কোন কবিকে স্থান দিতেন না।

---

২৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৪০; 'উয়ূন আল-আখবার -১/৬৭
২৯. আল-আগানী-৯/১৪৬ ; নিহায়াতুল আরিব-৩/১৭৪
৩০. মাজমাআল-আমছাল-১/১২৭ ; আল-কামিল-১/২২২
৩১. আল-আগানী -৯/১৪৬

'আবাদা ইবন আত-তাবীব

একবার এক ব্যক্তি 'উমারকে (রা) কবি 'আবাদা ইবন আত-তাবীবের "লাম" অন্ত্যমিল বিশিষ্ট একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করে শোনালো। যখন নিম্নের এই চরণটিতে পৌঁছলো:

والـمرء ساع لأمرليس يدركه + والعيش شح واشفاق وتأميل

'মানুষ অনেক কিছুর জন্য চেষ্টা করে যা সে পায়না। জীবন হলো লোভ, দয়া-স্নেহ ও আশা।'

শ্লোকটি শুনে 'উমার (রা) দারুণ বিস্মিত হলেন। শব্দ তিনটি বার বার আওড়ালেন। তারপর মন্তব্য করলেন:কি চমৎকার ভাগ।[৩২]

আবূ কায়স ইবন আল-আসলাত

একবার এক ব্যক্তি 'উমারকে (রা) কবি আবূ কায়স ইবন আল-আসলাতের কবিতা শোনাতে লাগলো। তিনি চুপ করে মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলেন। লোকটি যখন এই শ্লোকটি পাঠ করলো:

الكيس والقوة خيرمن ال + إشفاق والفهة والهاع

'দয়া-মমতা, কথা বলতে অক্ষমতা ও ভীরুতা অপেক্ষা বিজ্ঞতা-বিচক্ষণতা ও শক্তি-ক্ষমতা উত্তম।'

'উমার (রা) বার বার শ্লোকটি আওড়ালেন এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।[৩৩]

তারাফা ইবন আল-'আবদ

তারাফা ইবন আল-'আবদ জাহিলী যুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভোগবাদী কবি। সপ্ত ম'আল্লাকা বলে খ্যাত কবিতা সংকলনের দ্বিতীয় কবি। একদিন 'উমার (রা) মদীনার রাস্তায় চলার সময় শুনতে পেলেন এক যুবক এই তারাফার নিম্নের শ্লোকটি সুর করে গাইতে গাইতে চলেছে:

فلولا ثلاث هن من لذة الفتى + وجدك لم أحفل متى قام عودى

'একজন যুবকের জীবনে যদি তিনটি আনন্দ-ফূর্তির জিনিস না থাকতো তাহলে তোমার ভাগ্যের কসম, কখন আমি মারা গেলাম সে ব্যাপারে কোন পরোয়া করতাম না।'

তারপর পরবর্তী দু'টি চরণে ইসলাম নিষিদ্ধ ভোগ-বিলাসী তিনটি পাপের কথা কবি বলেছেন। 'উমার (রা) এ তিনটি শ্লোক শোনার পর মন্তব্য করেনঃ যদি আমি আল্লাহর

---

৩২. *কিতাবুল হায়ওয়ান-৩/১৩ ; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন -১/২৪০ ; আছ-ছা'আলিবী, আল-ঈজায ওয়াল ই'জায-৪১*

৩৩. *আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২১৪*

পথে জিহাদে বের না হতাম, আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার কপাল মাটিতে না ঠেকাতাম এবং ভালো ফল বাছার মত ভালো ভালো কথা যারা বাছে তাদের মজলিসে না বসতাম তাহলে কখন আমার মৃত্যু এলো তাতে আমার পরোয়া ছিল না।[৩৪]

সুলায়ম গোত্রের কবি জা'দা নারীদের সাথে বেশী মেলামেশা করতো এবং তাদের নিয়ে প্রেম-সংগীত রচনা করতো। এ খবর 'উমারের কাছে পৌঁছলে তিনি তাকে গ্রেফতার করে এক'শো বেত্রাঘাত করেন এবং অপরিচিত মহিলাদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।[৩৫]

হযরত 'উমারের (রা) নিকট কোন প্রতিনিধি দল এলে তিনি তাদের কবিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তারা তাদের কবিদের কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো এবং তিনি নিজেও কোন কোন সময় সে সব কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করতেন। তিনি এবং তাঁর সংগী-সাথীরা সমবেত হয়ে কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং কার কোন কবিতা সর্বোৎকৃষ্ট সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতেন।[৩৬] তিনি কুরআনের আয়াতের অর্থ বুঝতে কবিতার সাহায্য নিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা তোমাদের দিওয়ান (কবিতা) সংরক্ষণ করে রাখো। তাহলে তোমরা আর গোমরাহ্ হবে না।[৩৭]

---

৩৪. প্রাগুক্ত–২/২৫৭ ; 'উয়ূন আল-আখবার–১/৩০৮

৩৫. আখবারু 'উমার –২৬০

৩৬. মুকাদ্দিমা, নাকদ আশ-শি'র–২৩

৩৭. লিসান আল-'আরাব–২/১৯৯২ ; তাজ আল-'আরূস–৬/১০৬

গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ৭ম সংস্করণ, ১৯৭৬)

২. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, (বৈরুত ঃ দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৪)

৩. ইবন কুতায়বা, আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা', (বৈরুত ঃ দারুল কুতুব আল- 'ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১)

৪. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, (কায়রো ঃ তাব'আ আস-সাসী)

৫. মাহমূদ শুকরী আল-আলূসী, বুলূগ আল-আরিব, (বৈরুত ঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, হি. ১৩১৪)

৬. আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, (বৈরুত ঃ দারুল মা'আরিফ)

৭. আল-কুরতুবী, আল-ইসতী'আব, টীকা ঃ আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা, (বৈরুত ঃ দারুল ফিক্র, ১৯৭৮)

৮. ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাত আশ-শু'আরা', (বৈরুত ঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৮০)

৯. ইবন হিশাম, আস-সীরাতু আন-নাবাবিয়্যা, সম্পাদনাঃ মুসতাফা আস-সাকা ও অন্যরা।

১০. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, (বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৯৫৭)

১১. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগা আল-'আরাবিয়্যা, (বৈরুতঃ দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৮)

১২. আহমাদ যাকী সাফওয়াত, জামহারাতু খুতাব আল -'আরাব, (বৈরুতঃ আল- মাকতাবা আল-'ইলমিয়্যা)

১৩. ড. নূরী হামূদী আল-কায়সী, শু'আরা' ইসলামিয়্যুন, (বৈরুত ঃ মাকতাবা আন-নাহ্দা আল-'আরাবিয়্যা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৪)

১৪. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন আল-কাসিম আল-আনবারী, শারহু কাসাইদ আস-সাব'ই আত-তিওয়াল আল-জাহিলিয়্যাত, (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ); আয-যাওয়ানী, শারহুল মু'আল্লাকাত, (দিমাশ্ক ঃ১৩৮৩ হি.)

১৫. আল-জাহিজ, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর)

১৬. 'আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ আস-সিয়ার (করাচী)

১৭. ইবন খালদূন, আল-মুকদ্দিমা, (আল-মাতবা'আতু আল-বাহিয়্যা)

১৮. ড. মুসতাফা মাহমূদ ইউনুস, আদাবুদ দা'ওয়াতি আল-ইসলামিয়্যা, (কায়রোঃ মাতবা'আতু কাসিদি আল-খায়র)

১৯. আল-বালাযুরী, আনসাব আল-আশরাফ, (মিসর ঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৯)

২০. আল- মারযুবানী, আল-মুওয়াশ্শাহ, (কায়রোঃ আল-মাকতাবা আস-সালাফিয়্যা, হি.১৩৪৩)

২১. আল-জাহিজ, কিতাব আল-হায়ওয়ান, (কায়রোঃ আল-মাতবা'আতু আল-হুমায়দিয়্যা, ১৯৪৮)
২২. দিওয়ানু লাবীদ, সম্পাদনা ঃ ডঃ ইহসান 'আব্বাস, (কুয়েত, ১৯৬২)
২৩. আবূ 'উবায়দিল্লাহ্ আল-বিকরী, মু'জামু মা ইসতা'জামা, (কায়রোঃ লুজনা আত-তা'লীফ, ১৯৪৫-১৯৫১)
২৪.R.A.Nicholson, A Literary History of the Arabs, (Cambridge University press,1969)
২৫. ইবন রাশীক, আল-'উমদা,
২৬. ইবন কাছীর, আল- বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (কায়রোঃ দারুদ দায়্যান লিত-তুরাছ, সংস্করণ-১, ১৯৮৮)
২৭. ইবন 'আবদি রাব্বিহি, আল-'ইকদ আল-ফারীদ, (কায়রোঃ লুজনাতুত তা'লীফ ওয়াত তারজামা, সংস্করণ-৩, ১৯৬৯)
২৮. কুদামা ইবন জা'ফার, নাকদ আশ-শি'র, সম্পাদনা ঃ মুহাম্মদ 'আবদুল মুন'ইম খাফাজী, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা)
২৯. ড. মুহাম্মাদ আশ্-শাতির, আল-মু'জায ফী নাশ আতিন নাহবি, (মদীনা ঃ আল-জামি'আতু আল-ইসলামিয়্যা-১৯৭৮)
৩০. ইবন কুতায়বা, 'উয়ূন আল- আখবার, (কায়রোঃ দারুল কুতুব, ১৯৩০)
৩১. ইবন খাল্লিকান। ফুওয়াত আল-ওয়াফাইয়াতি (মিসর)
৩২. 'আলা উদ্দীন আল- মুত্তাকী, কান্‌য আল- 'উম্মাল, (বৈরুতঃ মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-৫, ১৯৮৫)
৩৩. ইউসুফ আল-কান্‌ধালূবী, হায়াতুস সাহাবা, (দিমাশ্‌কঃ দারুল কালাম, সংস্করণ-২, ১৯৮৩)
৩৪. ইবন হাজার আল-'আসকিলানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস- সাহাবা, (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৯৭৮)
৩৫. আস-সিবা'ঈ বুয়ূমী, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, (কায়রো ঃ মাতবা'আতুর রিসালা, সংস্করণ-২, ১৯৫৮)
৩৬. আয- যিরিক্‌লী, আল- আ'লাম, (বৈরুত ঃ দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, সংস্করণ-৪, ১৯৭৯)
৩৭. ইবনুল আছীর, উসুদুল গাবা, (বৈরুত ঃ দারু ইহইয়া' আত- তুরাছ আল- 'আরাবী)
৩৮. আহমাদ 'আবদুর রহমান আল- বান্না, আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'আ বুলূগ আল- আমানী, (কায়রোঃ দারুশ শিহাব)
৩৯. 'আবদুল কাদির আল- বাগদাদী, খিযানাতুল আদাব, (মিসরঃ মাতবা'আতু বুলাক, ১২৯৯ হিঃ)
৪০. মুহিউদ্দীন ইবন শারফ আন্- নাওবী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, (মিসর ঃ আত-তিবা'আ আল- মুণীরিয়্যা)
৪১. দায়িরা-ই- মা'আরিফ-ইসলামিয়া, (লাহোর)

৪২. হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থ
৪৩. ইবন মানজূর, লিসানুল 'আরাব, (কায়রো ঃ দারুল মা'আরিফ); মুহাম্মদ মুরতাদা আয-যাবীদী, তাজুল আরূস, (বৈরুতঃ মাকতাবা আল- হায়াত)
৪৪. মুহাম্মদ আল- খাদারী বেক, তারীখ আল- উমাম আল- ইসলামিয়্যা, (মিসরঃ আল-মাকতাবা আত- তিজারিয়্যা আল কুবরা, ১৯৬৯)
৪৫.ড. ত্বাহা হুসায়ন, আল- ফিতনাতুল কুবরা, (কায়রো)
৪৬. 'উমার রিদা কাহহালা, আ'লাম আন-নিসা', (বৈরূতঃ মুআসসাতুর রিকালা, ৫ম সংস্করণ ১৯৮৪)
৪৭. 'আবদুল কাহির আল-জুরজানী, দালায়িল আল-ই'জায, (আল-মানার)
৪৮. আল-মুবাররিদ, আল-কামিল, (মিশরঃ ১৩০১ হি.)
৪৯. ইবন দুরায়দ, আল-ইশতিকাক,
৫০. ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, (মিশরঃ১৩৪৭ হি.)
৫১. আত-তানতাবী, আখবারু 'উমার, (বৈরূতঃ আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৮ম সংস্করণ, ১৯৮৩)
৫২. আল-হাসারী, যাহরুল আদাব, (মিশর, ১৯২৫)
৫৩. দীওয়ান-ই-আলী (রা), (ঢাকাঃ র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০২)
৫৪. আবদুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীদের মনোভাব, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯৫)
৫৫. ড. মুস্তাফা হাসান আযহারী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, অনুবাদঃ ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, (রাজশাহী ঃ মুহাম্মাদী প্রকাশনী, ১৯৯৬)
৫৬. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকাঃ ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬)
৫৭. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৪)
৫৮. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৪)
৫৯. নূর উদ্দীন আহমাদ, অস-সব-'উল মু'আল্লাকাত, (ঢাকাঃ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১ম সংস্করণ, ১৯৭২)

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন, বাংলাবাজার, মগবাজার